গরীবের মেয়ে

শ্রীঅনুরূপা দেবী প্রণীত

১৩৩২]

মূল্য তিন টাকা

প্রকাশক—
শ্রীকুমারদেব মুখোপাধ্যায়
ভূদেব পাবলিশিং হাউস
৪৪নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

B3671

শ্রীকুমারদেব মুখোপাধ্যায়
বুধোদয় প্রেস
৪৪নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

মাননীয়া শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীকে—

আপনার উৎসাহেই আমার রচনা লোকচক্ষে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। "গরীবের মেয়ে"কে তাই আপনার হাতেই দিলাম।

আপনার স্নেহের
অনুরূপা

গরীবের মেয়ে

প্রথম পরিচ্ছেদ

শীতের সকাল, বেলা প্রায় নয়টা বাজিয়াছে। আফিসের কেরাণী, দ্বারবান্, ঝাড়ুদার এবং বিদ্যালয়ের ছাত্রদল যথানিয়মিত সময়কে পাছে না ধরিতে পারে, তাহারই জন্য পশ্চিমের এই দুরন্ত শীতকেও উপেক্ষা করিয়া খালি গায়ের উপর কেহ এক খাব্‌লা তেল চাব্‌ড়াইতেছে, আবার কেহ বা শীতার্ত্ততায় গায়ের জামাজোড়া খুলিতে না পারিয়া সেইসব শুদ্ধই মাথা ঝুলাইয়া, মাথার চুলগুলাকে একটুখানি ভিজাইয়া লইতেছিল। এইরূপ কাকস্নানের প্রধান উদ্দেশ্য অবশ্য চুলগুলার মধ্য সুচারুভাবে টেরী কাটা। নতুবা শারীর-স্বাস্থ্যতত্ত্বের সহিত ইহার কোন সম্বন্ধই নাই, বরং কিছু বিরুদ্ধ সম্পর্কই দেখা যায়।

এ ছাড়া আজকাল আর একজাতীয় জীবকেও এই আফিস ইস্কুলের অধিবাসীদিগের মতই শীতবর্ষানির্ব্বিশেষে সাত সকালে নাকে মুখে দু'টী গুঁজিয়া প্রায়ই অ-স্নাত—অ-ভুক্ত অবস্থায় সারাদিনের মত বাড়ীর বাহির হইতে হয়। তাহাদের দুরবস্থা আবার আরও এক কাঠি উপরে। সে বালিকা-বিদ্যালয়ের ছাত্রীবৃন্দ। স্কুলের গাড়ীর ভয়ে তাহাদের ঘুম ভাঙ্গার পর হইতে এতই সন্ত্রস্ত থাকিতে হয় যে, পুরা

হপ্তাটা স্নান ত তাদের হয়ই না, আহারটাও অর্দ্ধেক দিন না হওয়ারই সামিল। কারণ, বাসনমাজা-ঝিয়ের কামাই মাসের মধ্যে অমন পঁচিশ দিনই, খোকাখুকীদের না ধরিলে, বিছানাটা না তুলিলে, নেকড়াগুলা না কাচিলে, বাবা বা দাদার তেলটুকু, গামছাখানা, ধুতিখানি ঠিক করিয়া না রাখিলে দ্বিভুজা-মাতা চতুর্ভুজা হইয়াও যে আধসিদ্ধ ডাল-ভাতটা জোগান দিতে পারিয়া উঠেন না। বাসন মাজিয়া, ঘর নিকাইয়া, ছাই তুলিয়া, ছেলেকে দুধ দিয়া তাহার উপর: মেয়ের কাছে কণামাত্রও সাহায্য না পাইলে, সূতিকারোগ জীর্ণা মাতা বাড়ীর মেয়ে পুরুষ সব কয়টিকে কেমন করিয়া সাড়ে নয়টার ভিতর সারাদিনের রসদ যোগান দেন? বিশেষতঃ সারা সহর ঘুরিয়া মেয়ে সংগ্রহ করিতে হয় বলিয়া মেয়ে-স্কুলের গাড়ী বেশীর ভাগই সাড়ে সাতটা হইতে আটটা নয়টার মধ্যেই সর্ব্বত্র আসিয়া পৌঁছে।

পৌষমাস, যেমন প্রবল শীত পড়িয়াছে, তেমনই প্রচণ্ড বর্ষা দেখা দিয়াছে। একদিকে মেঘ ও অপর দিকে কোয়াশার স্থূল অবগুণ্ঠন ভেদ কবিয়া ধরণীবক্ষে দিনের আলোর অবতরণ প্রায় অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল, তাই বেলা নয়টা বাজিলেও মনে হইতেছিল, সবেমাত্র বুঝি এই ভোর হইয়াছে। একে ত শীতের ভোরে পাখীরা সহজে সাড়া দেয় না, তাহার উপর বৃষ্টির দৌলতে কাক, পক্ষীরা সকলেই যেন দুয়ার বন্ধ করিয়া ঘুমাইয়া আছে, কাহারও আর সাড়াটুকু পর্য্যন্ত নাই। কিন্তু জীবজগতের সর্ব্বত্র ত আর একই নিয়ম চলে না, মনুষ্যজীবের কথা স্বতন্ত্র। তাহাদের ত আর কাহারও ভরা কলসীতে ঠোঁট ডুবাইয়া, বাড়াভাতে মুখ জুবড়াইয়া বেড়াইলে দিন চলিবে না, কাযেই বাত, বর্ষা, আতপ এবং হিমকে পরাস্ত করিয়াই তাহাকে পেটের চেষ্টা দেখিতে হইতেছে। আরামের এবং বিরামের অদৃষ্ট লইয়া তাহাদের জন্ম হয়

নাই, তবে ইহারই মধ্যে যাহারা সুকৃতিবলে অপরের বাড়া ভাত খাইবার মত বুদ্ধি ও শক্তি লইয়া জন্মিয়াছে, তাহাদের কথা অবশ্য স্বতন্ত্র।

এলবার্ট বালিকা-বিদ্যালয়ের প্রকাণ্ড ওম্‌নিবস্‌খানা দুইটি বার্দ্ধক্যশীর্ণ ও বৃহদায়তন "সেকেণ্ডহ্যাণ্ড" কেনা কালো ঘোড়ার দ্বারা বাহিত হইয়া, সহরের প্রান্তভাগে অনেকগুলা পড়োবাড়ী, খোলার ঘর, কালকাসন্দা, ঘেঁটু ও বাঁশবাগানের পাশাপাশি একখানা অর্দ্ধভগ্ন জীর্ণ অট্টালিকার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। পিছনের পাদানীতে আড়ষ্টভাবে উপবিষ্টা ময়লা 'চুমুরী' শাড়ী ও ছেঁড়া 'ঝুলা'-পরা বালিকা-বিদ্যালয়ের 'দাইঠাকুরাণী চলন্ত গাড়ী হইতে ত্রস্ত নামিয়া পড়িয়া, সেই অসংস্কৃত, জীর্ণ নাতিবৃহৎ অট্টালিকাটির প্রবেশদ্বারের মধ্যে দাঁড়াইয়া ঊর্দ্ধমুখে উচ্চকণ্ঠে আহ্বান করিল—"নীরীবউমা! হো নীরীবউমা! গাড়ী আয়া।"

বাড়ীর ভিতরদিক হইতে একটি উদ্বেগ-বিপন্ন কণ্ঠস্বরে তৎক্ষণাৎ ধ্বনিত হইয়া উঠিল, "ওই শোন মা! আমি ত বল্‌ছি তোমায়, যে, আজ কিছুতেই আর আমার খাওয়া হ'য়ে উঠ্‌বে না, তা তুমি কিছুতেই শুন্‌লে না ত! এখন?"

"ও মা! মোটে যে গোণা দুটি গরাস ভাত মুখে দিইছিলি রে! এখনি উঠ্‌ছিস্‌ কি বল্‌? দুধওয়ালা মাগীও ত এখনও এলো না যে, দুধ একটু নিয়ে না হয় গরম ক'রে দোব। আজ না হয় না-ই গেলি, মা!" নেপথ্যস্থিতা খুব সম্ভব যে সেই সম্বোধিতা মায়েরই কণ্ঠ হইতে এই ব্যাকুলতাপূর্ণ প্রতিবাদটুকু বাহির হইল।

মেয়ে কিন্তু এই সুযুক্তির সমর্থন করিল না; সে অসহিষ্ণুভাবে ঈষৎ তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "তোমার ত অর্দ্ধেক দিনই এই রকম; না গেলে ফাইন দিতে হবে যে! আর সে পয়সাও ত আর তুমি আমায় দেবে না। না, মা! রোজ রোজ সব্বার সাম্‌নে আমায় দাঁড় করিয়ে

দেবে, সে আমি পার্‌বো না, বাপু! তার চেয়ে না খাই না-ই খেলুম, আমি—"

দাই হর্‌মতিয়া অপ্রসন্ন তীক্ষ্ণকণ্ঠে আরও খানিকটা অগ্রসর হইয়া গিয়া, ডাকিয়া উঠিল, "নীলি বউয়া! জল্‌দি আইয়ে বউয়া, মাইজি লোগ কেত্তা বোল্‌তা হায়, আপ ত আপ্‌নেসে হি কুছ্‌ কুছ্‌ শুনাথা? তব্‌ ফিন্‌ কাহে এত্তা দেরি করতেহেঁ বউয়া?"

"ও মা! না না, তুমি আর কিছু বলো না, মা! এ দাই! তুরন্ত ম্যয় আতেহেঁ—"

দুই তিন মিনিট পরেই একটি বছর এগার বারো বৎসরের মেয়ে একখানা আধময়লা মিলের সাড়ী ও বাজে ছিটের আধছেঁড়া একটা জামা পরা, হাতে তার গাছকতক কাঁচের চুড়ি, মাথায় রুক্ষ চুলের পিছনে একটা আধখোলা প্রকাণ্ড খোঁপা, একগাদা ময়লা ও মলাটখসা পুরাতন বই-খাতা বগলে চাপিয়া দ্বারের মধ্য দিয়া বাহির হইয়া আসিল।

"হাঁ, নীলি বউয়া! আপ কেত্তা দেরি কিয়া!—"এই মন্তব্য করিয়া দাই মিলিটারী ধরণে পা ফেলিয়া গাড়ীর দরজা খুলিতে অগ্রসর হইয়া গেল এবং মেয়েটি গাড়ীর পাদানীতে পা দিবার পূর্ব্বেই তাহার সহাধ্যায়িনীমণ্ডলী হইতে একটা কল্লোলিত কলরব উঠিয়া পড়িল—

"বাব্বা! নীলিমা! তোমার যে আর সাজা-গোজার শেষ হয় না, ভাই! এতক্ষণ ধ'রে হচ্ছিল কি, শুনি?"

"রোজই ত' ভাই, তোমার দরজায় আমাদের তিন ঘণ্টা ক'রে সময় লাগবে, আমরা তবু তোমার কত আগে বেরিয়েছি, তোমারই বা রোজ রোজ এত দেরি কিসের জন্য হয় ভাই?"

আর একজন বলিল, "ও মা! তবু চুলটা ত চারদিন থেকে ওই রকমই বাঁধা আছে দেখছি; মাগো! তুই কি কুঁড়ে, ভাই! আমি দেখ্‌

আজ চান করতে পারিনি, তবু চুলে 'কেতা' ক'রে ফিতে বেঁধে নিইচি তো। তুই, ভাই, যেন কি!"

নীলিমা ভিতরে ঢুকিয়া তাহাদের মধ্যে নিজের আসন গ্রহণ করিয়া অপরাধীভাবে সকলের সব প্রশ্নেরই একসঙ্গে এই জবাব দিল, "আমাদের যে ভাই বামা-পিসীর অসুখ করেছে, মারও শরীরটা মোটে ভাল নেই, তাতে এই বৃষ্টি-বাদলা, রান্না হ'তে অনেক দেরী হয়ে গেল, তবু আমি ঠিক গোণা দুটি গরাস মাত্র ভাত মুখে দিয়েই—যেম্‌নি দাইএর সাড়া পেয়েছি, অম্‌নি উঠে প'ড়ে মা'র মানা না শুনেই পালিয়ে এলুম।"

এই বলিয়াই মায়ের পরিম্লান ছল্‌ছলে মুখ-চোখ মনে পড়ায় তাহার কণ্ঠ ভেদ করিয়া একটা মৃদুশ্বাস উঠিয়া আসিল। কিন্তু তাহার বান্ধবিগণ সেদিকে লক্ষ্যমাত্র না করিয়াই সপ্তরথীর মতন একসঙ্গে তীব্র বিদ্রূপের তীক্ষ্ণস্বরে তাহাকে পুনরাক্রমণ করিয়া বসিল।

অণুকা বলিল, "ও মা! বাদ্‌লা-বৃষ্টি কি শুধু তোমাদেরই বাড়ীতে হয়েছে না কি? সারা সহর শুদ্ধ লোকদের কি ক'রে রান্না-বান্না হলো, শুনি?"

সুষমা ঠোঁট টিপিয়া মন্তব্য করিল, "তা ভাই, নীলির মা যদি কালিয়া-পোলাও চড়িয়ে থাকেন ত সে কি ক'রে এর মধ্যে শেষ হবে বল? আমরা তো শুধু খিচুড়ী আর আলুবেগুন ভাজা খেয়ে এসেছি বই ত নয়। এ তোমার অন্যায় কথা যে!"

মনোরমা একটা দুই কাঠীর গলাবন্ধ, সবুজ ও লাল পশম দিয়া এই গাড়ীর প্রচণ্ড ঝাঁকানীকেও উপেক্ষা করিয়া অত্যন্ত মনোযোগের সহিত বুনিতেছিল, যেন এই সময়টুকুর জন্যও তাহার সেই লাল সবুজ পশমের সেলাইটুকু বন্ধ থাকিলে, কি জানি, কি অনর্থই বা ঘটিয়া যাইবে,—তা সেও অকস্মাৎ নিজের সেই একাগ্রচিত্ততা ভঙ্গ করিয়া, মুখ তুলিয়া

ও মাথা ফিরাইয়া, সুষমার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিল, "বলি সুষী! তুই বুঝি আর এ সহর খুঁজে পোলাও রাঁধাবার লোক দেখতে পেলিনি? তাই নীলির মায়ের ঘাড়ে ওর দায় ফেল্লি? হ্যাঁ ভাই নীলি! আজ তোদের কি রান্না হয়েছিল, বল্ তো ভাই?"

এই প্রচ্ছন্ন পবিহাসের ভিতরকার রহস্য এ সমাজে নিতান্তই অ-প্রচ্ছন্ন ছিল বলিয়া এ কথায় সকল মেয়েরই ঠোঁটের আশে পাশে তৎক্ষণাৎ কিছু কিছু হাসির আভাস বিদ্যুতের মতন খেলিয়া গেল। কোন মেয়ে বা সেটাকে সামলাইতে না পারিয়া ফিক্ করিয়া হাসিয়াও ফেলিল। নীলিমার গণ্ড ও কর্ণমূল এই বিদ্রূত প্রশ্নে আরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল, তথাপি সে নিজের লজ্জা-বিপন্নতা সযত্নে রোধচেষ্টা করিতে করিতে শান্ত ঔদাস্যে সহজভাবেই উত্তর করিল, "আজকের দিনে আর অন্য কি হবে? খিচুড়িই চড়েছিল, মা তাই থেকে হাতায় কেটে আমায় দু'টি তুলে দিয়েছিলেন, তাও আবার গাড়ী এসে পড়লো ব'লে—"

অণুকা প্রশ্ন করিল, "আজ তা'হ'লে তোর মা নিশ্চয়ই তোকে জলখাবারের জন্য পয়সা দিয়েছেন? আমি, ভাই, আজ চাট্টি চানাচুর, সাড়ে বত্রিশভাজা, কচুরি আর রসগোল্লা কিন্‌বো। মনু, তুই কি কি কিন্‌বি? নীলি, তুই?"

মনোরমা বোনা বন্ধ করিয়া তখনই জবাব দিল, "আমি আজ ঝালবড়া আর গোলাপী বেউড়ির কথা ভেবে রেখেছি, তাছাড়া যা' হয় হবে। কিন্তু নীলি নিশ্চয়ই ও সব ছাই ছাই খাবার কিন্‌বে না, সে আজকের দিনে লেডিকেনী, রাবড়ী আর মতিচুর কিন্‌তে দেবে,—কেমন ভাই, নীলিমা? কেমন তোর 'মেনু' তৈরি ক'রে দিলুম বল ত?"

নীলিমার নাম নীলিমা হইলেও সুষমা বা মনোরমার অপেক্ষা রং তাহার অনেকটাই সাফ, তার সেই ফরসা মুখ এই ব্যঙ্গোক্তিতে অনেক-

খানি লাল দেখাইলেও মুখে সে শুধু একটুখানি হাসিয়া বলিল, "মেনু" তো খুব ভালই হয়েছে ; কিন্তু খাবার আজও আমি কিনবো না, বাজারের খাবার যে আমার পেটে মোটে সয় না, সে তোমরা ভাই, জানই তো ?"

"হ্যাঁ,—তা'—বটে !" এমন সুর করিয়া মনোরমা এই কথাটা বলিল যে, বাকী মেয়েরা তাদের চাপিবার ইচ্ছা সত্ত্বেও কেহই আর হাসি চাপিতে পারিল না ; কেবল নীলিমাই তাহাদের সেই হাসিতে যোগ দিবার চেষ্টা করিয়াও হাসিতে ত পারিলই না, উপরন্তু তাহার সমস্ত মুখটা অপমানের লজ্জায় অধিকতর রাঙ্গা হইয়া উঠিল।

ইহার ভিতর তাহাদের সুবৃহৎ যান গমগম শব্দে সমস্ত সহরের রাস্তা কাঁপাইয়া নিজের গন্তব্য স্থানে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। গাড়ী থামিতে না থামিতে ভিতরের মেয়েরা হুড়াহুড়ি করিয়া বাহিরে আসিয়া দেখিল, আজও তাহারা 'লেট' আসিয়াছে। স্কুলের ঘণ্টা পড়িয়া গিয়াছে এবং দূর হইতেই দেখিতে পাওয়া গেল যে, সেদিনও সুলোচনাদি'র মুখের চেহারাখানা বেশ সুপ্রসন্ন নয়। ইহা দেখিয়া সকল মেয়েই একসঙ্গে ভ্রূকুটী করিয়া ভয়-বিপন্নমুখী নীলিমার আনত মুখের দিকে এমনই ভাবে চাহিল যে, তাহার এ অর্থ করাও অসঙ্গত হয় না—যে এই সব কোপ-কটাক্ষে সে যদি ভস্ম হইয়া যায় ত হয় ভাল !—তাহা হইলে ত' আর রোজ রোজ তাদের 'ঝি না থাকার', 'মায়ের অসুস্থতার', 'বাপের কোন কিছুর' দরুণ ভাত না হওয়ার দায়ে সবাইকার এই অযথা বিলম্ব ঘটিয়া বিপত্তি ঘটাইতে পারে না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ছেলেমেয়ের গালভরা বাহারে নাম রাখিতে যদি কিছুমাত্র পয়সা খরচ হইত, তাহা হইলে নীলিমার পিতা অনুকূলচন্দ্র কখনই তাঁহার স্ত্রী স্বর্ণলতার উপর তাঁহার ছেলেমেয়েদের নামকরণের ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেন না। সৌভাগ্যক্রমে আজও আমাদের কর্তৃপক্ষীয়গণের অনবধানতা প্রযুক্ত এই একটা ব্যাপারের উপর কোনরূপ কর ধার্য্য করা এখনও পর্য্যন্ত ঘটিয়া উঠে নাই বলিয়াই অনুকূলচন্দ্রের পত্নী তাঁহার দীর্ঘদিনের বিবাহিত জীবনের মধ্যে এই একটা বিষয়েই শুধু একটুখানি স্বাধীনতা লাভ করিতে পাইয়াছিলেন। তা' মনের ক্ষোভ তিনি এ বিষয়ে কিছুই রাখেন নাই। কিন্তু হইলে কি হয়, মানুষে ছাড়িলে আবার যমে ছাড়ে না যে! যমদূতেরই একটি ছোটখাট সংস্করণ স্বামী-রত্নটি যদি বা একটুখানি উদারতা দেখাইলেন ত ভাগ্যনিয়ন্তা বাম হইয়া সেই জোড়াগাঁথা নামগুলির কয়েকটিকে খসাইয়া লইয়া চিরসহিষ্ণু, ধৈর্য্যশীলা, শান্তপ্রকৃতি মায়ের বুকটাকে মড়মড়িয়া ভাঙ্গিয়া দিলেন। একটির পর একটি করিয়া স্বর্ণলতা তাঁহার পূর্ণিমা, সুরমা ও সুষমাকে হারাইলেন, বাকী রহিল কেবল তাহাদের সহিত মিল রাখিয়া রাখা নাম সকলের ছোট মেয়েটি নীলিমা। আবার এদিকে অরুণেন্দু, নির্ম্মলেন্দু দুইজন চলিয়া গেল, শুভেন্দু এদের সবার ছোট, সেইটিই শুধু মায়ের কোল জুড়িয়া রহিল। এমনই করিয়াই কৃপণ স্বামীর স্ত্রী স্বর্ণলতা নিজের অশন-বসন-ভোগ বিলাসের একান্ত অভাব সত্বেও সকল দুঃখ, দারিদ্র্য ও অভাবকে তুচ্ছ করিয়া যে মহাধনে নিজেকে ইন্দ্রাণীসমা

বোধ করিয়া গৌরবানন্দে পরিপ্লুতা হইয়া দিনাতিপাত করিতেছিলেন, তাহার প্রায় সবটুকুকেই বিসর্জ্জন দিয়া জীবন্মৃতা হইয়া রহিলেন। সাতটি সন্তানের মধ্যে বাকি ছুইটির উপরই বা কিসের আশা? সদা মনে হারাই, হারাই—এই ভাবে যে পৃথিবীতে বাঁচিয়া থাকা, ইহার চেয়ে মানুষের পক্ষে আর অভিশাপ বুঝি কিছুতেই নাই! তা তেমন করিয়াও মানুষকে প্রায়ই ত বাচিয়া থাকিতে হয় এবং স্বর্ণলতাও রহিলেন।

শুভেন্দু ছেলেটি খুবই মেধাবী বা তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন নয়, তাই বলিয়া ছোটবেলা হইতে যত্নপূর্ব্বক পড়াশুনা করাইলে সে'ও যে 'মানুষ' হইতে পারিতই না, তেমন কোন মন্দ লক্ষণও তাহার শৈশব-জীবনের ইতিহাস বিশ্লেষণ করিলে পাওয়া যাইবে, এমনও মনে পড়ে না। কিন্তু শুভেন্দুব পিতার নাকি ভবিষ্যদ্দর্শনজ্ঞানটা অত্যন্তই প্রবল, তাই তিনি তাঁহার এই একমাত্র পুত্রকে বিদ্যালাভের পক্ষে একান্ত অসমর্থ জানিতে পারিয়া প্রথমাবধিই তাহার জন্য কোন প্রকার যত্ন লয়েন নাই। বিশেষতঃ ছেলেরা আজকাল বিদ্যালয়ে ইংরাজী বিদ্যা শিক্ষা করিয়া একান্ত ধৃষ্ট হইয়া উঠিতেছে ও পিতা-মাতা—বিশেষতঃ পিতাব প্রতি আর যথোচিত বাধ্যতা প্রদর্শন করিতে পারগ হইতেছে না, এই প্রকার হেতুপ্রযুক্ত ইংরাজী বিদ্যা শিক্ষার প্রতি শুভেন্দুর পিতার বিশেষরূপেই একটা প্রচণ্ড বিরাগ ছিল। তবে ইংরাজী বিদ্যা বয়কট করিয়া রাখিয়াও যে ছেলেদের পক্ষে অপর বিদ্যালাভ করিতে পারা সম্ভব, এমন কুতর্ক তুলিবার মত লোক সৌভাগ্যক্রমে এ পরিবারে বা ইহার বাহিরে তেমন কেহই ছিল না, যে একজনমাত্র ছিলেন, তিনি অনুকূলচন্দ্রের একজন বাল্যবন্ধু, নাম তাঁহার ভুবন মোহন রায়, এক্ষণে বহুবর্ষ যাবৎ ছুইজনে সাক্ষাৎ নাই। কাযেই নির্ব্বিরোধে শুভেন্দুর বাধ্যতা-মূলক সু-শিক্ষা চলিতে লাগিল। অর্থাৎ কোনরূপ শিক্ষালাভেরই ব্যবস্থা হইল না।

বিদ্যা তাহার পাঠশালা, বাঙ্গালা স্কুল প্রভৃতি হইতে আর ঊর্দ্ধসীমায় উঠিতে পাইল না। এত দিনের পর হঠাৎ একদা একটা সুযোগ যদিও বা নিজে হইতেই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাও তার ভাগ্যক্রমে ব্যর্থ হইয়া গেল।

অনুকূলের বাল্যবন্ধু ভুবনমোহন একটা মোকদ্দমায় আসিয়া এক বেলার জন্য বন্ধুগৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেখানে ডাল-ভাত, সজিনাখাড়া চচ্চড়ি, মৌরলা মাছের অম্বল ও খয়রা মাছ ভাজার পরিবর্ত্তে তিনি বন্ধু-কন্যা নীলিমার হাতে এক জোড়া সোনার ইয়ারিং গুঁজিয়া দিলেন এবং বন্ধুর সঙ্গে বিস্তর তর্কাতর্কির পর বন্ধুপুত্র শুভেন্দুকে বিদ্যা-শিক্ষার্থ নিজের সঙ্গে লইয়া যাইতে চাহিলেন। বন্ধুর হাতে ছেলে দিলে খরচের ভাবনা নাই, সে কথা অনুকূলও জানিতেন এবং বন্ধুও প্রথমাবধি সে ভরসা দিয়াছিলেন। ইহাতে অসম্মতির কিছুই ছিল না, বরং শুভেন্দুর উপর যেটুকু খরচ পড়ে, সেটুকু শুদ্ধ বাঁচাইতে পারা যাইবে। কিন্তু দূরদৃষ্টিসম্পন্ন বিচক্ষণ ব্যক্তি অনুকূল সুদূর ভবিষ্যতে তাঁহার এই ইংরাজীশিক্ষিত উত্তরাধিকারীর কথা মনে করিতেই সর্ব্বাঙ্গে শিহরিয়া উঠিলেন। ইংরাজী শিখিলে সে কি তখন আর এই ভাঙ্গা বাড়ীতে বাস করিবে, বাপের মত আটহাতি ধুতী বেনিয়ান পরিবে, না চানাভিজা ও গুড় দিয়া জলখাবার খাইতে রাজী হইবে? উঃ, তখন হয় ত ডসনের জুতায়, আদ্দির পাঞ্জাবীতে ও মাংসের কাটলেটে তাঁহার বুকের রক্তস্বরূপ টাকা কয়টা দুইদিনের মধ্যেই উড়াইয়া দিয়া শুভেন্দু পথে পথে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইবে। এই দুশ্চিন্তা মনে উদিত হইবামাত্র তিনি উঠিয়া তীব্র ও অকাট্য প্রতিবাদ তুলিলেন; বলিলেন, "মরাহাজা একটামাত্র ছেলে; ওর মা ওকে ছেড়ে থাকতে কিছুতেই রাজী হবে না।"

ভুবনমোহন তৎক্ষণাৎ নীলিমার দিকে ফিরিয়া কহিলেন, "তোমার মা'কে এই দোরের পাশে এসে দাঁড়াতে বল তো, খুকি! আর তাঁকে জিজ্ঞাসা করো, শুভেন্দুকে আমার সঙ্গে লেখাপড়া শেখার জন্য পাঠিয়ে দিতে তাঁর কোন অমত আছে কি না ?"

অনুকূল নেপথ্যে অবস্থিতা পত্নীকে সম্বোধন করিয়া প্রথমেই বলিয়া উঠিলেন, "বেশ ক'রে ভেবে চিন্তে দেখ, গিন্নি! হঠাৎ একটা খাম-খেয়ালী ভাবে যেন কিছু ক'বে বসো না। ছেলে ছেড়ে দিয়ে যে শেষ-কালে প্যান প্যান ক'বে কাঁদতে বসবে, সেটি যেন হয় না দেখ; তাতে তোমাব আবার বুকের ব্যামো আছে।"

নীলিমার মুখ দিয়া স্বর্ণলতা জানাইলেন, ছেলে ছাড়িয়া তিনি একদিনও টি`কিতে পাবিবেন না।

হিতকামী সুহৃদ্ সুদীর্ঘ নিশ্বাসসহকারে বিদায় লইলেন। যাইবার পূর্ব্বে তিনি আর একবার গৃহস্বামীব অজ্ঞাতে তাঁহার বালিকা কন্যাদ্বারা পুত্রস্নেহে তাহার ভবিষ্যৎ শুভাশুভ সম্বন্ধে বিচারশক্তিহীনা জননীর নিকট এ সম্বন্ধে বিস্তৃত দরখাস্ত পাঠাইয়া এ৫ একই উত্তর পাইয়া-ছিলেন।

স্বর্ণলতার যদিও নিজ সন্তানের সম্বন্ধে এতবড় অবিচার করিতে বুক ফাটিয়া গেল, কণ্ঠ চাপিয়া আসিল, শেষে চোখের জলে বুক ভাসিল, তথাপি স্বামীর আদেশের বিরুদ্ধে একটি কথাও তাঁহার ঠোঁট দিয়া বাহির হইয়া আসিল না। নতুবা ভদ্র ঘবের মেয়ে স্বর্ণলতা নিজ সন্তানের শুভা-শুভ সম্বন্ধে যে জ্ঞানগম্যহারা হইয়া নিজের খেয়ালেই তাহাকে কাছে টানিয়া রাখিলেন, তা নয়। আসল কথা, অনুকূলচন্দ্রের স্ত্রী স্বর্ণলতা যদিও বয়স ও পদমর্য্যায় গৃহিণী, জননী এবং এমন কি, তাঁহার প্রথম সন্তানগুলি বাঁচিয়া থাকিলে এতদিনে শ্বশ্রূমাতায় পদবীতেও উন্নীত হইতে পারিতেন,

তথাপি স্বভাবে আজও তিনি সেই নবোঢ়া বালিকারই ন্যায় তাঁহার স্বামীর কাছে ভয় সঙ্কুচিতা হইয়া আছেন। সংসারে এক এক জন মানুষ দেখা যায়, যাহাদের দেখিলেই মনে হয়, তাহারা যেন জগতে কেবলমাত্র অত্যাচারিত হইবার জন্যই আসিয়া পৌঁছিয়াছে। স্বামী পুত্র ত বটেই, পাড়াপ্রতিবেশীরাও সুযোগ পাইলে তাহাদের সম্বন্ধে একটুখানি না একটুখানি অবিচার করিয়া লয় এবং তাহারাও নির্ব্বিরোধে উহা সহ্য করে। আবার শুধুই যে সহ্য করে, তাও নয়; তাহাদের প্রতি যে কোন অন্যায় হইতেছে, এমন কথা মুখে ত নহেই—পরন্তু তাহাদের মনেও হয় ত পড়ে না। চিরদিনটা অত্যাচার সহিয়া ঐ জিনিষটাই যেন জগতের কাছে উহাদের একমাত্র পাওনা হইয়া দাঁড়াইয়াছে, এই রকমই একটা বিশ্বাস নিজের মনেও জন্মিয়া যায়। স্বর্ণলতা লোকটিও ঠিক এই প্রকৃতির। দশ বছরে বিবাহ হইয়া "বউ-কাটকী" শাশুড়ীর হাতে অশেষবিধ লাঞ্ছনা সহিয়াছেন, বাপের বাড়ী হইতে তত্ত্ব-তাবাসের ত্রুটি ঘটিলে তাঁহার গালি খাওয়ার অন্ত থাকিত না। একবার কি একটু প্রতিবাদ করিতে যাওয়ায় ইঁহার শাশুড়ী ঠাকুরাণী বধূর মুখে জ্বলন্ত দিয়াশলাইএর কাঠি চাপিয়া ধরিয়া "বউ মানুষের চোপা" করার এমন এক শাস্তির বিধান করিয়াছিলেন যে, বধূর মুখ সেই দিন হইতে ছুঁচসূতা দিয়া শিলাই করিয়া দিলেও এর চেয়ে বেশী করিয়া আর বন্ধ করিতে পারা সম্ভব হইত না। সেই যে বালিকা স্বর্ণলতা তাঁহার প্রতি শাশুড়ীর সকল অত্যাচারকে নীরবে সহিয়া লইতে আরম্ভ করিলেন, আজও এই প্রৌঢ়া গৃহিণী ঠিক তেমন ভাবেই দেব-মানবের সকল অত্যাচারকেই "চিন্তারহিত" কি না বলা যায় না—তবে "বিলাপরহিত" ও অপ্রতীকারপূর্ব্বক নীরবে সহ্য করিয়া চলিতেছেন। দৈববিপাকের বিরুদ্ধে দেবতাকেও তিনি কোন দিন

দোষী করেন নাই এবং মানুষকেও না। এমন কি, নিজের ভাগ্যকে পর্য্যন্ত কোন দিন তাঁহাকে নিন্দা করিতেও কেহ শুনিতে পায় নাই।

স্বর্ণলতার বিবাহ হয় বৈশাখমাসে। দারুণ গ্রীষ্ম বিবাহের সময় বলিয়া শয্যাদানের সঙ্গে তাঁর বাপ তাঁকে গায়ে দিবার লেপ দেন নাই; আবার দুর্ভাগ্যক্রমে ঘর-বসতও হইল আশ্বিনে। তখনও তাই লেপখানি দিতে বাদ পড়িল। পৌষমাসের কনকনে শীতে তাঁর শাশুড়ী তাঁহাকে গায়ে দিতে একখানি পুরাতন কাঁথা দিয়া বলিলেন, "বাপ মিন্‌ষে লেপ দিলে না যে, আমি কোথা থেকে কি দেবো? তার মেয়ের জন্যে ঘরের পয়সা ভেঙ্গে লেপ কি আবার তৈরী কর্‌তে যাব না কি? ঐ গায়ে দিক।" তা এখনও প্রায় সেই এক ব্যবস্থাই তাঁহার জন্য চলিতেছে। শাশুড়ী মরণকালে নিজের প্রতিনিধিত্বে যে ছেলে রাখিয়া গিয়াছেন, তদ্দ্বারা মাতৃবাক্যের অবমাননা ঘটিতে পায় নাই।

অনুকূল স্ত্রীকে সংসার খরচ করিতে মাসে পঁচিশটী করিয়া টাকা দিতেন, ইহার ভিতর অশন বসন সমস্তই চালাইতে হইত। ইদানীং স্ত্রীর হাতে বাজে খরচ হইতেছে বুঝিতে পারিয়া, তাঁহাকে নিজের হাতেই সমস্ত খরচপত্র রাখিতে হইয়াছে। তবে স্ত্রীর সম্বন্ধে তিনি নাকি নিতান্তই অবিচার করিতে পারেন না; তাই ছয় মাস অন্তর যখন কোম্পানীর কাগজের সুদ বাহির করা হয়, তখন দুই তিন টাকা করিয়া তিনি স্ত্রীর হাতে দিয়া থাকেন। কারণ, ঐ টাকার মধ্যে হাজার পাঁচেক টাকা স্বর্ণলতার বাপের বাড়ী হইতে পাওয়া গিয়াছিল। মা-বাপের মৃত্যুতে তাঁহাদের একমাত্র সন্তান স্বর্ণ, শুধু ঐ টাকা কেন, আরও অনেক কিছু লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি ভুলিয়াও কোন সময় সে সকল সম্বন্ধে কোন কথাটি পর্য্যন্ত ভাবিয়া দেখিতেন না। স্বামী হাতে তুলিয়া হেলায় শ্রদ্ধায় যেটুকু দিতেন, সেইটুকুই কি তিনি

ভরসা করিয়া খরচ করিতে পারিতেন? যদি কোন দিন খরচের হিসাব চাহেন? অব্যবহারে সকল জিনিষেই যেমন মরিচা ধরে, এ মেয়েটির সমস্ত মনোবৃত্তিরই বোধ করি সেই রকম দুরবস্থা ঘটিয়া থাকিবে। তবে তাঁহার চিত্তবৃত্তির একটা অংশ খুব সজাগ ছিল—সেটা ভয়।

বয়সে বৃদ্ধা না হইলেও ইহারই ভিতরে স্বর্ণলতাকে অনুকুলচন্দ্রের দিদির বয়সী মনে করিতে পারা যাইত। তাঁহার গায়ের রং এক সময় বেশ উজ্জ্বল ছিল, আজও তাহার আভাস তাঁহার অত্যন্ত শীর্ণ ও অযথা লোল চর্ম্মের উপর দিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার দীর্ঘ দেহ ইহার মধ্যেই মধ্যভাগে যেন নত হইয়া হেলিয়া পড়িয়াছিল। ললাটের শুষ্ক চর্ম্ম রেখায় রেখায় ভরিয়া উঠিয়াছিল। মাথার চুলের অর্দ্ধেকগুলি শুভ্রবর্ণ ধারণ করিয়াছিল। গালের মাংস লোপ হইয়া, গায়ের মাংস শীর্ণ হইয়া তাঁহাকে যেন একটি রসহীন আতপশুষ্ক ফলের মতই দেখাইত। কিন্তু তাঁহার সচকিত ভীত দৃষ্টির মধ্য দিয়া এবং স্তব্ধ মৌন শান্ত অধরের অভ্যন্তর হইতে এখনও যেন একটি অতৃপ্ত বালিকাজীবনের সাড়া খুঁজিয়া পাওয়া যায়। শুষ্ক বালুরাশির তলদেশে এখনও যেন অনেকখানি স্বচ্ছ শীতল সলিল কোথায় লুকান আছে বলিয়াও একটা সন্দেহ জাগে। কিন্তু দর্শকের সে সন্দেহভঞ্জন করিবার কোনই পথ ছিল না, দ্বারে তার কড়া পাহারা।

যাহা হউক, এইরূপে "মাতা শত্রু" এবং "পিতা বৈরী" হইয়া তাঁহাদের বালকটির পড়া-শুনার পথে যখন কণ্টকবৃক্ষ রোপণ করিয়া বসিলেন, তখন কোথা হইতে আর এক অদৃশ্যশক্তি আসিয়া আর একটা অভাগা জীবের আশ্চর্য্যরূপ সহায়তা করিয়া বসিল। পাড়ার নরহরি ভট্টাচার্য্যের এক বয়স্থা অনূঢ়া কন্যা স্থানীয় বালিকাবিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিত বলিয়া অনেকেই—বিশেষ করিয়া আবার

অনুকূলচন্দ্রই সে বেচারাকে নাকের জলে চোখের জলে করিয়া ছাড়িয়াছিল। হঠাৎ এক দিন দেখা গেল, এক মোটা মাহিনার মধ্যবয়সী রাজকর্ম্মচারী তাঁহার দ্বিতীয় পক্ষের জন্য সেই বয়স্থা ও লেখাপড়াজানা মেয়েকে, তাহার সৌন্দর্য্যহীনতাকে তুচ্ছ করিয়াও, বিনা পণে বা সামান্য পণে বিবাহ করিতে প্রস্তুত হইলেন। বিবাহসভায় বরকে এ সম্বন্ধে প্রশ্ন পর্য্যন্ত করা হইয়াছিল, তাহাতে বরটি গম্ভীরমুখে উত্তর দেন যে, "গায়ের চামড়া একটু কটা পাওয়া যাইতে পারে, পয়সাও অকিঞ্চিৎকর নয়, কিন্তু স্ত্রীকে 'ক খ' শেখাইতে বসার পরিশ্রম উহার দ্বারা পোষাইয়া উঠে না। এই মেয়েটী সেলাই জানে, হাতের লেখা ভাল; গান-বাজনাও জানা আছে, ছোট ছেলেমেয়েদের কতকটা শিক্ষাও দিতে পারিয়া আমার ভার লাঘব করিবে।"

এই ঘটনায় অনুকূলচন্দ্রের চোখ ফুটিয়া গেল। তিনি বাড়ী আসিয়া স্ত্রীকে ডাকিয়া বলিলেন, "বলি গিন্নি! ওগো! বলি শুন্‌চো? কাল থেকে আমি নীলিকে মেয়ে স্কুলে ভর্ত্তি ক'রে দেবার সব ঠিকঠাক ক'রে এসেছি, এবার কিন্তু আর তোমার কাঁদুনী শুন্‌চিনে যে, মেয়ে ছেড়ে সারাদিন কেমন ক'রে থাক্‌বো! সেটি আর তোমার হচ্ছে না, বাপু। আজকালের দিনে মেয়েছেলের একটু নেকাপড়ার দরকার হয়েছে।"

স্বর্ণলতা অবাক্ হইয়া স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, তিনি যে কি শুনিতে কি শুনিলেন, তাহাই যেন ভাল করিয়া বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। যে বাড়ীতে ছেলের বিদ্যাশিক্ষা নিষেধ, সেই বাড়ীর মেয়ে চলিল কি না স্কুলে ভর্ত্তি হইতে?

কিন্তু বিশ্বাস তাঁহাকে করিতেই হইল। ইহার পরদিন সকালে যখন ঘড় ঘড় হড় হড় শব্দে মেয়ে স্কুলের গাড়ী আসিয়া তাঁহাদের দরজায় দাঁড়াইল এবং অনুকূল আস্তে ব্যস্তে আসিয়া মেয়েকে সঙ্গে করিয়া

লইয়া গিয়া তখনই সেই গাড়ীর সঙ্গে আগতা স্কুলের দাইয়ের হাতে হাতে সঁপিয়া দিলেন।

শুভেন্দু আসিয়া অভিমানে জলভরা চোখে মা'র গা-ঘেঁসিয়া দাঁড়াইল, ক্ষুব্ধ-কণ্ঠে সে প্রশ্ন করিল, "নীলিকে যে স্কুলে পাঠান হলো বড় ?"

স্বর্ণলতা এদিক ওদিক চাহিয়া নিম্নস্বরে কহিলেন, "ওঁর ইচ্ছা হলো, বাবা।"

শুভেন্দু বলিল, "তা'হলে আমার বেলাই বা হলো না কেন ওঁর ইচ্ছাটা ?"

স্বর্ণলতা চকিতে ছেলের দিকে চাহিয়া সভয়ে কহিয়া উঠিলেন, "চুপ কর, শুভেন্দু !"

শুভেন্দু একবার নিজের পিছনটায় চঞ্চল দৃষ্টিপাত করিয়া লইল, তাহার পর সে দিক দিয়া উপস্থিত আশঙ্কার কারণ না দেখিয়া সে দৃঢ় এবং রূঢ়কণ্ঠে পুনশ্চ নিজের বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া কহিল—

"কেন ইস্কুলে পড়লে যদি খারাপ হয়ে যায়, তা হ'লে নীলিই বা হবে না কেন ? ও কি চাকরী ক'রে পয়সা এনে তোমাদের খাওয়াবে না কি ? ও যদি পড়তে যেতে পারে তো আমিই বা তা পাবো না কেন, শুনি ? আমাকেও দিতে হবে ভর্ত্তি ক'রে ইস্কুলে। নিশ্চয়ই দিতে হবে।"

স্বর্ণলতা তখন একখানা ছেঁড়া কাঁথার উপর আর একখানা পুরাতন কাপড়ের আচ্ছাদন দিয়া তাহা ব্যবহারোপযোগী করিতেছিলেন, সেলাই ফেলিয়া উঠিয়া আসিলেন এবং সস্নেহে ও সভয়ে ছেলের একটা হাত হাতে ধরিয়া তাহাকে শান্ত করিবার চেষ্টা করিতে করিতে মৃদু ও ভীতকণ্ঠে কহিতে লাগিলেন, "ইংরেজী পড়া উনি পছন্দ করেন না

তাই জন্যেই ত তোমায় ইস্কুলে দেন নি, নইলে আর দিতে কি? নীলি ত আর ইংরেজী পড়্চে না, ও এখন দ্বিতীয় ভাগ বর্ণপরিচয় পড়্চে বৈ ত না, তুমি এ নিয়ে আর গোলমাল করো না, লক্ষ্মী গোপাল আমার!"

শুভেন্দু গা-ঝাড়া দিয়া মায়ের হাত গায়ের উপর হইতে ঠেলিয়া ফেলিল। উদ্ধত তীক্ষ্ণকণ্ঠে সে ঝাঁজের সঙ্গে কহিল, "হুঁ—গোল কর্‌বে না বই কি! 'লক্ষ্মী-গোপাল' বৈ কি! আমি কিসের লক্ষ্মী গোপাল! সে ত তোমাদের ঐ ধীঙ্গি আহ্লাদী নীলি। বা রে মজা! মুখপুড়ী মেয়ে, সকালবেলা খেয়ে দেয়ে গাড়ী চড়ে ইস্কুল যাবেন, পড়তে শিখ্‌বেন, আর আমি বাড়ীতে সব্বার পাত কুড়িয়ে খাব, গরুর খড় কাট্‌বো—নেদি কুড়ুবো—বা রে মজা!"

ক্ষীণ ও শুষ্ককণ্ঠে মা বলিতে আরম্ভ করিলেন, "ছেলেদের ইস্কুলে অনেক খারাপ ছেলে আছে কি না,—সেই জন্যই ত দিতে পারেন না, না হ'লে তুমিও ত পড়তে। সে বার বিপিনের সঙ্গে কি রকম মারামারি করেছিলে মনে নেই?—তাইতেই ত ছাড়িয়ে নিতে হ'লো—"

শুভেন্দু চীৎকার করিয়া উঠিল—"মিথ্যে কথা—মিথ্যে কথা; তোমাদের ও-সব চালাকি আমি খুব বুঝি! দেশ শুদ্ধ সব ছেলেই ইস্কুলে যাচ্ছে, আর আমি গেলেই নাকি বয়ে যাব? আচ্ছা, দেখ তা হ'লে, আমি বাড়ীতে থেকে বয়ে যেতে পারি কি না! এবার থেকে যত সব মন্দ ছেলে বেছে বেছে তাদের সঙ্গেই বেড়াবো। দেখছো ত ইস্কুল ছেড়ে অবধি সারাদিনই ঘুড়ি ওড়াই আর লাট্টু খেলি? এখন থেকে কেবলই ঘুড়ি ওড়াবো, লাট্টু খেলাবো, কপাটী খেলাবো, সাঁতার দোব, এই সব দিনরাত কর্‌বো, তোমাদের গরুর খড় কুচুতে বল্লে শুনছি তাই কলা—"

জীর্ণ বহির্দ্বারে মনুষ্যপ্রবেশজনিত যে শব্দটা শুনা গেল, তাহাতেই

এই বালক-বীরের বীররসে কিছু বাধা পড়িয়াছিল। পরক্ষণেই শুক্‌নো ও ছেঁড়া চটির যে চিরশ্রুত অপূর্ব্ব বাদ্যধ্বনি উত্থিত হইল, তাহাতেই একেবারে সকল বীরত্বে জলাঞ্জলি দিয়া সে শুষ্ক ও বিপন্নমুখে তাহার বিপরীত দিকে ছুটিয়া পলাইল।

স্বর্ণলতার গভীর ভারাক্রান্ত অন্তর ভেদ করিয়া একটা কষ্টবহুল সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস এতক্ষণের পর উত্থিত হইয়া আসিল, কারণ ছেলের সাক্ষাতে এতটুকু স্বাধীনতাও তিনি গ্রহণ করিতে ভরসা করেন নাই।

বলা বাহুল্য, ঐ ছেঁড়া চটির অধিকারী ব্যক্তি তাঁহারই স্বামী।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

স্কুলের ছুটীর পর সকল মেয়েই যখন বাড়ী ফিরিবার জন্য হুড়াহুড়ি করিয়া গাড়ীর চারিপাশে জড় হইয়াছে এবং একে একে বা এক সঙ্গেই দুইজনে লাফালাফি করিয়া আগে উঠিবার চেষ্টায় সোরগোল লাগাইয়া দিয়াছে; বারান্দার উপর হইতে বিদ্যালয়ের প্রধানা শিক্ষয়িত্রী তখন ডাকিয়া বলিলেন, "নীলিমা! শুনে যাও।"

এই আহ্বান পাইয়াই নীলিমার মুখ একটুখানি ম্লান হইয়া আসিল। সুলোচনাদি' কি জন্য যে তাহাকে ডাকিতেছেন, সে কথা তার ত আর অজ্ঞাত নয় এবং এরূপভাবে আহ্বান পাওয়াও তো আর তার পক্ষে এই প্রথমবার নহে। ভয়ে ভয়ে ফিরিয়া আসিয়া সে নতমুখে তাঁর সাম্‌নে দাঁড়াইল।

সুলোচনা বসু পূর্ব্বে বালিকা-বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শিক্ষয়িত্রী থাকিলেও এক্ষণে প্রতিনিধিত্বে তিনিই প্রধানার পদ অধিকার করিয়া আছেন, নীলিমা কাছে আসিতেই নিজের পদমর্য্যাদার উপযুক্ত গাম্ভীর্য্যের সহিত তাহাকে প্রশ্ন করিলেন, "তোমার বাবাকে সে চিঠি দিয়াছিলে?"

নীলিমা নতনেত্রে ঘাড় নাড়িয়া জানাইল যে, সে তাহা দিয়াছিল।

"কি বল্লেন তিনি?"

নীলিমার কপালে একটু একটু ঘাম দেখা দিল। তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, সে কথা বলিবার শক্তি বা সাহস তাহার প্রাণে থাকিলে তবেই ত সে তাহা বলিবে? আবার মিথ্যা কথা বানাইয়া বলিবার অভ্যাস তাহাও সে কোন দিন করে নাই। কাযে কাযেই অত্যন্ত বিপন্ন ও অতিশয়

বিমর্ষভাবে সে নিজের পায়ের আঙ্গুল দিয়া মাটী খুঁটিতে লাগিল, মুখ দিয়া তাহার একটি শব্দও বাহির হইল না।

তিনি যে 'কি বলিলেন'—এ প্রশ্নের উত্তর এর চেয়ে আর বেশী সরল ভাষায় পাওয়া সম্ভব ছিল না, সুলোচনা বসুও তাহা বুঝিতেন। তাই মনে মনে এদের পরে অত্যন্ত বিরক্ত হইলেও বাহিরে তিনি আর এই বিপন্ন জীবটিকে অধিকতর বিপদ্‌গ্রস্ত করিতে ইচ্ছুক হইলেন না; শুধু স্বভাবসিদ্ধ তীক্ষ্ণ গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "প্রায় তিন বৎসর তুমি এখানে ভর্ত্তি হ'য়েছ, কিন্তু এ পর্য্যন্ত আমরা তোমার মাহিনার দরুণ একটি পয়সাও কখন পাইনি। বেশী পীড়াপীড়ি হ'লে পাছে তোমায় ছাড়িয়ে নে'ন, সেই জন্য মায়া ক'রে আমরাও তাঁকে তার জন্য বড় একটা ব্যস্ত করিনি, সে ত তুমি সব জানোই? কিন্তু এখন আর কারুকে 'ফ্রি' রাখা সম্ভব হচ্ছে না, স্কুলের গবর্ণমেণ্ট 'এড্' প্রায় অর্দ্ধেক হ'য়ে গিয়েছে। নানা রকমে খরচ বেড়েছে, সেইজন্য সকল ক্লাসের মেয়েদেরই কিছু কিছু মাইনে বাড়াতে হ'লো। যে সব টাকা অনাদায়ী হ'য়ে পড়ে আছে, সে সব আদায়ের জন্য উপর থেকে কড়া হুকুম এসেছে। এ সব না হ'লে আমাদের চাকরীতেও টান পড়তে পারে, এমন সম্ভাবনারও আভাস এবার ইন্‌স্‌পেকট্রেস মিস্ বিল দিয়ে গেছেন। তোমার বাবাকে সব কথাই বেশ করে খুলে লেখা হয়েছিল, তাতেও ত তিনি দিব্যি নীরব হ'য়ে রইলেন। তা, তা হ'লে আর কি করা যাবে বলো? এই চিঠিটা আবার আজ দাওগে, পনের দিনের মধ্যে হয় অন্ততঃ অর্দ্ধেকটা পাওনা দিয়ে দিন, না হয় ত' তোমাকে আর কেমন ক'রে চিরদিন ধ'রে এম্‌নিতে পড়ান যায়? এটা অন্যের পক্ষে বড্ডই ব্যাড-একজাম্‌পল হচ্ছে, অর্থাৎ কি না দৃষ্টান্তটা তো ভাল হচ্ছে না। তোমার নজীর সব্বাই দিতে আরম্ভ করেছে, বড্ড অসুবিধায় পড়া গেছে। বুঝ্‌তে পার্‌লে?"

নীলিমার দুইটি চোখে জল ভরিয়া উঠিয়াছিল, পাছে সে জল প্রভাত কালের শিশিরের মত মাটীর বুকে ঝরিয়া পড়ে, সেই ভয়ে সে নিজেকে সম্বরণ করিতে করিতে কোন মতে একটুখানি ঘাড় নাড়িয়া জানাইল যে, সে বুঝিয়াছে। তার পর অন্যদিকে মুখ করিয়া সে হাত পাতিয়া সুলোচনা বসু প্রদত্ত খামে আঁটা চিঠিটা লইল।

নীলিমার সঙ্গিনিগণ তাহার হাতের খামখানায় কি লেখা আছে, দেখিবার জন্য তাহাকে ঝাঁক বাঁধিয়া ঘেরিয়া ফেলিল।—"দেখি, দেখি, আজ আবার কার নামের চিঠি এলো? 'অনুকূলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এস্কোয়ার'। অ ভাই! রোজ রোজ সুলোচনাদি' তোর বাবাকে কি সব এত লেখেন ভাই? কই আমাদের বাবাদের ত কই তিনি কিচ্ছুই লেখেন না!"

মনোরমার সেই দুই কাঠির বোনাটা এখন অনেকখানি লম্বা হইয়া গিয়াছিল, সেইজন্য এখন সেটাতে ন্যাক্‌ড়া জড়াইয়া পিন আঁটিয়া সেটাকে বলের মতন গোলাকারে ঝুলাইয়া রাখা হইয়াছিল। গাড়ী চলার সঙ্গে সঙ্গেই সে বোনাটা হাতে লইয়া প্রথম প্রশ্নকারিণীকে লক্ষ্য করিয়া একটা বাণ ছুড়িল—"মালতী! তুই যেন কি! তোর বাবা গবর্ণমেন্টের উকীল, মাসে দু'হাজার টাকা রোজগার করেন, তোর স্কুলের মাইনে কি কখনও দিতে বাদ পড়ে থাকে যে, তোর বাবার কাছে সুলোচনাদি'র চিঠি যাবে?"

প্রতিমা অমনি টানা সুরে ঘাড় দোলাইয়া বলিয়া উঠিল, "ও মা তাই! সেইজন্যেই সুলোচনাদি' বারান্দা থেকে যক্ষনি নীলিমা ব'লে ডাক্‌লেন, তক্ষনিই নীলির মুখটি শুকিয়ে যেন এতটুকুখানি হ'য়ে গিছ্‌লো। তুমি নিশ্চয় তখনই বুঝ্‌তে পেরেছিলে, না নীলিমা?"

নীলিমা নীরবে একটা ঢোক গিলিল, কথা কহিল না।

মনোরমা তাহার ছোটবোন প্রতিমার দিকে তীব্রদৃষ্টি হানিয়া

ক্ষুরবাণের মত তীক্ষ্ণস্বরে কহিল, "পিসী, কি যে বলে! ও নাকি আর তাই বুঝতে পারেনি? এই ত আর প্রথমবার ওর হাত দিয়ে ওর বাবার কাছে তাগিদের চিঠি পাঠান হয়নি যে, ওর বুঝতে বাধ্‌বে! ও' ত', ও, আমিও ত' যেই সুলোচনাদি' ওকে ডেকে বলেচেন, 'নীলিমা শুনে যাও'—তক্ষুণি বুঝ্‌তে পেরেচি যে, কি জন্যে তিনি ওকে ডাকচেন।"

অনুকা বলিল, "আমিও ভাই।"

সাবিত্রী মেয়েটী সকলের পিছনে বসিয়াছিল, সে সেখান হইতে মুখ বাড়াইয়া দিয়া করকাপাত তুল্য খন্‌খনে কঠিন স্বরে নীলিমাকে লক্ষ্য করিয়া কহিয়া উঠিল, "তা নীলিমা! তোমার বাবাকে তুমি স্কুলের মাইনেটা দিয়ে দিতে বল্‌তে পার না? সত্যিই ত বার মাস ত্রিশ দিন ওঁরা কি তোমায় 'ফ্রি'তেই পড়াবেন না কি? কি অন্যায় তোমাদের!"

শুনিয়া দুই একজন মেয়ে পরস্পর মুখ চাওয়াচায়ী করিয়া ব্যঙ্গের হাসি হাসিল, কিন্তু মনোরমা মেয়েটি নাকি কাহারও কোন অসৈরণ সহিতে একেবারেই অভ্যস্থা নহে, কাজেই সে সোজাসুজি খপ করিয়া অম্‌নি বলিয়া বসিল—"সত্যি নাকি, সাবি! অন্যায় না কি? তা হ'লে তোমার দাদামশাই সেই অন্যায়টা কি ক'রে করে থাকেন, ভাই? আমি এই সে দিন সুলোচনাদি'র সঙ্গে রামদীন চাপরাসীর কথা হচ্ছিল শুনেছি, যে তোমারও তো সাত আট মাসের মাইনে আদায় করতে বেচারী ঘোলখেয়ে যাচ্ছে। তা তুমিই বা এমন অন্যায় সইচো কি করে?"

তখন দলপতিকে (পত্নী?) ফিরিতে দেখিয়া ছাত্রী সমিতির মধ্যেরও হাওয়া বদলাইয়া গেল। সুষমা তখনি তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "আর ও বেচারী তার বাবাকে কেমন করেই বা টাকার জন্য তাগিদ দেবে, ভাই? সে বরঞ্চ সুলোচনাদি'রাই দিতে পারেন।"

সাবিত্রী মেয়েটি মেয়েদের স্কুলের মধ্যে নাকি কলহ-বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শিনী।—তবে এ বিষয়ে প্রথম পুরস্কারলাভ অবশ্য এ পর্য্যন্ত সে যে করিতে পারে নাই, তাহার কারণ, ওই বিষয়ে স্কুলে কোন প্রাইজ এখন পর্য্যন্ত দিবার ব্যবস্থা ছিল না, থাকিলে মনোরমার পরিবর্ত্তে বোধ করি সে-ই সেটা পাইত। তবে তাদের 'ব্র্যাকেটে' পাশ করাও নেহাৎ অসম্ভব ছিল না। কারণ, হাঁক-ডাক কম থাকিলেই যে নৈপুণ্যের অভাব বুঝায়, তাহা নহে। বরং টিপিয়া টিপিয়া চোখা চোখা শবক্ষেপ করিতে জানাতেই সমধিক সময় পটুত্ব বুঝায়। এখন মনোরমার মন্তব্য শুনিয়া বড় বড় ড্যাব্‌ডেবে দুই চোখকে গোল করিয়া পাকাইয়া সাবিত্রী যেন বাঘের মত গর্জ্জিয়া তাহার শত্রু পক্ষের উপর হুম্‌কি দিয়া উঠিল, "বলি মোনা! তোর যে বড্ডই চ্যাটাং চ্যাটাং কথা হয়েছে দেখ্‌তে পাই? আমাদের বাপ-দাদারা আমাদের মাইনের টাকা ইস্কুলকে দেয় বা না দেয়, তোর তাতে কি আসে যায় শুনি? তুই যা খুসী তাই ট্যাক্‌ ট্যাক্‌ ক'রে বল্‌বি ক্যান্‌লা? ফের যদি কখন আমার সঙ্গে লাগ্‌তে আস্‌বি তা হ'লে—"

"কি, মার্‌বি না কি? সুষমা, লীলা, অম্বুকা সব্বাই সাক্ষী থাক্‌লি, এর যদি না আমি একটা প্রতীকার করি তা হ'লে—"

"কি প্রতীকার কর্‌বি লো? জেলে দিবি না ফাঁসি কাঠে ঝোলাবি?"

এইরূপ সলজ্জ আস্ফালনে পথের দুই সারি লোকের চিত্তাকর্ষণ করিতে করিতে নেপথ্যচারিণিগণ নিজ নিজ গৃহাভিমুখিনী হইলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

যদিও সে সময়টা অনুকূলচন্দ্রের বাড়ী থাকিবার সময় নয়, তথাপি কি ঘটিতে কি ঘটে, দৈবের কথা বলাও ত যায় না, তাই বাড়ী ঢুকিয়া নীলিমা সতর্ক চঞ্চল দৃষ্টিতে একবার এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিল ও তাহার পর কতকটা আশ্বস্তচিত্তে ঈষৎ দ্রুতপদে অগ্রসর হইতে হইতে অনতি উচ্চকণ্ঠে ডাকিল, "মা!"

"এস, মা, এস!"—বলিতে বলিতে ক্ষীণাঙ্গী ক্লান্তমূর্ত্তি জননী তাড়াতাড়ি হাতের কাজটা ছাড়িয়া দিয়া উঠিয়া আসিলেন। তিনি তখন বাড়ীতে বসান যাঁতায় চারিটি গম লইয়া স্বামীর রাত্রিতে রুটি খাওয়ার জন্য আটা পিষিতেছিলেন।

"এস, মা, এস—আহা, মুখটি শুকিয়ে গেছে রে! সারাদিনটাই উপোসে গেল। মুখ হাত ধুয়ে রান্নাঘরে আয়, চারটি ভাত শেষ ক'রে ফুটিয়ে রেখেছি, একটু দুধচিনি দিয়ে খাবি, চল্।"

নীলিমার পেটের মধ্যে যে রকমের উগ্র জ্বালা ছিল, তাহাতে তাহার অপমানাহত ক্রুদ্ধ মন ওই শুভ সংবাদেই জুড়াইয়া জল হইয়া যাইতে পারিত; কিন্তু উপর্য্যুপরি ক্রমাগত তিরস্কার ও বিদ্রূপ সহিয়া সহিয়া আজ তাহার পূর্ণ উপবাসী শরীর-মন বড় বেশী রকম তাতিয়া উঠিয়াছিল, তাই সে মায়ের দেওয়া ঐ সুখবরকে আদৌ আমলে না আনিয়াই উদ্ধত-কণ্ঠে কহিয়া উঠিল, "যাও, আমি তোমার দুধ-ভাত খেতে চাইনে; আমার ইস্কুলের মাইনেটা তোমরা দিয়ে দিবে কি না, তাই এখন স্পষ্ট ক'রে বলো ত?"

স্বর্ণলতার ভরাচিত্ত গুটাইয়া যেন এতটুকু ছোট হইয়া আসিল।

মেয়ের মনের মধ্যে কিসের যে আগুন লাগিয়া রহিয়াছে, মুহূর্ত্তের মধ্যে তাহা বুঝিয়া ফেলিয়া তিনি অপরাধী ভাবে মাথা নত করিলেন। এই যে প্রশ্ন তাঁহাকে করা হইল, তাহার স্পষ্ট ছাড়িয়া অস্পষ্ট একটা জবাবও যে তাঁহার ঠোঁট দিয়া বাহির হইল না।

নীলিমা তাহার হাতের চিঠিখানা দেখাইয়া অভিমান-বেদনা-ছলছল চোখে মা'র পানে চাহিয়া রুদ্ধকণ্ঠে কহিতে লাগিল, "সুলোচনাদি' আমায় রোজ রোজ বকছেন, রাগ করছেন, আজ বলেছেন, এবার যদি না মাইনে পান, তা হ'লে আমায় ইস্কুল থেকে নাম কেটে তাড়িয়ে দিবেন। কেন তোমরা আমার মাইনেটা দিয়ে দিচ্ছো না বল তো? শুধু শুধু আমায় সব্বাইকার কাছেই সব বিষয়ে খোঁটা খেতে হয়। তুমি বাবাকে কেন এ কথাটা ভাল ক'রে বুঝিয়ে বলো না?"

স্বর্ণলতা এইবার তাঁহার বিষণ্ণ মুখ তুলিলেন—"বলেছিলুম রে! উনি বলেন, অনেক টাকা হয়ে গেছে—অত টাকা তাঁর নেই, কেমন ক'রে দেবেন? এতদিন যেমন ওঁরা দয়া ক'রে পড়িয়ে এসেছেন, এখনও যদি সেই রকমই তোর মুখ চেয়ে আরও একটু—"

নীলিমা মায়ের এই মৃদু সঙ্কুচিত করুণ কথা কয়টিতে তীব্র-জ্বলনে জ্বলিয়া উঠিয়া তীক্ষ্ণ কঠিন স্বরে বাধা দিল—"চাইনে আমি অমন দয়া ভিক্ষা করতে! যদি স্কুলের মাইনেই দিতে পারবে না, তবে কেন তোমরা আমায় সব্বাইকার কাছে ছোট করবার জন্যে স্কুলে দিয়েছিলে?"—বলিতে বলিতে ঝরঝরে কাঁদিয়া ফেলিয়া নীলিমা তাড়াতাড়ি ছুটিয়া পলাইয়া গেল। মা অবাকমুখে চাহিয়া রহিলেন।

স্বর্ণলতা বিমর্ষমুখে রান্নার পিঁড়িতে বসিয়া একখানি মেটে পাতরে করিয়া চারটি ময়লা রংয়ের মোটা ভাত বাড়িতেছিলেন, শুভেন্দু 'মা' চুবলিয়া ডাক দিয়া ঘরে ঢুকিল।

"হুঁ ; তাই তো বলি যে, মুখপুড়ী মেয়েটা কি খেয়ে খেয়ে অত মোটাচ্ছে! আর আমিই বা তাই খেয়ে দিনকের দিন শুকুচ্ছিই বা কেন? এর ভেতরে মস্ত বড় একটা ঐতিহাসিক জটিল রহস্য আছে! তাই না? দাও দিকিন্, ওই ভাতকটা দুধ দিয়ে আজ না হয় আমিই খেয়ে যাই! বাঃ বাঃ, আবার যে একটা কাঁচকলা পাকাও জমিয়ে রাখা হয়েছে, দেখচি! ওঃ দিব্যি হবে এখন। দিয়ে ফেল আজকের মত এ সব এই অপাত্রটাকে, পেট আমার ক্ষিদেয় জ্বলেপুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে। আবার এখুনি যাব জগা মত্তেদের সঙ্গে ফুটবলম্যাচ খেলতে।"

শুভেন্দু ধপ্ করিয়া নীলিমার জন্য পাতা কাঠের পিঁড়িখানায় বসিয়া পড়িয়া আগ্রহত্বরিতহস্তে ভাতশুদ্ধ পাতরটা নিজের কোলের কাছে চট করিয়া টানিয়া আনিল। এইরূপে উহা আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়া দুগ্ধ নামে আখ্যাত নীলবর্ণের জলবিশেষকে কোন মতে ভাতের উপর ঢালিয়া আঠাগন্ধ কদলীযোগে তাহা পরম পরিতোষে মাখিতে লাগিয়া গেল।

"কই, চিনি কোথায়? ওইটুকু নুণের মতন চিনি দিয়ে কখন অত-গুলো ভাত খাওয়া যায়? নিজেদের আদুরে মেয়ের জন্যে চুরি ক'রে রাখা হলো বুঝি? দাও দাও বার ক'রে দাও। না দিলে কিন্তু ভাল হবে না বল্‌ছি, হ্যাঁ!"

স্বর্ণলতা চিনির কৌটাটা পাতের উপর উপুড় করিয়া ঝাড়িয়া দিয়া দুঃখিত স্বরে, ক্ষীণকণ্ঠে কহিলেন, "আর ত ঘরে নেই, বাবা, ওই দিয়েই খেয়ে নাও, লক্ষ্মীটি।"

"ও সব খোসামোদের কথার ধার ধারিনে ;—নেই কি! আলবৎ আছে। তোমার স্কুলে-পড়া গাড়ীচড়া মেয়ে কি না ওইটুকু চিনির টাকনা দিয়ে এই ভাতের কাঁড়িটি খেতে পারতো? দাও বল্‌ছি শীগগির, না হ'লে এই রইলো তোমার ছাইপিণ্ডি ভাত পড়ে! আহ্লাদী মেয়ে

খেতে পেলেন না ব'লে রেগে গেছ ত ? সেই সোজা কথাটা খুলে বল্লেই ত হ'তো ; তা থাক্, তোমার সেই বিদুষী মেয়েই থাক ; পচা নৰ্দ্দমায় ফেলে লোকসান কর্‌বার দরকারটাই বা কি !"

তড়বড় করিয়া এই সব কথা বলিতে বলিতে শুভেন্দু সত্য সত্যই মাথাভাত পাতব শুদ্ধ ঠেলিয়া দিয়া উঠিয়া গেল এবং মায়ের বুকফাটা কাতর করুণ আহ্বান কানে না তুলিয়াই সে গুম্ গুম্ শব্দে পা ফেলিয়া দালান পার হইয়া সোজা উপরে উঠিয়া আসিল।

নীলিমা নিজের দুঃখ অভিমানে অভিভূত হইয়া গিয়া মায়ের সঙ্গে যেটুকু কুব্যবহার করিয়া ফেলিয়াছিল মা'র কাছ হইতে সরিয়া আসিয়াই সে তাহার জন্য ভীষণভাবে অনুতপ্তও হইয়া পড়িয়াছে। মা যে তাহার কত বড় অসহায়, সে কথা বালিকা সম্পূর্ণভাবে না বুঝিলেও স্বামীকে তিনি যে কতদূর ভয় করিয়া চলেন, সে কথাটা যে তাহাদেরও অজ্ঞাত ছিল না। পিতা না দিলে মা আর কেমন করিয়া তাঁহাকে দিয়া দেওয়াইবেন ? এই কথা মনে হইতেই তাহার মনে হইল, মা'র মনে সে আজ শুধু শুধু কষ্ট দিয়াছে। মা তাহাকে আদর করিয়া খাইতে দিতে চাহিলেন, আর সে কি না 'খাইতে চাহে না' বলিয়া তাঁহার সে যত্নের অবমাননা করিয়া চলিয়া আসিল ! অপরাধীর মত সঙ্কোচে মরিয়া গিয়া সে নিঃশব্দপদে নীচে নামিয়া আসিল। আবার লজ্জাও তার মনে বড়ই জ্বালা দিতে লাগিল, সে 'খাইতে চাহে না' বলিয়া আবার তখনই কি না খাইতে চলিয়াছে ! মনকে জোর করিল, বলিল, "হোক গে, মা তো খুসী হইবেন"—কিন্তু রান্নাঘরের কাছাকাছি যাইতেই তাহার সঙ্কল্প পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। শুভেন্দু সোৎসাহে ভাত মাখিতে মাখিতে উৎফুল্ল-কণ্ঠে বলিতেছে—"কই চিনি কোথায় ? অতটুকু নুণের মত চিনি দিয়ে কখন অতগুলো ভাত খাওয়া যায় ?"

আবার তেমনই কারয়া পা টিপিয়া টিপিয়া নীলিমা উপরে উঠিয়া আসিল; মনে মনে ভাবিল, "যদি আমি এখন খেতে গেলে দাদার কম প'ড়ে যায়! থাক, আগে ওর খাওয়া হয়ে যাক্, তখন ওর পাতেই না হয় খাবো।"

সে জানিত, তাহার মা নিজের ভাগের চাল দু'টি দু'টি করিয়া প্রতি-দিন একটা ভাঁড়ের মধ্যে জমা করেন এবং মুটাখানেক জমিলেই এক দিন তাহাদিগকে বিকালের পাঁপর পোড়া বা ভুট্টাভাজার বদলে ভাত রাঁধিয়া দেন। সে ক'টি ভাত দুইজনে খাইতে গেলে কাহারও আধ-পেটাও হয় না।

উপরে আসিয়া এবার সে তাহার নিত্যকার্য্যগুলি সম্পন্ন করিতে মনোনিবেশ করিল; কিন্তু মা'র তখনকার সেই বিষণ্ণ নিরুপায় মুখচ্ছবি মনে করিয়া তাহার মনটা বেশ সহজ হইতে পারিল না। তাহার উপর সারাদিনের উপবাসে শরীরেও যথেষ্ট দৌর্ব্বল্য আসিয়া পড়িয়াছিল। বৃষ্টির জন্য কাপড়-চোপড় ঘরে-বারান্দায় করিয়া টাঙ্গান ছিল, সে সব খুলিয়া যেগুলি শুষ্ক, সেগুলি আল্‌নায় রাখিয়া ভিজা সেঁৎসেতে কয়েকটা লইয়া ছাদে উঠিল, কিন্তু সেই সাবিত্রী পাহাড়ের সিঁড়ির মত উঁচু উঁচু সিঁড়ি উঠিতে সে দিন তাহার পা যেন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

কয়েকদিনের পরে আজ মধ্যাহ্ন হইতেই বৃষ্টি থামিয়াছে। মেঘলাও অনেকখানি কাটিয়া আসিয়াছিল। বিশাল আকাশের সর্ব্বত্রই যদিও নির্ম্মেঘ হইতে পারে নাই, তথাপি আশে-পাশে যে সকল খণ্ডমেঘ লঘু দ্রুতগতি লইয়া ইচ্ছাসুখে ভাসিয়া বেড়াইতেছিল, তাহারা যে কোন জাগতিক জীবের ভয়প্রদ নহে, তাহা উহাদের শান্তমূর্ত্তিই সপ্রমাণ করিতেছে। মেঘের বিরাট প্রাচীর টুটিয়া যাওয়াতে বারিধৌত প্রসন্ন

জগতের বক্ষে নামিয়া আসিয়া অম্লান রজত-কৌমুদীরই সমতুল্য শীতের প্রফুল্ল সূর্য্যকর যেন স্মিতহাস্যে সকলকেই অভিনন্দন জানাইতেছিল। ইহার প্রতিদানে আবার দরিদ্রের কুটিরে, ধনীর অট্টালিকায় সর্ব্বত্রই এই চির-অতিথির আগমনী উৎসব সমারোহের সহিতই চলিতেছিল।

নীলিমা কাপড় কয়টা ছাতের প্রাচীরের উপর মেলিয়া দিয়া খানিকটা দূরের একটা বাড়ীর ছাতের দিকে চাহিয়া ছিল। সে বাড়ীটা অনুকাদের। সে দেখিতে পাইল, ছাতের উপর অনুকারা তিন ভাই-বোনে কমলালেবু খাইতে খাইতে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে, আর তাহার মা একটা ছোট ডালায় ভরিয়া আঙ্গুর, আপেল ও কমলালেবু তাহাদিগকে সরবরাহ করিতেছেন। বুকের কাছে একটা নিঃশ্বাস আচম্‌কা জমিয়া উঠিতেই সে চমকিত হইয়া সে দিক হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া লইল। তাহার ক্ষুৎপিপাসাতুর বুভুক্ষু দেহ-মন কি অন্যের সুখস্বাচ্ছন্দ্যকে ঈর্ষ্যা করিতেও আরম্ভ করিল নাকি? পরের সুখ দেখিয়া লোভ করিবে না, এ কথা প্রাণপণে মনে করিতে করিতেও কিন্তু তাহার বিবেকের সহস্র নিষেধ না মানিয়াই তাহার অতৃপ্ত নিরানন্দ মন অকস্মাৎ মনে করিয়া বসিল,—সেও যদি অনুকারই আর একটি বোন হইয়া জন্মিত! কত তপস্যা করিলে মানুষে গরীবের ঘরে জন্মায় না?

আবার তখনি সঙ্গে সঙ্গে মা'র মুখখানি মনশ্চক্ষুতে ভাসিয়া উঠিল। কি শান্ত, কি কোমল, আর কি করুণ সে মুখ! উঃ, নীলিমা কি নিষ্ঠুর! —ও-ই মাকে কিনা সে প্রত্যাখ্যান করিতে চাহিয়া মনে করিতেছে যে, সে যদি অন্য মায়ের মেয়ে হইত ত বেশ হইত! কেমন করিয়া এমন কথা সে মনেও করিতে পারিল? সে যদি না তাহার মায়ের মেয়ে হইয়া জন্মিত, তাহা হইলে তাহার পক্ষে কি হইত, কে বলিতে পারে? হয় ত অন্য মায়ের কাছে তাহার সুখ কিছু বেশী হওয়াও বিচিত্র ছিল না, কিন্তু

তাহার মায়ের কি হইত? মা'র মুখ চাহিতে ত আর কেহই থাকিত না! এ কথা ভাবিতে গিয়া তখন আবার মনে পড়িয়া গেল যে, সেই বা তাহার মায়ের মুখ এমনই কি চাহে? এই ত সে মায়ের আদর করিয়া ভাত খাইতে ডাকার প্রত্যুত্তরে তাঁহাকে দশটা কড়া কথা শুনাইয়া দিয়া অনায়াসে চলিয়া আসিয়াছে। মা'র প্রাণে তাহার এই ব্যবহারে কতখানি ব্যথা বাজিতে পারে, সে কি তাহা একবারও ভাবিতে পারিয়াছিল? কিন্তু যদি তাহার ওই মা-ই আবার ওবাড়ীর ঐ অনুকার মায়ের মত তাহার মুখের সামনে আঙ্গুর-আপেলের ডালা ধরিতে পারিতেন? সে কি তখন সে সব প্রত্যাখ্যান করিয়া মা'র প্রাণে আঘাত দিতে পারিত? লোভ!—হায় রে লোভ! মায়ের স্নেহটা তাহা হইলে আসল জিনিষ নয়? সন্তান তাঁহার নিকট হইতে প্রগাঢ় ভালবাসার অপেক্ষা উত্তম অশন-বসনেরই আকাঙ্ক্ষা অধিকতর করে? নিজের প্রতি তাব যেন ঘৃণা বোধ হইল। অমনই সে মা'র কাছে ছুটিয়া যাইতে চাহিল।

"কি গো বিবি সাহেব! হাওয়া খাওয়া যে আর শেষ হলো না?"

দাদার এই স্নেহসম্ভাষণে একান্ত অপ্রতিভ হইয়া পড়িয়া নীলিমা মুখ ফিরাইল—"তোমার এরই মধ্যে খাওয়া হ'য়ে গেল দাদা?"

শুভেন্দু পূর্ব্ববৎ শ্লেষপূর্ণ কণ্ঠেই জবাব দিল, "ওগো না গো না, ভয় নেই, তোমার অন্নের আমি হন্তারক হইনি। যাও, সব ঠিক করাই আছে, কৃপা করে শুধু একটু মুখে তুলে দিয়ে এস গে যাও।"

নীলিমা কথার ভাবে দাদার মনের খবর জানিতে পারিয়া নিরতিশয় ব্যথিত হইয়া বলিয়া উঠিল, "তুমি খেলে না কেন, দাদা? যাও, তুমি খেয়ে এস, আমার একটুও আজ ক্ষিধে নেই, বড্ড মাথা ধরেছে। আমি খাবো না।"

শুভেন্দু বলিল, "আহা, মাথা ধরেছে! ম'রে যাইরে! প'ড়ে

প'ড়ে বোধ হয়? এসো, বিছানা পেতে দিই গে' গা মেলে শোবে এসো! মাথায় গোলাপ জলের পটী বেঁধে দেবো? হাওয়া করবো নাকি?"

এই বিদ্রূপের খোঁচা খাইয়া অভিমানে চোখের কোল ভর্ত্তি হইয়া উঠিলেও নতমুখে তাহা সামলাইবার চেষ্টা করিয়া নীলিমা মিনতি করুণ-স্বরে কহিল, "কিচ্ছু কর্‌তে হবে না। লক্ষ্মীটি! তোমার পায়ে পড়ি—তুমি খেয়ে এস।"

"হু! আমি খেলে কি হবে? বরং তুমি খাও গে যে, মাথার মগজে একটু ঘি হবে। আ মলো! মুখপুড়ী মেয়ে আবার ভ্যাঁ ক'রে কেঁদে ফেল্‌লেন! কাঁদ্‌লি তো বড আমার বয়েই গেল! তোর সখ হয়েছে, তুই কেঁদে মরগে যা। তাতে আমার কি? হুঁ, বুঝেছি! ও কি আমায় খাওয়াবার জন্যে কাঁদ্‌ছিস্‌। মনে করেছিস্‌, ওই রকম প্যান প্যান কর্‌লে আমি রেগে মেগে চলে যাব, আর তখন মজাসে খুব খানিক গুড়-চিনি মেখে নিয়ে গবগবিয়ে ভাতগুলো সব গিল্‌বি।—ঐ রে! কিপ্‌টে বুড়োটা ঐ গলির মোড় ফিব্‌লো রে! বাড়ীর দিকেই ত আস্‌চে না? তাইতো—পালাই।"

শুভেন্দু তিন লাফে সিঁড়ি নামিয়া খিড়কীর দ্বারের দিকে ছুট দিল। আর পথের উপর বাপকে দেখিতে পাইয়া একসঙ্গে দুইটা বিপদের সম্ভাবনা একত্র মনে উদিত হইয়া নীলিমাকেও ভয়ে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। প্রথমতঃ বাড়ী ঢুকিয়াই তাহার পিতা একবার ঘরে ঘরে ঘুরিয়া বেড়াইয়া সারাদিনের সকল তথ্য সংগ্রহ করিয়া লইয়া থাকেন। বিশেষতঃ রান্নাঘরে না গেলে তাঁহার মন তো স্থিরই হয় না। যদি ইহারা মায়ে মেয়েয় ও ছেলেয় মিলিয়া সেখানে তাঁহার সকল সম্পত্তি লুটিয়া লইয়া লুকাইয়া লুকাইয়া বিশেষ ভোজের ব্যাপার সম্পন্ন করিয়া ফেলিয়া

থাকে, তাহারই 'ডিটেকটিভি' তাঁহাকে প্রতিদিনই দুই একবার করিয়া করিতে হয়, এবং এই উদ্দেশ্যেই এক এক দিন অকস্মাৎ অসময়ে কর্ম্ম-স্থান হইতে চলিয়া আসিতেও হইয়া থাকে। আজ যখন তিনি ঐ দুধমাখা ভাত ও রন্ধনকারিণীকে একত্র ঐ স্থানে দেখিতে পাইবেন, তখনকার সেই দৃশ্য মনে করিতেও তাহার সর্ব্বাঙ্গে কাঁটা দিয়া উঠিল। ছুটীর দিনে বাড়ী থাকিলে সে দেখিয়াছে যে, তাহার মায়ের ভাত আজ-কাল খুবই কম থাকে। যদিও সে অনুযোগ করিলেই তিনি অ-ক্ষুধার দোহাই পাড়িয়া থাকেন, তবুও নীলিমার মনে সন্দেহ হয় যে, ওই যে মধ্যে মধ্যে তাহাদের দুই ভাই বোনকে তিনি ভাত রাঁধিয়া খাওয়ান, তাহারই জন্য তাঁহার ঐ অ-ক্ষুধাটুকু দেখা দিয়াছে এবং ফলে জীর্ণদেহ অধিকতরই শুষ্ক হইতেছে। এবার হয় ত অপব্যয়ের চাউল বাঁচাইতে গিয়া পিতা তাহার জন্য অর্দ্ধাশনেরই ব্যবস্থা করিয়া বসিবেন! তখন তাহার এই প্রথম চিন্তাটাকেই প্রবল করিয়া তুলিয়া স্কুলের মাহিনার বিষম চিন্তাটাকে কোথায় যেন ভাসাইয়া লইয়া গেল এবং আত্মগ্লানিতে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়া সে নিজের মনকে যেন প্রচণ্ড কশাঘাত করিয়া ভাবিল—এই আমি! মা'র মনে কষ্ট দিলেম, মা'কে আবার বকুনি খাওয়াব, তাহার উপর আমার জন্য মা'র ভাতেও টান পড়বে! না না, আমি আর কারুকে চাইনে, আমার মায়ের মেয়েই যেন আমি থাকৃতে পাই!

উদ্বেগে শঙ্কায় অধীর হইয়া সে তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া রান্নাঘরের দিকে ছুটিয়া গেল।

"মা, মা, বাবা আস্‌ছেন। কি হবে, মা?"

স্বর্ণলতার নিজের মুখ এ সংবাদে শুকাইয়া গেলেও তাঁহার এতক্ষণ-কার মনঃকষ্টের কাছে তাহাও যেন তাঁহার কাছে ছোট হইয়া গেল।

তাঁহার চিরাভ্যস্ত অটুট ধৈর্য্যের সহিত তিনি উঠিয়া দাঁড়াইয়া সস্নেহ মৃদুকণ্ঠে মেয়েকে কহিলেন, "তুমি খেয়ে নাও, নীলা! আমি ওদিকে যাচ্ছি। কি আর হবে তোমায় কিছু বল্‌বেন না।" এই বলিয়া পতি সম্ভাষণার্থ তিনি তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইয়া গেলেন। কিন্তু স্বর্ণলতার আজ কাহার মুখ দেখিয়া যে রাত্রি পোহাইয়াছিল, বলা যায় না। নহিলে এমন অপ্রত্যাশিত অভাবনীয় কাণ্ড কখন ঘটে!

"গিন্নি! ওগো ও, বলি কোথায় গো!" এই আহ্বানের সঙ্গে সঙ্গে নিজের ক্লান্ত শীর্ণ চরণকে যতখানি সম্ভব দ্রুত করিতে চাহিয়া গৃহিণী স্বর্ণলতা বলিদানোদ্দেশ্যে আনীত জীববিশেষের মত কম্পিত-কলেবরে আসিয়া দাঁড়াইলেন, তাঁহার নিজের জন্য ভয় যত না হইতেছিল, তাহার চেয়ে অনেক বেশী ভাবনা হইতেছিল—নীলিমা হয় ত এই সব গোলমালে মাথা ভাত কয়টা খাইয়া উঠিতেই পারিবে না। শুভেন্দুর কথা মনে হইয়াও তার বক্ষ চিরিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস উঠিল ও পড়িল। না খাইয়া কোলের ভাত ফেলিয়া ছেলেটা কোথায় যে চলিয়া গেল, আহা এমন অবুঝ সে কেন হইল! সহসা অতিমাত্রায়:বিস্মিত ও চকিত হইয়া তিনি শুনিতে পাইলেন, তাঁহার রুক্ষমেজাজী কঠিন স্বামী তাঁহার সহিত একি আবার রসিকতাও করিতেছেন নাকি?

"ও গিন্নি! নেমন্তন্ন খেতে যাবার জন্যে যে বড্ড জোর তাগিদ এসেছে, বলি, খেতে যাবে, নাকি? তা হ'লে চটপট তল্পিতল্পা সব বেঁধে ছেঁদে নাও গে যাও।"

নূতন সৃষ্টি দেখিয়া স্বর্ণ অবাক হইয়া স্বামীর দন্ত-বিকসিত আনন্দোৎফুল্ল মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। এরকম কথা তো আর তাঁর জীবনে তিনি শুনেন নাই যে এর উত্তর দিবেন!

অনুকূলচন্দ্র হাতের নোটের তাড়াটা দেখাইয়া তেমনই হাসিতে

হাসিতে কহিতে লাগিলেন, "বিশ্বাস হচ্ছে না! একেই বলে মেয়ে-বুদ্ধি আর কি! সত্যি গো, মাইরি বল্‌ছি, তোমার সঙ্গে রঙ্গ কর্‌ছিনি। তোমার সেই ভুবন রায়কে মনে আছে, সেই যে একবার ক'বছর আগে এসে গোঁড়াকে নিজের সঙ্গে নিয়ে যেতে চেয়েছিল না? সে-ই তোমাদের যাবার জন্যে অনেক ক'রে চিঠি লিখেছে, আর এই টাকাগুলো পাঠিয়েছে গাড়ী ভাড়া ব'লে। সব্বাইকার সেকেণ্ড ক্লাসের ভাড়া! উঃ, কত টাকাই না জানি ওরা বাজে খরচ করে যে! আহা, মনে একটু দরদও কি করে না গা?

'উড়নচড়ে' লোকগুলার আশ্চর্য্য অপব্যয়শক্তির কথা স্মরণ আসিতেই 'মিতব্যয়ী' অনুকূলের ললাট অন্ধকার হইয়া আসিয়াছিল। কিন্তু সেই-ক্ষণেই আবার যেমনই মনে পড়িয়া গেল যে সেই অপব্যয়িত টাকাগুলা উড়িয়া তাঁহারই লোহার সিন্দুকের 'দোরগোড়ায়' আসিয়া পড়িয়াছে, অতএব এ ক্ষেত্রে সেই অমিতব্যয়ী লোকেরা তাঁহার আশীর্ব্বাদ-ভাজনই হইতে পারে, অমনি তাঁহার গলার সুরটাও সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়া গেল :—

"তা ভালই করেছে; অনেক হয়েছে, একটু আধটু আর খরচ-পত্র করবে না! আমাদের মতন ত আর পাতরচাপা কপাল ক'রে আসেনি, ভাগ্য দিচ্ছে অঢেল, ছড়িয়েও ফেল্‌ছে তেমনি দুহাতে। তা দেখ, গিন্নি! তোমরা আর এই দুরন্ত শীতে কোথায়ই বা যাবে? আমিও ত আর কায-কর্ম্ম ছড়িয়ে ফেলে কোথাও যেতে পারবো না। ক্ষেত-খামারটুকু করেছি, রবিগুলো নষ্ট হবে। পাঁজার ইটে আগুন দেওয়ার সময় নিজে দাঁড়িয়ে না থাকলে চল্‌বেই না। তার পরে মধু মিস্ত্রীর সুদটা উশুল করা নেহাৎ দরকার হয়ে পড়েছে। নৈলে তামাদি হ'তে পারে। আয় নেই যেন একটি পয়সা, কিন্তু 'ঠাঠা'টুকু ত তার ষোল আনার উপর আঠারো আনাই আমায় পোহাতে হচ্ছে। তা দেখ, আমি

বলি কি, ওর জন্যেই পাগল ত, ঐ গোঁড়া ছোঁড়াটাকেই না হয় ওদের বাড়ী পাঠিয়ে দেওয়া যাক্, আর তোমরা সব থেকেই যাও। গাড়ী ভাড়ার টাকাটাও তা হ'লে কিছু বেঁচে যাবে। আর গোঁড়ার এই বয়সে অত নবাবী ত আর ভাল নয়, তাকে একখানা থার্ড ক্লাসের টিকিট কাটিয়ে দিলেই চলে যাবে।—কি বল?”

স্বর্ণলতা ঈষৎ ব্যগ্র হাসিয়া ঘাড় নাড়িলেন, “হুঁ”—পরক্ষণেই কি ভাবিয়া লইয়া এই অবসরে যেন মরিয়া হইয়া উঠিয়াই কোন মতে বলিয়া ফেলিলেন—“ওই টাকা থেকে তা হ'লে নীলার ইস্কুলের মাইনেটা চুকিয়ে দিলে হয় না? ওরা রোজ রোজ বড্ডই তাগিদ দিচ্ছে, বল্‌ছে—”

অনুকূলের ‘দন্তরুচি’ আবার ‘কৌমুদি’ ছড়াইয়া বিকসিত হইয়া উঠিল, কিন্তু এবার আর তাহা আনন্দে নহে। ইস্পাত শাণে ঘষিলে যে রকম শব্দটা জন্মায়, ঠিক সেই ধ্বনির সুস্পষ্ট অনুকরণে তিনি কহিয়া উঠিলেন, “কি বল্‌ছে, শুনি?”

স্বর্ণলতার দুর্ব্বল হৃৎপিণ্ড ‘ধ্বকাধ্বক্’ করিয়া উঠিতে পড়িতে লাগিল, তথাপি তিনি কোন মতে ধরা গলাটাকে সাফ করিয়া লইয়া মৃদুকণ্ঠে উত্তর দিলেন, “কালকের মধ্যে মাহিনে না পেলে ওকে নাকি স্কুল থেকে ওরা ছাড়িয়ে দেবে।”

অনুকূল এবার দাঁতে দাঁতে আবারও একটা বিকট ঘর্ষণশব্দ করিয়া বলিলেন, “ছাড়িয়ে দেবে? বটে! হুঁ! আচ্ছা। দেবে কেন, আমি নিজেই আমার মেয়েকে ওদের স্কুল থেকে ছাড়িয়ে নেবো। আর শুধু তাই নয়; সকল মেয়েই যাতে ওদের ঐ হতভাগা স্কুলটাকে ছেড়ে ছুঁচো বেটীদের দেশছাড়া করে দেয়, তারির জন্যেই আজ থেকে বিশেষভাবে চেষ্টা করবো। ইস্কুলে মেয়ে দিইছি, তাই কত না, এতেই তোদের চোদ্দ পুরুষের ভাগ্যি ব'লে মেনে নে; না হয় আবার

তার জন্যে দু'টাকা ক'রে মাইনে দেবে না, কচু করবে! আহ্লাদ দেখে আর বাঁচিনি যে!"

পাছে তাহাদের নজর লাগে—এই ভয়ে কর্ত্তা টাকাগুলিকে সন্তর্পণে কোঁচার কাপড়ে ঢাকা দিয়া ফেলিলেন। সেগুলিকে লইয়া চলিয়া যাইবার অভিলাষে ফিরিতে গিয়া কি মনে হইল, ফিরিয়া মুখ খিঁচাইয়া স্ত্রীকে বলিলেন, "আর তুমি মাগীও ত বড় কম সয়তানী নও! যেই এই ক'টা টাকা চোকের উপর দেখ্‌তে পেয়েছ, অম্‌নি ওর বিবি-নাইটিঙ্গেল্‌ মেয়ের জন্যে ওর উপর চোখ প'ড়ে গ্যাছে! আরে বাপ্‌! এই টাকাগুলি অনেক কষ্টে বাঁচিয়ে যদি রাখ্‌তে পারি, মধু মিস্ত্রীকে যদি সাড়ে তের টাকা সুদেও কর্জ্জ দিয়ে রাখ্‌তে পারি, তবেই না তোমাদের বার মাসের কুঁড়ো পাথরটী যোগান দেবো। বলে কি না, 'মেয়ের ইস্কুলের মাইনে দাও!' মেয়ের উপর যদি টাকা খরচই করবো, তা হ'লে মেয়েকে ইস্কুলে দিলুম কি কর্ত্তে শুনি? একটী পাই পয়সা ওর ওপোর আমি বার করব্‌নি এটা বেশ করে জেনে রেখে দাও। ওকে নিজের পথ নিজে করে নিতে হবে।"

টাকাগুলি রাখিয়া আসিয়া কর্ত্তা তখনও স্বর্ণলতাকে সেই স্থানে ও সেইভাবেই স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া কিছু প্রসন্নস্বরে (বোধ করি, সদ্য টাকা গোণার শব্দটা কানে ও প্রাণে বাজিয়া রহিয়াছিল বলিয়াই) তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ওর জন্যে তুমি কিছু ভবো না গো গিন্নি! ও আমি সব ঠিক ক'রে নেবো। নীলির পড়া আমি ছাড়াবো না, পড়াতে ওকে হবে। তবে ও ছাঁয়ের ইস্কুলে কিছু ভাল জিনিষ শেখায় না। প্রাইজ ত ওতে নেই বল্লেই হয়;—আমি ওকে মিস্ রেক্সের মিসন্ ইস্কুলে কাল থেকেই ভর্ত্তি ক'রে দিয়ে আসবো। তারা মাইনে ত নেয়ই না, উল্টে শাড়ী, জামা, বই, শ্লেট,

সমস্তই প্রাইজ দেয়। আবার কেমন সুন্দর বড় বড় 'ডল' দেয়, সেগুলো আমাদের দোকানে আধা কড়িতে বেচে এলেও তার একটা দাম আছে। আচ্ছা কালই আমি ওকে নিয়ে গিয়ে সেখানে ভর্ত্তি করিয়ে দিয়ে আস্‌ছি।—হ্যাঁ, আর গোঁড়াটাও তা হ'লে কালই ওখানের জন্যে রওনা হয়ে যাক্‌। আঃ এই ছেলেপিলেগুলোই হয়েছে মানুষের বিষম জ্বালা!"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

কলিকাতা শ্যামবাজারে ভুবনমোহন রায়ের প্রাসাদতুল্য অট্টালিকা। তাঁহার সুদৃশ্য উদ্যানে যত স্বদেশী, ততই বিদেশী পত্রপুষ্পের বৃক্ষলতা উজ্জ্বল শোভায় পথিকের নয়ন-মন মুগ্ধ করিত। তাঁহার আস্তাবলে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঘোড়া, ঝকমকে ব্রুহাম, ল্যাণ্ডো ও মোটর। তাঁহার অতি মূল্যবান্ স্বদেশী বিদেশী গৃহসজ্জা প্রভৃতিতে সুরুচি, ধনবত্তা ও বিদেশের প্রতি অভক্তি না থাকিলেও স্বদেশের প্রতি যে যথেষ্ট পরিমাণে ভক্তি আছে, তাহাব পরিচয় প্রদান করিত। বিশেষ যত্ন-পূর্ব্বক কাশ্মীর, লাহোর, মৃজাপুব, মোরাদাবাদ, কাশী ও মান্দ্রাজ প্রদেশীয় অপূর্ব্ব শিল্পসম্ভার যতদূর এ দেশে পাওয়া যায়, তাহা বিদেশের আপাতমনোরম নিকৃষ্ট ও সহজলভ্য পদার্থ দ্বারা গৃহ পরিপূর্ণ না করিয়া সযত্নে আহরণ করা হইয়াছে।

ভুবন বাবুর পৈতৃক বাটীতে যদিও এতটা ঐশ্বর্য্যের সমাবেশ ছিল না, তথাপি সেই পুরাতন 'এজমালি'র সম্পত্তিকে তিনি কালের হস্তে নিষ্পিষ্ট হইয়া ধ্বংসের মুখে পতিত হইতে সাহায্য করেন নাই। এ বিষয়ে অনেক বড় বড় নামজাদা কৃষ্ণ-বিষ্ণুদের পৈতৃক-গৃহ হইতে তাঁহার পৈতৃক-গৃহকে সৌভাগ্যবান্ বলিতে হইবে।

সে বাটীও সুবৃহৎ। যদিও তাহা উদ্যানবেষ্টিত নহে, কিন্তু তাহার পশ্চাতে বহুদূর-বিস্তৃত প্রকাণ্ড ফলের বাগান অমূল্য ও অক্ষয় ফলের ভাণ্ডারস্বরূপ বারো মাসই গৃহস্থ পোষণ করিয়া আসিতেছে। উদ্যানে স্নান ও পানের জন্য একটি সুবৃহৎ দীর্ঘিকা আছে; তাহা সযত্ন-রক্ষিত

ও সুসংস্কৃত। বাসন মাজিবার জন্য অপর একটি ক্ষুদ্র পুষ্করিণী বা ডোবা এই উদ্যানের এক পার্শ্বে অবস্থিত ; তাহা হিঞ্চা, কলমী, পানা, পানিফল এবং শরৎ প্রারম্ভে কুমুদকহ্লার ও সুনীল বর্ণের পানা-ফুলে খচিত হইয়া থাকিত।

বাটীর সদরদরজা পার হইয়া সুপ্রশস্ত অঙ্গন ; ইহার এক পার্শ্বে প্রকাণ্ড চণ্ডীমণ্ডপ ; সাত আটটা সিঁড়ি দিয়া মণ্ডপে উঠিতে হয়। পুরাতন হর্ম্ম্য-শিল্পের উৎকৃষ্ট উদাহরণ-স্বরূপ আট-পলে জোড়া থাম, থামের মাথায় বিচিত্র পশুপক্ষী, খিলানসমূহে নানাবিধ লতাপাতা ও জালির কায। এই অঙ্গনের দক্ষিণধারে সারি বৈঠকখানা ঘর, তাহার সম্মুখে দৌড়দার টানা দালান। ঘরগুলি সেকালের প্রথা মত নীচু চৌকির উপর ঢালা বিছানায় সজ্জিত। ছিটের জাজিমের উপর দুই একটা করিয়া তাকিয়া-বালিস রাখা। তাকিয়াগুলি অবশ্য সেকালের চেয়ে একালে হ্রস্বাকার প্রাপ্ত হইয়াছে। তা মানুষগুলিই কি হয় নাই ?

এই বাড়ী এখন বিয়ে-বাড়ী। গৃহস্বামী ভুবন বাবুর জ্যেষ্ঠা কন্যা তরুলতার বিবাহ এই ফাল্গুন মাসেই স্থির হইয়াছে এবং সেই উপলক্ষে ভুবন বাবুরা সপরিবারে তাঁহাদের পল্লীগৃহে আগমন করিয়াছেন। যদিও এখনকার প্রথামত এই গ্রামের বাটীতে না আসিয়া তাঁহার সুখৈশ্বর্য্যমণ্ডিত কলিকাতার বাটীতে বিবাহ দেওয়াই সঙ্গত ছিল, তথাপি অনেক বিষয়ে আধুনিক হইলেও ভুবন বাবুর কতকগুলি সেকেলে মতামত ছিল ; তাহার মধ্যের একটি এই পল্লীপ্রীতি। সর্ব্বদা কলিকাতায় থাকিলেও প্রতি বৎসর পূজাবকাশে তিনি তাঁহার অন্যান্য সমপদস্থ ব্যক্তিগণের ন্যায় সিমলা, দার্জ্জিলিং বা মধুপুর যাত্রা না করিয়া পৈতৃক আবাসে আগমন করেন। বাটীতে তাঁহার যথেষ্ট সমারোহের সহিত

দুর্গোৎসব হয়। কলিকাতায় থাকিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতে শিখিয়াও ভুবন বাবু সেই পৈতৃক পূজা উঠাইয়া দেন নাই, বরং মহার্ঘ্যতা বৃদ্ধি পাইলেও সযত্নে সেই সব পুরাতন রীতি যথাসাধ্য বজায় রাখিয়া চলিতেছেন। ভুবন বাবুর পিতা অমর বাবুর আমলে প্রায় পাঁচখানা গ্রামের ইতরভদ্র এই উৎসবে নিমন্ত্রিত হইয়া আসিত; এ দিনে গ্রামবাসী ভদ্রগণ অধিকাংশই দেশত্যাগী; তবে পল্লীবাসী অপর সকল ব্যক্তিরই এই তিন দিন বাড়ীতে হাঁড়িচড়া বারণ আছে। এই দেশ-ভক্তি ও পল্লীপ্রীতিই কলিকাতা নিবাসী ধনী ভুবন বাবুর কন্যার বিবাহ পল্লীগ্রামে ঘটাইয়া, তাঁহার অনেক ধনী ও শিক্ষিত বন্ধুবান্ধবের মন ক্ষুণ্ণ করিয়াছে। কারণ, ম্যালেরিয়ার ভয়ে তাঁহারা ত এখানে আসিতে পারেন না।

ভুবন বাবুর এতদূর সুখৈশ্বর্য্য সত্ত্বেও তাঁহার সংসার শ্মশান। গৃহলক্ষ্মীশূন্য নিরানন্দ গৃহস্থালী মরুভূমির মতই সুখলেশহীন। প্রথম উদ্যমের মুখে এত বড় আঘাত প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার জীবন স্রোতাহত হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু অসামান্য ধৈর্য্যগুণে তিনি নিজেকে ছন্নছাড়া ও নিরুদ্যম হইতে অবসর দেন নাই। বাহিরের প্রেয়সীকে অন্তরের মানসী প্রতিমারূপে প্রতিষ্ঠা করিয়া সঙ্কট-সঙ্কুল যৌবনকাল তিনি তাঁহার একনিষ্ঠ প্রেমের সাধনায় অতিবাহিত করিয়া আসিয়াছেন। মধ্যাহ্নের তপ্ত কিরণ আজ তো না হয় অবসানের পথেই নামিতে আরম্ভ করিয়াছে। সাধারণে এই ধনী ব্যক্তিটির এই ইচ্ছাকৃত ত্যাগের মূল কোথায় খুঁজিয়া পাইত না। বিশেষতঃ তাঁহার অকাল, কালকবলিতা পত্নী চারুশশীকে দেখিতে একেবারেই সাদাসিধা ও অতি সাধারণ ছিল। কলিকাতার বাড়ীতে ছেলেমেয়েদের অভিভাবিকারূপে যে বালবিধবা ভগিনীটি বাস করিতেন, এখন তাঁহারও বয়স চল্লিশের কাছে আসিয়া পড়িয়াছে।

নাম তাহার সরোজিনী। সরোজ পাঁচ জনের অনুরোধে ভাইকে আবার বিবাহ করিয়া সংসারে গৃহলক্ষ্মী প্রতিষ্ঠার কথা একবারমাত্র বলিতে গিয়াছিল, তাহার যে উত্তর সে তাহার দাদার নিকট হইতে পাইয়াছিল, তাহার পর আর কেহ দাদাকে বিবাহের কথা বলিতে অনুরোধ করিলে, জিভ্ কাটিয়া সে সভয়ে উত্তর দিত, "বাপ্ রে! আবার আমি বল্‌বো? বল্‌তে হয় ত তোমরা বল গে—আমি আর এজন্মে কখন বল্‌তে যাচ্ছিনে।"

সরোজিনীর দাদা তাহাকে যে কথা বলিয়াছিলেন তাহা এই—"আমায় কেন বিয়ে কর্‌তে বল্‌ছিস্? আমিও তা হ'লে তোকে বিয়ে কর্‌তে বল্‌বো; মনে মনে তোর এই ইচ্ছা আছে না?"

সরোজ রাগ করিয়া বলে, "তুমি কি যে যা' তা' কথা বল! ও কথা কি কখন মুখে আন্‌তে আছে?"

দাদা বলেন, "মুখে নেই থাক্, মনে ত আন্‌তে আছে? না হ'লে আমাকেই বা তুই কোন্ হিসাবে এমন কথা বল্‌তে পার্‌লি?"

সরোজ বলিল, "আমাতে আর তোমাতে?"

ভুবন বলিলেন, "কেন, তুই আমার চাইতে বয়সে ও বিদ্যাবুদ্ধিতে এতই শ্রেষ্ঠ যে, তোর সঙ্গে আমার তুলনাই হয় না?"

সরোজ মুখ লাল করিয়া জবাব দিল, যাও! তাই কি আমি বলেছি? তুমি যে বেটাছেলে।—বেটছেলেরা ত দু'বার ছেড়ে চারবার বিয়েও করে, তুমিই বা আর একবার না কর্‌বে কেন?"

তদুত্তরে ভুবন বাবু হাসিতে হাসিতে উত্তর দিলেন "কোন কোন বিধবা শুনি লুকিয়ে লুকিয়ে মাছ খায়, তুইও কি তাই খাবি? ওই ও বাড়ীর লেডী ডাক্তার যখন তিনবার বিয়ে করেছে, তখন তুইও কেন আর একটীবার কর্ না?

সরোজিনী বিপন্নভাবে তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "থাম তুমি! আর আমি কখন যদি তোমায় বিয়ে কর্‌তে বলিতো—" .

কিন্তু তার দাদা তখনই থামিলেন না, তিনি তেমনই সহাস্য মুখে বলিয়া যাইতে লাগিলেন, "আমি তিন ছেলে মেয়ের বাপ হ'য়ে যদি বিয়ে কর্‌তে পারি, তা হ'লে তোর তো একটিও ছেলে-মেয়ে হয়নি, তোর বেলা ত মোটেই দোষ হ'তে পারে না! আজকালকার মেয়ে-পুরুষে যে ভেদবুদ্ধিটা উঠে যাচ্ছে; তবে তুই-ই বা কেন চিরকাল ধ'রে একাদশী ক'রে মর্‌বি বল্‌তো তার চেয়ে—

সরোজিনী উঠিয়া পড়িয়া কাতরস্বরে—"ঘাট মানলুম তবু হলো না?—বল্‌ছি, তো আমি আর কখন তোমায় এ কথা বল্‌বো না"—বলিতে বলিতে দ্রুতপদে পলাইয়া গেল।

সেই অবধি বাহির হইতে যত বড়ই উপদ্রব আসুক না কেন, ঘরের মধ্যে আর তাঁহাকে উপদ্রুত হইতে হয় নাই। নির্ব্বিবাদে নিজের কনট্রাক্টরীর কায কর্ম্ম দেখিয়া শুনিয়া স্বদেশী বিদেশী দর্শন-বিজ্ঞানের চর্চ্চায় ডুবিয়া থাকিয়া ভুবন বাবুর দিন সুখে না হউক খুব দুঃখেও কাটে নাই। ছেলে-মেয়েদের তিনি অন্তরের সহিতই ভালবাসিতেন। ছেলেটি যাহাতে তাঁহার উচ্চাদর্শ লইতে পারে, মানুষের মত হইয়া মানুষ হয়, এইটি বলিতে গেলে তাঁহার জীবনের একমাত্র কামনা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল এবং ইহারই জন্য সর্ব্বপ্রযত্নে তিনি নিজের বিশ্বাস ও সাধ্যানুযায়ী চেষ্টাও করিয়া আসিতেছিলেন। মেয়ে দুইটির নাম তরুলতা ও বিনতা—একমাত্র ছেলের নাম সুশীল কুমার।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

কলিকাতার সংসারে সরোজিনী গৃহ-কর্ত্রী হইলেও দেশের সংসারের কর্ত্তৃত্ব যাঁহার উপর ন্যস্ত, তিনি ভুবন বাবুর জেঠাই মা। বয়স তাঁহার সত্তরের উপর। মাথার চুলগুলির মধ্যে কালোর আঁক প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু এখনও আখের টিকলী চিবাইয়া খাইতে পারেন। প্রতিদিন দেড় মাইল পথ হাঁটিয়া গঙ্গাস্নান করিয়া আসিতে এই বৃদ্ধ-বয়সেও তাঁহার কিছুমাত্র ক্লেশ বোধ হয় না এবং নিজের সংসারের দেবতা, ব্রাহ্মণ, গৃহ-পালিত পশু হইতে আরম্ভ করিয়া দাস-দাসী প্রতিপাল্য আত্মীয়-স্বজন ও আতুর শিশু পর্য্যন্ত সকলেরই তত্ত্বাবধান করিয়া থাকেন। আবার শুধুই ঘরের কর্ত্তৃত্ব করিয়াই তাঁহার তৃপ্তি নাই, পড়সী বাড়ীর কোন্ শিশুটির পেটে প্লীহা বৃদ্ধি পাইয়াছে, কাহার বুকে-পিঠে 'কড়া'র জন্য রাংচিত্রার আঠা দিয়া 'দাগ' দিতে হইবে, কাহার ঘুংড়ি জ্বরের টোট্‌কা চাই, কোন্ অল্পবয়সী দরিদ্র বিধবার জীবিকানির্ব্বাহ হয় না, তাহার জন্য তাহাকে দিয়া পৈতা তুলাইয়া কিনিয়া লওয়া, চরকা কাটাইয়া সেই সূতা চাকরের হাতে জোলার বাড়ী বেচিয়া, দেওয়া এই সমস্ত পরের 'বেগার' খাটিয়া বেড়াইতেও তাঁহার কখন আলস্য ছিল না। খাইয়া দাইয়া নভেল লইয়া পড়িতে বসা, তাস-পাশা বা দিবানিদ্রায় গা ঢালিয়া দিয়া সকল কার্য্যেই সময়ের অভাব বোধ করা তাঁহার সেকালে হাড়ে সহিত না। শাশুড়ী-বধূর মনের অমিল চলিতেছে, রায়-গৃহিণীর কাণে উঠিলে, অমনই তিনি সেই বাড়ী যান; উভয় পক্ষকে মিষ্টবাক্যে, কখনও সস্নেহ তিরস্কারে, নানারূপ উদাহরণ

প্রদর্শনে ঠাণ্ডা করিয়া আইসেন। শাশুড়ীকে বলেন "সে কি বউ মা! তোমার গোপালের বউ, তোমার কত আদরের ধন, তাকে নিয়ে যদি সুখী হ'তে না পেলে, তা হ'লে তোমার সংসারই বা কি অরণ্যই বা কি? না না বউ, এও কি একটা কথা হলো? এই বেলা সাম্‌লে নাও, দশে না শোনে। লোকে ত ওই সব গৃহ-ছিদ্রই চায়। সাম্‌নে এসে "আহা, বলে আত্মীয়তা জানাবে, আড়ালে গিয়ে হাস্‌বে। তুমি মা, একটু সয়ে যাও, আবার সব ঠিকঠাক হয়ে যাবে।" তাহার পর বধূর কাছে যাইয়া তাহাকে বলেন, "ওলো নাতবৌ! 'মায়ে ঝিয়ে' ঝগড়া কেন লো? বলি, 'একটি পান কি কৌফ্‌ড়া' পেয়েছিলি নাকি? নে ভাই, শাশুড়ীকে গড় ক'রে পায়ের ধুলো তুলে মাথায় দে'। সর্ব্বরক্ষে! শাশুড়ীর মুখের উপর চোপা কি কর্‌তে আছে? নিজের গর্ভধারিণী আর সোয়ামীর গর্ভধারিণীতে কি 'ফরক' আছে লো নেকি! দশ দিন ঘর কর্‌ না; তখন দেখ্‌বি, আবার সে-মাকে ছেড়ে আস্‌তে যেমন প্রাণ কাঁদে, একে ছেড়ে যেতেও তেম্‌নি হবে।"

গ্রামশুদ্ধ ছোট এবং বড়, ইতর এবং ভদ্র সকলেই তাই এই প্রশস্তহৃদয়া উদার-চরিত্রা গৃহিণীর একান্ত-বশীভূত।

ভুবনবাবু এবার বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই সপরিবারে বাড়ী আসিয়াছেন, তাহাতে আবার বাড়ীতে একটা সমারোহ বিবাহ উপস্থিত। বাড়ীর লোক ব্যতিব্যস্ত হইয়া আছে, আর ভুবনবাবুর জ্যেঠাইমা'র ত বিন্দুমাত্রও অবকাশ নাই। ও দিকে রান্নাবাড়ীর উঠানে বড় করিয়া আটচালা বাঁধান, রান্নার জন্য জোয়াল কাটান, ভিয়ানঘর সাফ করান, নিত্য-যজ্ঞের জন্য ধামা ধামা ডালের বড়ী তৈয়ারী করা ইত্যাদি শতবিধ কার্য্যে তিনি এই বৃদ্ধবয়সেও চরকির মত পাক খাইয়া খাইয়া বেড়াইতে বেড়াইতে মধ্যে মধ্যে আঁচলের চোখের জল

মুছিয়া যাহাকে তাহাকে বলিতেছিলেন, "আজ যদি আমার বড় বউমা বেঁচে থাকৃত !"

যথাকালে কলিকাতা হইতে সকলে আসিয়া পৌঁছিলে রায়-গৃহিণী তাড়াতাড়ি সকল কার্য্য ফেলিয়া ছুটিয়া আসিলেন—"এস বাবা এস, —আয় মা, সরোজ। আয়, অমন রোগাটি হয়ে গেছিস্ কেন গো মা ? সুশীল ! ভাল আছ ত ভাই ? কি গো! আমার তরুবাণি !—তরুণি। বলি এতদিনে তোমার 'তরুণে'র সন্ধান মিল্‌লো তা হ'লে ? মনে মনে খুব আহ্লাদ হচ্ছে, না ?"

তরুলতা ঠাকুরমার এই স্বাগতসম্ভাষে হেঁট হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিতে করিতে পায়ের উপর একটা মৃদু রকমের চিম্‌টি কাটিয়া লজ্জায় রাঙ্গিয়া মৃদুস্বরে বলিয়া উঠিল, "যাও—তোমার আহ্লাদ হচ্ছে কি না ?"

ঠাকুরমা তাহার দাড়ি ধরিয়া চুমা লইয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আমার আহ্লাদ ত একশোবারই হচ্ছে লো ! তা ব'লে তুই কি আর তা' থেকে বাদ পড়ছিস্, বোন্ ? তা' তরুর আমার তরুণটি কেমন হচ্ছে লা বিন্‌তা ?"

বিনতা নিজেদের গহনার বাক্সটা তখন তাহার সেজ কাকীমা'র জিম্মায় সঁপিয়া দিতেছিল। সে এই সময় কাছে আসিয়া ঠাকুরমাকে প্রণাম করিতে করিতে বলিল, "এতক্ষণ পরে বিন্‌তার কথা হুঁষ হলো মেয়ের ! বল্‌বো না ত অনেক ক'রে এখন আমার খোসামোদ না কর্‌লে !"

ঠাকুরমা চঞ্চলা ছোট নাত্‌নীকে নিজের গায়ের উপর টানিয়া লইয়া মুখে তার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে আদর করিয়া বলিলেন, "ওলো ছুটু। তোর ত আদরের দিনই নিকট হয়ে এলো লো ! দিদি পথ ছেড়ে দিচ্ছে ত এইবার, আবার ছ'মাসের মধ্যেই তোর আদর বেশী করে

করেই করা যাবে তখন। এখন বল্ তো, বোন, আমার তরুর বরটি কেমন হচ্ছে ?"

বিনতা হাসিমুখে হাত পাতিয়া বলিল, "কি দেবে আগে দাও, তবে ত বল্‌বো ? নইলে শুধু শুধু তোমায় বল্‌তে যাব কেন ?

ঠাকুরমা তার ভরাগালে আঙ্গুলের একটা ঠোনা দিয়া বলিলেন, "ও মা ! দুষ্ট মেয়ের রকম দেখ ! ওলো। দোব, দোব, শীগ্‌গির একটি রাঙ্গা বর এনে দোব, দুটো দিন একটু সবুর কর।"

বিনতা এদিক ওদিক মাথা ফিরাইয়া দেখিল, কাছাকাছি কোন গুরু-জন নাই, সে তখন ফট্ করিয়া বলিয়া বসিল, "কিন্তু ঠিক রাঙ্গাবরটিই আমার চাই, দিদির মতন যেন একটি কালো বর এনে জুটিও না তা এখন থেকেই বলছি—খবরদার ! দেখো !"

ঠাকুরমা ঈষৎ বিস্মিতা হইয়া প্রশ্ন করিলেন, "কেন দিদির বর কি কালো হলো ? তোরা না তাকে দেখেছিস্ ?"

বিনতা ঠোঁট ফুলাইয়া জবাব দিল, "দেখেছিত ত, তিনি যে নিজে বনে দেখে পছন্দ ক'রে বিয়ে কর্‌বেন পণ করেছিলেন, কালো বউ কর্‌বেন না, প্রতিজ্ঞা।"

ঠাকুরমা বলিলেন, "তা কি বড্ড কালো ? তরুর অপছন্দ হয়নি ত ? ওকে জিজ্ঞাসা করেছিলি ? হ্যাঁ তরুদিদি ! বরকে মনে ধরেছে ত ?"

"যাও আমি দেখিনি।" বলিয়া লজ্জায় ঘাড় বাঁকাইয়া তরু মুখ ফিরাইয়া রহিল। বিনতা তাহার হইয়া জবাব দিল, "আহা, তোমার তরুদিদির যা পছন্দর ছিরি গো, ওটা তো একটা জড়পদার্থ ! ও পিসিমাকে বল্লে কি জানো ? বল্লে, বাবার যখন পছন্দ হয়েছে, তখন নিশ্চয় ও-ই ভাল। বাইরের রূপ থাকৃলে আমার হয় ত চোখে বেশী ভাল লাগত, কিন্তু ভিতরের গুণ কি আর আমি বেশী তলিয়ে বুঝতে

পার্‌তুম ? ওঁরা আমাদের চাইতে শত গুণেই তো বেশী বুঝেন, ওঁদের কাছে এক দিনে যেটা ধরা পড়ে, আমাদের তাতে অন্ততঃ আট বৎসর লাগবে। কি মজার কথা রে ! আমি তা ব'লে ওসব শুন্‌ছিনে, বাপু, আমি এই স্পষ্ট ব'লে রেখে দিচ্ছি, আমার কিন্তু ওরকম গয়লার গাইটি নিয়ে কিছুতেই চল্‌বে না। তা'হলে আমি বিয়েই কর্‌বো না ?

ঠাকুরমা তরুর উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে 'সাবিত্রী-সমানা হও' বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, "ও আমার ছোটকাল হতেই বড় ধীর, বড় বুদ্ধিমতী, তা দিদির যদি কালো বর মনে ধরে ত তোরই বা ধর্‌বে না কেন, শুনি ? তুই কি দিদির চাইতে বেশী সুন্দরী ?"

কিন্তু মুখরা বিনতাকে কিছুতেই আঁটিয়া উঠিবার উপায় নাই। সে-ও তৎক্ষণাৎ এ যুক্তির খণ্ডন করিয়া বলিল, "সুন্দরী নই বলেই আমার সুন্দর চাই গো ! কেন, দিদির বর নিজে দেখ্‌তে ভাল নয় বলে প্রতিজ্ঞা করেছিল যে, সুন্দর মেয়ে না হ'লে সে বিয়ে কর্‌বে না। তা ওঁরা যখন নিজেরা দেখ্‌তে খারাপ হ'য়ে সুন্দর বউ চান, তখন আমা-দেরই কি আর কালো হলে সুন্দর বরের সাধ যায় না ?"

বিনতাদেরই সমবয়সী তাহার মেজ কাকার একটি মেয়েও কালো বরে পড়িয়াছিল ; সে তৎক্ষণাৎ বিনতার কথায় সায় দিয়া বলিয়া উঠিল, "ঠিক বলেছিস্, বিনা ! আমরাই বা ছাড়্‌বো কেন ? কেন আমরা কি আর মানুষ নই ? ওঁরা সবাই চান রূপসী কনে, তার জন্য আমাদের দেখে মুখ সিঁটকে ফিরে যান, আমরাও যদি সেই পণ ধরি, তখন কেমন মজাটি হয় ? কালো বরগুলি তখন কোথা থেকে রূপসী বিয়ে ক'রে ক'রে ঘরে আনেন দেখি।"

ঠাকুরমা হাসিয়া ফেলিয়া বলিলেন, "এই সব মেয়েদের বুড় ক'রে রাখার ফল হচ্ছে, আর কি ! তা এদের ত বেশী বেশী স্বাধীন হ'তে

দিলে ওই রকমই ত হবে। এর পরে দেখছি, পছন্দ কর্‌তে কর্‌তে মেয়ে-পুরুষে আর মোটের উপর কারু কে কারু বিয়ে করা হয়েই উঠ্‌বে না। আমাদের দেশের তিনভাগ লোকই ত কালো। আবার তার ওপর জাত, জন্ম, কুলশীল বাছতেও ত হবে তবে ব্রাহ্মদের মতন একাকার ক'রে ফেল্‌লে অবশ্য দু' পাঁচটা মিল্‌লেও হয় ত মিল্‌তে পারে। কিন্তু একাকার করেও ত বাপু ব্রাহ্মমেয়েদের বিয়ের অভাব বেড়েছে ভিন্ন কমেনি দেখ্‌তে পাচ্ছি। অথচ হিন্দু-সমাজ কলো, কুৎসিত কেউ কখন পড়েও নেই এবং রূপের জন্যও কই কেউ যে বর বা কনেকে ত্যাগ করেছে, তাও ত বড একটা শুনিনি বা দেখিনি। বরং মহা মহা রূপসীকেও গুণের অভাবে স্বামিত্যক্তা হ'য়ে থাক্‌তে চোখে দেখেছি। কালে কালে কতই হল!"

বিনতা তখন ঠাকুরমা'কে সান্ত্বনা দিয়া এই কথা বলিল, "ওগো, অত বড ক'রে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে হবে না গো! সকল কালেই তোমার 'তরুদিদির' মতন মেয়ে জন্মে এক রকম সামঞ্জস্য করে চালিয়ে নেবে। শুধু আমার মতন পাষণ্ডরাই ত আর একলা একলা জন্মাবে না।"

এমন সময় ভুবন বাবু আসিয়া বলিলেন, "তরু মা! আমার হাত ব্যাগের চাবিটা দেবে এস ত!"

অগত্যা এই দুরূহ বিষয়টাকে অমীমাংসিত রাখিয়া তখনকার মত সভাভঙ্গ করিতে হইল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

ফাল্গুনের প্রথম সপ্তাহে শুভ-বিবাহের দিন ধার্য্য হইয়াছিল। এখন শীতের প্রকোপ নাই বলিলেই হয়, গলিতপত্র শীত-শীর্ণ বৃক্ষলতা নবকিসলয়ে আপ্রান্ত ভূষিত হইয়া উঠিয়াছে। উহাদের কোথাও কোথাও নানা বর্ণের পুষ্পগুচ্ছ ও অতি উজ্জ্বল ও বিচিত্র শোভায় দিক আলো করিয়া আছে। বিমলসলিলা দীর্ঘিকা ও পুষ্করিণীগুলিতে জলজ পুষ্প আর দেখা যায় না বটে, কিন্তু জলের মূর্ত্তি সহজেই চোখে পড়ে, গ্রামের মধ্যে মধ্যে দূর বিস্তৃত শস্যক্ষেত্র শুভ্র মূলকফুলে, হরিদ্র সরিষা কুসুমে এবং উজ্জ্বল বেগুনী বর্ণের কড়াইসুঁটির পুষ্পগুচ্ছের প্রাচুর্য্যে অপূর্ব্ব সুন্দর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া রহিয়াছে। তদ্ভিন্ন আলুক্ষেত্রের আসে পাশে রক্ত ও পীত বর্ণযুক্ত কুসুমফুলের ক্ষেত্রগুলি সকল শোভার যেন আধার হইয়া উঠিয়াছিল।

গ্রামের প্রান্তভাগে সুদূরবিস্তৃত প্রান্তর—গোচারণের মাঠ। মাঠের ইতস্ততঃ কতকগুলি বিশালকায় অশ্বত্থ, বট, তিন্তিড়ী ও পাকুড় বৃক্ষ। মধ্যে মধ্যে এক আধটা শিরীষ, সেগুন, ছাতিম এবং আম-কাঁঠালের গাছও ইহাতে আছে। ইহারা পথিকদের বিশ্রামস্থল হয় ও রৌদ্রক্লান্ত চরণশীল গাভীদিগকে আশ্রয় প্রদান করে, ইহাদের তলায় বসিয়া রাখাল-বালকেরা বাঁশের বাঁশী বাজাইয়া পুরাকালের গোষ্ঠলীলা স্মরণ করাইয়া দেয়, ইহাদের অনতি-উচ্চ শাখায় দড়ি দিয়া, দোলনা প্রস্তুত করিয়া, গ্রাম্য বালকবৃন্দ সানন্দচিত্তে দোল খায়। এই গ্রামের অনতিদূরে একটি নদী। নদীর অবস্থা এখন বিশেষ ভাল নয়, ইহার স্থানে স্থানে

চর দেখা দিয়াছে, নদীগর্ভ ক্রমে ক্রমে মজিয়া আসিতেছে। কোম্পানী বাহাদুরের রেলপথবিস্তৃতি ও খালকর্ত্তনের গুণে এমন অবস্থাপ্রাপ্তি অনেক নদীরই ভাগ্যে ঘটিতেছে, তথাপি নদীতীরবর্ত্তী সুসমৃদ্ধ গ্রামের শোভা যে কোন সৌধ, অট্টালিকাবিমণ্ডিতা নগরীর তুলনায় শতগুণেই শ্রেষ্ঠ। শুভ্র জলধারার পরপারে শান্ত স্নিগ্ধ শ্যামল তরুরাজী, পরস্পর অচ্ছেদ্যভাবে যেন চিত্রাঙ্কিতবৎ শোভা পাইতেছে। ক্বচিৎ তাহাদের বুক চিরিয়া একটি বহু প্রাচীন প্রশস্ত চাতাল ও শিবমন্দিরসমন্বিত বাঁধাঘাট নামিয়া আসিয়াছে। এ পারের মেটেঘাটের উপরেই একটা প্রকাণ্ডাকার বটবৃক্ষের তলদেশ স্নানবাধান। গ্রামের সেটি মহাঁ ঘাটলা। অদূরে জমীদার বাবুদের দ্বারা সদ্যঃসংস্কৃত বহুপুরাতন শ্মশানেশ্বর শিবের অতি বৃহৎ মন্দির ও ভোগঘর, ইহারই এক পাশে পূজারীর থাকিবার দুইখানি খড়োচালা। বৎসরের মধ্যে বৈশাখ মাসেই এখানে যথেষ্ট লোকসমাগম হইয়া থাকে। সমস্ত বৈশাখ মাস ধরিয়া নদীতীরে মেলা বইসে, শিবের মাথায় জল ঢালিতে চারিদিকের গ্রাম ও পল্লী সকল হইতে দলে দলে লোক আইসে। চম্পক-চামেলীর ও কচি বিল্বপত্রের ভারে শ্মশানেশ্বরের বিশাল মূর্ত্তিটিও তখন চাপা পড়িয়া যায়। এক্ষণে কেবলমাত্র দুইচারিটি শুষ্ক বিল্বপত্র ও কয়েকটি কুন্দ ও ক্ষুদ্রজাতীয় গাঁদা লিঙ্গমূর্ত্তির পিনাকের উপর পড়িয়া থাকে। মধ্যে মধ্যে শ্মশানযাত্রীরাই শুধু এক একটা প্রণাম করিয়া যায়।

শুভেন্দু বিবাহবাড়ীতে আসিয়াছিল বটে, কিন্তু সে বাড়ীর সহিত তাহার সম্বন্ধটা বেশ ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত হইতে পারে নাই। নিজের সমবয়সী অথবা অধিকাংশ বয়ঃকনিষ্ঠ বালক, এমন কি দুই চারিটি বালিকাকে পর্য্যন্ত নিজ দলভুক্ত করিয়া লইয়া সে সারাগ্রাম ও গ্রামান্তর পর্য্যন্ত তোলপাড় করিয়া ফিরিতেছিল। তাহার সুন্দর চেহারায় এবং নানারূপ উদ্ভাবনী শক্তির মধ্যে বোধ করি কোনরূপ সম্মোহনের ক্ষমতাও

নিহিত ছিল, দুই দণ্ডের পরিচিত সকলেই একবাক্যে যেন কতকালের দলপতির মত তাহার বশ্যতা স্বীকার করিয়া লইতেছিল। ছোট ছোট মেয়েরা পর্য্যন্ত বাড়ীর লোকের তাড়না উপেক্ষা করিয়া সেই আকর্ষণী শক্তির আকর্ষণে আকৃষ্ট হওয়া বোধ করিতে পারে নাই। ইহাদের দ্বারা নির্ব্বিরোধে শুভেন্দু অনেক প্রকার অকর্ম্ম, দুষ্কর্ম্মের সাহায্য পাইতেছিল, সাজাগান ও আচার চুরিতে ইহারাই সকলের অগ্রবর্ত্তিনী।

এই দলের মধ্যে ভুবনবাবুর ছেলে সুশীলকেই শুভেন্দু বেশী মুগ্ধ করিয়াছিল। সুশীল শুভেন্দুর ঠিক সমবয়সী হইলেও এবং স্কুলের পড়ায় এ পর্য্যন্ত ভাল ছেলে বলিয়া গণ্য হইতে থাকিলেও এবার এই শুভেন্দুর শুভাগমনে তাহার নিজেকে নেহাৎ ছেলেমানুষ ও নিতান্তই নির্ব্বোধ বলিয়া মনে হইল। কলিকাতায় সে এক প্রকার বন্দিদশায় কাল কাটায়। প্রাতঃকালে ঘুম ভাঙ্গিয়া উঠা হইতে রাত্রিতে বিছানায় প্রবেশ করা পর্য্যন্ত সমস্ত দিনটিই তাহার একই নিয়মসূত্রে গ্রথিত হইয়া, একখানা কঠিনের লেখার মত হইয়া আছে, ইহার একটি দিনের নিয়মও কখন উলোটপালট হইতে পায় না। আজও সকালে সেই মুখ ধোওয়া চা খাওয়া, মাষ্টারের কাছে পড়িতে বসা, পাঠশেষে চাকরের হাতে তেল মাখিয়া সাবান ঘষিয়া পরিপাটী স্নান ও অত্যন্ত সাবধানতা-পূর্ণ ভাবে অর্থাৎ তেল, ঝাল, টক ও সস্তা দামের তরিতরকারি, মৎস্য, ফল সমস্তই বর্জ্জন করিয়া রোগীর পথ্যানুমোদিতভাবে গুরুজনের শাসন-দৃষ্টির তলে তলে আহার কার্য্য সমাধা এবং গাড়ী চাপিয়া মাষ্টারের সঙ্গে স্কুলে গমন। বাকী দিনটার ইতিহাসও এই পূর্ব্বার্দ্ধের সহিত নেহাৎ বেখাপ্পা নয়। খেলার যেটুকু অবসর সে পায়, সেও এক আনন্দ-উৎসাহবিহীন প্রাণহীন খেলা। বাড়ীর ক্ষুদ্র 'লনে' মাষ্টারমশাই, বাবা এবং বাবার বন্ধু এক আধজনের সঙ্গেই আর সব

বিষয়ের মতই সে খেলা সীমাবদ্ধ পিংপং, ব্যাডমিণ্টন, টেনিস, কখন বা ঘরের মধ্যে বিলিয়ার্ড টেবলে এমনই নিরুৎসাহে বিলিয়ার্ড বল লইয়া ছোঁড়াছুঁড়ি। ভুবনবাবুর একটি ভাই যুবাবয়সে ফুটবল খেলিতে গিয়া গুরু আঘাত প্রাপ্ত হয়েন ও তাহাতেই তাঁহার মৃত্যু ঘটে; সেই পর্য্যন্ত এ পরিবারে ফুটবল খেলা নিষিদ্ধ হইয়া গিয়াছে। আর হাড়ুডুডু, গুলিডাণ্ডা এ সব এখনও ছোটলোকের ছেলেরা কদাচিৎ খেলিতেছে বটে, তবে আশা আছে যে, দুই দিন পরে তাহারাও আর খেলিবে না, টেনিস খেলাই বোধ করি আরম্ভ করিবে। কাজেই সুশীলের নিগড়বদ্ধ জীবন পল্লী-স্বাধীনতার স্বাদ পাইয়া আনন্দে মাতিয়া উঠিয়াছিল, তাহার উপর আবার শুভেন্দুর মত এক জন সর্ব্ববিদ্যায় বিশারদ সঙ্গী লাভ করায় তাহার মন পরম সুখে নৃত্য করিয়া উঠিল। যদি বা একদিন পিসীমা, দিদি, মাষ্টার মহাশয় প্রভৃতি অশেষবিশেষ চেষ্টা দ্বারা তাহার স্নানাহারটাকে কতকটা নিয়মিত রাখিয়াছিলেন, কিন্তু শুভেন্দুর শুভাগমনাবধি আর কাহারও সাধ্যে তাহাকে আঁটিয়া উঠা সম্ভবই হইল না।

বাড়ীর বড় পুষ্করিণীতে সচরাচর বাহিরের লোক স্নান করিতে পায় না। বাড়ীর বাবুরা বা বধূ ও কন্যাগণ স্নান করিয়া থাকেন। আজকাল বিবাহবাড়ীতে এ নিয়ম রক্ষা করা সম্ভব ছিল না, এখন দিবারাত্রিই নিমন্ত্রিত নিমন্ত্রিতাগণের দ্বারা পুষ্করিণীর জল আলোড়িত হইতেছিল। কলিকাতাবাসী সুশীল ইতঃপূর্ব্বে বাটী আসিলে নদীর তোলা জলেই স্নান করিত। পুকুরে নামিয়া স্নান করায় তাহার মনেও বিলক্ষণ ভয় আছে এবং বাড়ীর লোকেরও নিষেধ ছিল। শুভেন্দু আসায় সে ভয় ও নিষেধ কোথায় যে ভাসিয়া চলিয়া গেল, তাহার আর কিছুই ঠিকানা পর্য্যন্ত রহিল না। প্রথম দিন সিঁড়ির ধাপের উপর

বসিয়া ঘটি করিয়া মাথায় জল পড়িল, দ্বিতীয় দিনে শুভেন্দুর বিশেষ সাহায্যে ডুব দিয়া স্নান হইল, তৃতীয় দিবসে পল্লীর অন্যান্য বালকদিগের সহিত সমান পাল্লা দিয়া সুশীল পুষ্করিণীবাসী মৎস্য, শম্বুক ও কর্কটিকার দলকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। অবশেষে বাড়ীর লোকের তাড়নার হস্ত হইতে সম্পূর্ণ নিরাপদ হওয়ার চেষ্টায় পরামর্শ করিয়া এক দিন তাহারা নদীস্নান করিতে গেল। সে দিন ওকর গায়েহলুদ। বাড়ীর লোক সেই সব ব্যাপারেই ব্যতিব্যস্ত হইয়া আছে। ইহারই ফাঁকে ফাঁকে সুশীল এই নদীস্নানার্থীর দলে ভিড়িয়া পড়িতে বিশেষভাবেই সুবিধা পাইয়াছিল। নতুবা হয় ত তাহার গমনে বাধা পড়ত।

সাঁতার দিতে শুভেন্দুর যুড়ি প্রায় খুঁজিয়া মিলে না। কোন্ বিদ্যাটারই বা তাহার অভাব আছে। সুশীলের খুড়তুতো ভাই সলিলকুমারের সহিত "বাচ" লাগাইয়া সে মাঝনদী পর্য্যন্ত গিয়া দেখিল, সুশীল তখনও ভরসা করিয়া জলে নামে নাই। শুভেন্দুর মতলব ফাঁসিয়া গেল। মিছামিছি নিজের হার স্বীকার করিয়া লইয়া সে সলিলের পাশ কাটাইয়া ফিরিল। চারিদিকের হুর্‌রে ধ্বনির মধ্য দিয়া দৃক্‌পাত-শূন্যভাবে তীরে উঠিয়া সে সুশীলের নিকট আসিলে নিতান্ত ম্রিয়মাণভাবে সুশীল তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "সলিলদার কাছে তুমি হেরে গেলে? কিন্তু তুমিই ত তখনও অনেকখানি এগিয়েছিলে, হার স্বীকার ক'রে নিলে কেন? ও কক্ষণো অতদূর যেতে পার্‌তো না।"

শুভেন্দু ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া জবাব দিল, "তুমি জলে না নেমে সংএর মতন দাঁড়িয়ে রইলে কেন? তাইতেই ত আমায় শুধু শুধু হার মেনে নিয়ে ফিরে আস্‌তে হলো। তুমি একেবারেই 'গুড-ফর-নথিং বয়'!"—

এই ইংরাজী গালিটুকু সে তাহার সম্বন্ধে অনেকের মুখেই শুনিয়া

আসিতেছে, কিন্তু কখন সেটা নিজের সম্বন্ধে বিশ্বাস করিতে পারে নাই, আজ উপযুক্ত পাত্র পাইয়া এক হাত লইল।

সুশীলের মুখ লজ্জায় আরক্ত হইয়া উঠিল। সে স্কুলের মধ্যে ভাল ছেলে, বাড়ীতে ত কথাই নাই। এমন কথা এ পর্য্যন্ত কাহারও মুখ হইতে সে শুনিতে পায় নাই। কাজেই মনে মনে রাগিয়া সে মুখখানা হাঁড়ি করিয়া জলে নামিল এবং প্রায় আবক্ষ জলে পৌঁছিয়াই গভীর জলের দিকে ঝাঁপাইয়া পড়িল ও সঙ্গে সঙ্গেই ডুবিয়া গেল।—সেখানটায় একটা গভীর খাদের মত গর্ত্ত ছিল।

এই অতর্কিত এবং অপ্রত্যাশিত ঘটনায় ঘাটশুদ্ধ ছেলের দল অনেকেই স্তম্ভিত হইয়া রহিল। অনেকেই আবার, সুশীল এটা ডুব দিল কি ডুবিল, তাহারও কোন স্থিরতা করিয়া উঠিতে পারে নাই, এমন কি তাহাদের মধ্যে হইতে কেহ কেহ চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "বাহবা, সুশীল।"

কিন্তু প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে শুভেন্দুর একটুও বিলম্ব ঘটে নাই, সেও তাহার সঙ্গে সঙ্গে তৎক্ষণাৎ লাফাইয়া জলে পড়িয়াছিল এবং খানিকটা পরে অনেকখানি জল খাইয়া প্রায় অবসন্ন সুশীলের শিথিল দেহ সাপটাইয়া ধরিয়া কোনমতে তাহাকে উদ্ধার করিল। শুভেন্দু ও সলিলে মিলিয়া যখন সুশীলকে তীরে উঠাইল, তখন সুশীলের সমস্ত দেহ পাংশুবর্ণ হইয়া গিয়াছে, তার হাত-পা গুলা শীতে নীল মাড়িয়াছে, দাঁতে দাঁতে ঘষিয়া যাইতেছে, পেটের মধ্যেও কিছু জল গিয়াছে, তবে সেটা খুব বেশী নয়। স্তব্ধ, ভয়াকুল সঙ্গীর দল এতক্ষণে কিছু ভরসা পাইয়া একসঙ্গে কোলাহল করিয়া উঠিল, কেহ কেহ বলিল। "বাড়ীতে খবর দেওয়া দরকার।" কেহ বা প্রস্তাব করিল "একখানা ডুলি আনাতে হবে।" সলিল শুষ্ক মুখে কহিল "কিন্তু জেঠামশায় কি ভয়ানক যে চটে যাবেন,

সে বল্‌বারই নয়!" এই সম্ভাবনাটার আসন্ন ভয়ে অনেকেই আড়ষ্ট হইয়া গেল।

দুই এক জন বালক বার্ত্তাবহের কার্য্য করিতে উদ্যত হইয়া বাড়ীর পথে পা বাড়াইতে যাইতেই সুশীলকে লইয়া অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত শুভেন্দু তাহাদের হুকুম দিয়া বলিল, "খবরদার! এ সম্বন্ধে একটি কথাও যেন কারুর মুখ থেকে বার হ'তে পর্য্যন্ত না পায়! সুশীল! এই সুশীল! তোর কি ডুলি চ'ড়ে বাড়ী যাবার সাধ হচ্ছে না কি রে?—দিদির বরের মতন?"

ইতিমধ্যেই সুশীল অনেকখানি সামলাইয়া আসিয়াছিল, কিন্তু এক পেট জল খাওয়া তাহার শরীরের মধ্যে তখন এক রকম হাঁস্‌ফাঁস্ করিতেছে, বমনেচ্ছা হইতেছে, ডুলি চড়িয়া বাড়ী যাইতে তার আপত্তি যে বিশেষ ছিল তা নয়, কিন্তু এই অবমাননাজনক পরিহাসে ইহারই মধ্যে সে কিছু উত্তেজিত হইয়া উঠিয়া সবেগে মাথা নাড়া দিল, "ছ্যাৎ। ডুলি কি হ'বে?"

শুভেন্দু বলিল, "তা হ'লে সব্বাই মিলে কথাটা একেবারেই চেপে যাও। তোমরা সব বাড়ী ফিরে যাও, সুশীলের খোঁজ হ'লে বলবে যে, সেও বাড়ী এসেছে। 'ওই ওদিকে আছে, ডেকে আনছি, এই না ব'লে সটান্ স'রে পড়বে। আমি একটু পরেই ওকে নিয়ে যাচ্ছি। এই নিত্য! একটা কায কর্ দেখি, 'ওই মন্দিরবাড়ীর পুকুরের কাছ থেকে এতটা নুণ নিয়ে আয়, সেইটে জলে গুলে খাইয়ে দিলে বমি হয়ে যাবে। তা হ'লেই সব সেরে ঠিক হয়ে যাবেখ'ন।"

নিত্য আদেশপালনে ছুটিল। সলিলের মেজ ভাই অনিল বলিয়া উঠিল, "শুভেন্দুর যে ডাক্তারীও পড়া আছে দেখ্‌ছি!"

গর্ব্বে বুক ফুলাইয়া শুভেন্দু সেই ফুলান বুকে তাল ঠুকিয়া কহিল,

"থাক্‌বে না! আমি যে 'লাষ্টো কেলাশের আউট' হওয়া ছেলে, তার খবর রাখো কিছু? আমার কোন্ বিদ্যেটাই বা কম?"

এই গর্ব্বোক্তির মধ্যে অর্থ কিছু থাকুক বা না-ই থাকুক, উহার বলিবার ধরণে কথাটা শুনিয়া সকলেই খুব একচোট হাসিল এবং নুণ খাইয়া সুশীলের পেটের জল অনেকখানি বাহির হইয়া গেল. সুশীলকে কতকটা সুস্থ দেখিয়া শুভেন্দুর পরামর্শমত তাহাদের দুই জনকে শুধু সেখানে রাখিয়া অপর সকলে বাড়ী ফিরিয়া চলিল। ইহার মধ্যে সুশীলের জলমগ্ন হওয়ার খবরটা বেমালুনভাবে চাপিয়া যাওয়া হইবে বলিয়াই সেই পঞ্চায়েত সভায় একবাক্যে স্থির হইয়া গিয়াছিল।

সুশীলের জলে ডোবার সংবাদটা বাড়ীর লোকের কাছে গোপন রাখা হইল বটে, এবং সে দিন তরুর ভাবী শ্বশুরবাড়ী হইতে তত্ত্ব আসার গোলমালে সুশীলের গৃহে অনুপস্থিতিও কাহারও তেমন দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারিল না বটে; তথাপি সুশীলের নিজের মনের মধ্যে এ দিনের এই ঘটনাটা কেমন যেন একটা অপরাধের গুরু ভাবের মতই ভারী হইয়া রহিল। বিবাহবাড়ীর আমোদে সকলেই সুখোন্মত্ত। তরুর শাশুড়ীর সুবিবেচনার ও শ্বশুরের মুক্তহস্ততার খ্যাতিতে সে দিন বাড়ী ছাপাইয়া দেশ ভরিয়া গেল। বাড়ীশুদ্ধ, পাড়াশুদ্ধ, ছেলেমেয়েরা তরুর সদ্যঃপ্রাপ্ত খেলানার রাশির চারিদিকে, বসন্তপুষ্পসম্ভারের চারি পার্শ্বে আকর্ষিত মধুপকুলের ন্যায়, গুঞ্জরিয়া ফিরিতে লাগিল; কিন্তু অনেক ডাকাডাকির পর ম্লানমুখে আসিয়া সেই যে সুশীল একটিবারমাত্র দিদির বিপুল ঐশ্বর্য্যভাণ্ডারের পানে অনাগ্রহভাবে তাকাইয়াই আস্তে আস্তে চলিয়া গেল, সেটা আর কেহ লক্ষ্য না করুক, তরুলতা করিয়াছিল এবং পরম স্নেহের ছোট ভাইটির এই প্রকার বৈরাগ্যপূর্ণ অবহেলার ভাব তাহাকে একটুখানি ব্যথিত করিতেও ছাড়ে নাই। তরু ভাবিল, "এ সব জিনিষ,

বোধ হয়, সুশীলের তেমন পছন্দ হয়নি। আমি কোথায় ভাবছিলুম, এগুলি সব হাতে পেলে এর থেকে ভালগুলি বেছে বেছে সুশু আর বিনাকে এর অনেকগুলিই দিয়ে দেবো। কিন্তু কেন ওর কিছু ভাল লাগলো না? আচ্ছা, আমি ওকে ছেড়ে চ'লে যাব, তাই মনে ক'রে কি ওর মুখটি অত শুক্‌নো দেখাচ্ছে!" সুখ-সরোবর পরিপূর্ণ হইয়াও তাই ছাপাইতে পারিল না।

সুশীলের অথচ এ সব বিষয়ে কোনমতেই আজ মন লাগিতেছিল না। মাতৃহীন সুশীল পিতার বড় আদরের ধন। ভুবনবাবুর নিজের একটা আদর্শ ছিল। তাঁহার বিশ্বাস, ছেলেরা শাসনে একেবারেই বিগড়াইয়া যায়, অতএব তাহাদের সতত আদর করিবে, কিন্তু একমাত্র লক্ষ্য রাখিবে—তাহাদের নৈতিক চরিত্রের দিকে। মিথ্যাবাক্যকথন এবং মিথ্যাচরণ না ঘটিতে পারিলেই শিশুজীবন চিরনিরাপদ্ হইতে পারিবে, ইহাই তাঁহার দৃঢ় ধারণা এবং আজীবন এই শিক্ষাতেই তিনি তাঁহার একমাত্র পুত্রকে "মানুষ" করিতে চেষ্টা করিতেছেন। সুশীলও এই অনুসারে পিতার সহিত কোন বিষয়ে লুকাচুরি করিতে কখন শিক্ষা করে নাই, এবং এ পর্য্যন্ত তাহার প্রয়োজনও তাহার কখন ঘটে নাই। কলিকাতাবাসী বালকের ছাত্রজীবন এমনই ঘড়ীর কাঁটার মত নিয়মতন্ত্রতায় গঠিত যে, তাহা হইতে এতটুকুও এদিক্ ওদিক্ সরিবার তাহার কখনই দরকার হয় না। আজ জীবনে এই প্রথমবার শুভেন্দুর পরামর্শের কুহকে পড়িয়া সুশীল পিতার নিকট কথা গোপন করিল এবং তাহাই তাহার বিবেককে ভীমরুলের হুলের মত কাঁটা বিঁধাইতেছিল।

অবশ্য সুশীলের সপক্ষ যুক্তিরও কিছু অভাব ছিল না। শুভেন্দু তাহাকে বলিয়া দিয়াছিল যে, ইহাকে মিথ্যাচরণ মনে করা সুশীলের নিছক কল্পনামাত্র! অপর কোন যথার্থ কারণ ইহার সঙ্গে নিহিত নাই।

যেহেতু, সুশীলের পিতা এ সম্বন্ধে কিছুই জানেন না, এ বিষয়ে তিনি তাহাকে কোন প্রশ্নও করিতেছেন না, এবং সে-ও সে প্রশ্নের ভুল উত্তরও দিতেছে না। তবে তাহার ইহা মিথ্যাচরণ কিসে হইতে গেল ? – কিসে যে হইতে গেল, শুভেন্দুর সে কথা বুঝিতে পারা সম্ভব ত ছিলই না, সুশীলেরও সমস্ত সত্তা এই গোপনতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া উঠিতে থাকিলেও সেটাকে ভাষা দিয়া গুছাইয়া প্রকাশ করিতে কতকটা তাহার অনভিজ্ঞতা ও কতকটা মানসিক দৌর্ব্বল্য তাহাকে বাধা দিতেছিল। সে-ও, মনে না হউক, অন্ততঃ মুখেও মৌন রহিয়া এ মিথ্যাকে সত্যের আসনে বসাইয়া আত্মপ্রতারণার সূত্রপাত করিল। কিন্তু চিরদিনের শিক্ষাকে ত বড় সহজে কেহ এড়াইয়া যাইতে পারে না, তাই ভিতরে ভিতরে মনটা তাহার এমন সুখের দিনেও একান্ত নীরস, তিক্ত ও সুখলেশহীন হইয়া রহিল, আর পাছে কোনরূপ কূটপ্রশ্নে পড়িতে হয়, এই ভয়ে পিতার চির-ঈপ্সিত সঙ্গের আসক্তি পরিহারপূর্ব্বক পিতার সান্নিধ্যকে সে যথাসাধ্যই পরিহার করিয়া বেড়াইতে লাগিল।—এ ঘটনাও সুশীলের জীবনে এই প্রথম।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

যথাকালে তরুর বিবাহ সাড়ম্বরে সমাধা হইয়া গেল। কিন্তু রোশনাই একআলো দিয়াও বরের কালো রঙ ঢাকা পড়ে নাই এটাও ঠিক। বর দেখিয়া ঘরে পরে অনেকেই মুখ বাঁকাইলেন। কেহ কেহ আবার সেই বাঁকামুখে মন্তব্য করিলেন—"মেয়ে সেয়ানা আছে লো! জানে মনে, বড়লোক বিয়ে করলে হীরের পাশবালিসও পায়ে দিয়ে শুতে পাবে। নাই বা রইলো বরের অঙ্গে রূপ, রূপোর ত আর তা' ব'লে তার ঘরে অভাব নেই। তাই হলেই হলো। হীরের আলোয় গায়ের রং চেপে যাবে।"

ইহা শুনিয়া একজন [illegible] হাসিনী রূপসী ঠোঁট উল্টাইয়া জবাব করিলেন, "তা' যা' বলিস্ [illegible] কোস্ বোন্। আমি বাবু হক কথা বল্‌বো। রূপো যতই কেন সিন্দুকে সিন্দুকে ঠাসা থাক, কি মেয়ে কি পুরুষ অঙ্গে যদি একটু রূপই না রইল ত সকলি যার 'বেব্থা' হলো। ওই যে কুল-আঁটির মতন মুক্তর মালা গলায় ঝুলছে, ও যদি বট্‌ঠাকুরের ছেলে—কি ওই ওঁর বন্ধুর ছেলে শুভেন্দুর গলায় ওঠে ত দেখবে, ওর না জেল্লা খুলে যাবে! আর এর গলায় মনে হচ্ছে যেন সেই 'কার' গলায় মতির মালা।"—

মহিলাকুল অনেকেই এই অর্দ্ধ-প্রচ্ছন্ন উপমাটিকে স্মরণ করিয়া মুক্তকণ্ঠে উপহাসের অজস্র হাসি হাসিয়া উঠিলেন এবং সে হাসি থামিতে যথেষ্ট সময় লাগিল। এমন সময় কর্ম্মব্যস্ত বৃদ্ধা জ্যেঠাইমা সেইখান দিয়া চলিয়া যাইতে যাইতে তাঁহাদিগকে উদ্দেশ করিয়া আনন্দ-স্মিতমুখে বলিয়া

গেলেন, "ওলো, তোরা আমার ভুবনের জামাই দেখ্‌লি? তা বেটাছেলে, শ্যামবর্ণ রং একটু বটে, তাতে আর হয়েছে কি? মুখছিবিটুকুন্, বাপু, দিব্যি আছে!"

জ্যেঠাইমা'র মন্তব্য শুনিয়া অনেকেই নাক সিঁটকাইয়া ঠোঁট উল্টাইলেন। তাঁহার পিছন ফিরিতে যেটুকু দেরি, তাহার পরই তাঁহাদের তীব্রভাষার ঝাঁজে ভুবনবাবুর নব জামাতার 'মুখছিবিটুকু'র সমস্ত শ্রীই প্রায় ঝলসিয়া গেল। ভুবনবাবুর ভ্রাতৃবধূ বলিলেন, "ও বল্‌তে হয়, তাই বলা। যখন ঘরের জামাই হচ্ছেন, তখন ওকথা না ব'লে আর কি বলা যাবে? তবে সত্যি কথা বল্‌তে হ'লে বাবু বল্‌তে হয় যে, মুখে 'ছিবি'টিরি ব'লে ত কোন পদার্থই দেখতে পেলেম না।"

ইঁহার আর এক জন জা বলিলেন, "সে কি লো, সেজদি! দেখতে পেলিনি কি বল্? কেন, দিদি! অমন খাঁদা নাক, অমন দুটি কোটরে ঢাকা চক্ষু আর অমন 'ট্যাকতোলা' চৌড়া 'চৌরস গড়ের মাঠের মতন' প্রকাণ্ড কপাল রয়েছে, মুখে আর নেই কি?"

আর এক জন বলিলেন, "ওলো, ব্যাখ্যানা কর্‌ছিস্ কি? বড় কপাল যে ভাগ্যবন্ত পুরুষের লক্ষণ। দেখছিস্ না, তাই অমন কপালে-পুরুষ। পাঁচটা না ছ'টা পাশ দিয়েছে, আবার শুন্‌তে পাই নাকি খুব ভাল চাকরীও পেয়ে গেছে এই বয়েসে।"

"তার উপর অমন রূপেগুণে বৌ পেলে।"

মেয়ের খুড়ী একটুখানি টেপা হাসি হাসিয়া মন্তব্য করিলেন, "তা হোক, ভাই, সে ত অনেকেরই হয়, তা ব'লে মুখের অর্দ্ধেকখানি কপাল কিন্তু ভগবান্ সব্বার জন্যেই তৈরি করেন না।"

বাসরঘরে সুরসিকা ঠান্‌দি বরের পাশে বসিয়া সুর করিয়া গানের [illegible] সখেদে গাহিলেন—"হায় বিধি পাকা আম দাঁড়কাকে খায়!"

বর যতীন্দ্র দেখিতে সত্যসত্যই ভাল নহে। সংসারশুদ্ধ সকলকেই যে সুরূপ হইতে হইবে, এমনও ত কোন কথাবার্ত্তা বাঁধা নাই! কেহ বা রূপে মন্দ, কেহ বা গুণে মন্দ, আবার কেহ কেহ রূপেগুণে সর্ব্ববিষয়েই শ্রেষ্ঠ হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে; কোথাও ঠিক উল্টাও ঘটে। যতীন্দ্রনাথের রূপ দেখিয়া তাহাকে বিচার করিতে বসিলে আরম্ভেই তাহাকে ফেল করিয়া বসিতে হয়। কিন্তু মানুষের বুদ্ধি, বিদ্যা এবং বিনয়বাধ্যতা এ সকল গুণ নাকি কখন চামড়ার রঙ্গের উপর নির্ভর করে না, সেই হেতু এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সমুদয় ছোট বড় ডিগ্রিধারী পরমপণ্ডিত সুচরিত্র ছেলেটি এক দিকে কঠোর কর্ত্তৃপক্ষের নিকট হইতে বড় রকম মাহিয়ানার একটা উচ্চপদ এবং অপর পক্ষে সুবিজ্ঞ ভুবনমোহনের নিকট হইতে সাধারণ-দুর্ল্লভ কন্যারত্ন এতদুভয়ই লাভ করিয়া বসিল। ভাগ্য-বিধাতা তাহার অন্তর ও বাহির ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত করিতে কোথাও কোন কার্পণ্য দেখাইলেন না। আবার কনে দেখা এবং বিশেষতঃ শুভদৃষ্টির সময় তরুণী তরুর সলজ্জ স্মিতমুখখানি পলকের মধ্যে দেখিয়া ফেলিয়া যতীন্দ্রের তরুণ চিত্ত আশার পুলকে নাচিয়া উঠিয়াছিল। তরুর মুখে ত কোথাও অসন্তোষের ছায়া নাই! তাহা হইলে কুরূপ যতীন্দ্রের প্রতি তাহার মনে কোন বিরুদ্ধভাবের উদয় হয় নাই! নতুবা অমন মন্দমধুর হাসির ছটায় কখন ঐ দুইটি ক্ষুদ্র প্রবাল-রক্ত ওষ্ঠাধর অনুরঞ্জিত হইয়া থাকিতে পারিত? গুরুজনের আদেশে যখন সে তাহার ভূমিলগ্ন অবনত নেত্র দুইটি উঠাইয়া সুধীরে যতীন্দ্রের মুখে বারেকের জন্য স্থাপন করিল, সেই পলকের মধ্যের চকিত দৃষ্টিটুকুর তলে কি অপূর্ব্ব বরাভয় সে যে দেখিতে পাইয়াছে, তাহারই সুখজড়িত বিপুল বিস্ময়ে তাহার যৌবনোন্মেষিত আশাভরা চিত্ত যেন মুহুর্মুহু সুখভরে নর্ত্তিত ও কম্পিত হইতেছিল। অন্তরে নিহিত সেই গভীর পুলকের উৎস উৎসারিত করিয়া

দিয়া তাই সে ঠান্‌দির অনুযোগের উত্তরে সহাস্যমুখে জবাব দিতে পারিল,—

"যে বিধি করেছে চাঁদে রাহুর আহার,
কমলে কণ্টক হায় বিধান তাহার।"

ঠান্‌দিও তেমনই! তিনিও কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হইয়া হাসিমুখে কহিয়া উঠিলেন, "ঠিক বলেছ, ভাই! 'কমলে কণ্টক হায় বিধান তাহার!' ওলো ও সাবিত্তিরি! চঞ্চলা! বেলা! তোরা দুটো গানটান গা' না'লা। বলি সেই 'রাধাশ্যামের' গানটি গা' দেখি,—বেশ অক্ষরে অক্ষরে হুবহু মিলে যাবে এখন। ও মা, জানিস্‌নে কি লো? অবাক্ কথা মা! আজকালকের ছুঁড়ীগুলো সব কিই গো! রজনী সেন আর রবি ঠাকুরকে নিয়েই ওঁরা উন্মত্ত, আমাদের সেকেলে সব কত সুন্দর সুন্দর বাসর-জাগার গান ছিল, সে সব দেখছি তোদের হাতে প'ড়ে লোপ পেয়েই যাবে। নে', তা হ'লে আমিই না হয় তোদের বদলে গেয়ে দিচ্ছি। আমার এমন সুখের দিনে একটু গানও গাইব না? তা' দেখিস্, ভাই, শেষে যেন গলা শুনে হেসে বিষম খেয়ে মরিস্‌নে সব। আমাদের সেকালে অত গলা ফলার ভাবনা ছিল না, বাড়ীতেই হোক, পাড়াতেই হোক, বর দেখলেই আমাদের গানে পেত, তা গলা থাক বা নাই থাক।"

"কই ঠান্‌দি, গান গাও, বক্তৃতাই ত দিতে লাগ্‌লে।"

"এই যে গাচ্ছি লো, এই যে কলি, এসেছিস্, তুই ত ঐ-গানটা জানিস আয় আমার সাথে গা'—দেখি—

'রাধাশ্যাম একাসনে মিলেছে ভাল।
মিলেছে ভাল—রাধাশ্যাম সেজেছে ভাল—

ওগো, রাই আমাদের সো-নার ব-বণ,
শ্যাম চিক্কণ কালো' ।"

গান শেষ হইলে সভামধ্যে একটা চাপা হাসিব তরঙ্গ ক্ষণে ক্ষণে পরিস্ফুট হইয়া উঠিতে লাগিল। শ্রোতৃবৃন্দের মধ্য হইতে দুই একজন চাপা গলায় বলাবলি করিলেন, 'তা ঠিকই হয়েছে বটে। 'রাই আমাদের সোনাব বরণ, শ্যাম চিকণ কাল।' তা এটা ভাই ঠিক!"

গান শেষ হইলে যতীন্দ্র হাসিয়া বলিল, "গান এমন প্রত্যক্ষভাবে কারু জীবনে দেখা দেবার সুযোগ কিন্তু সর্ব্বদা পায় না না, ঠান্‌দি ?"

ঠান্‌দি অপ্রাতিভ হওয়া দূরে থাকুক, সপ্রাতিভ ভাবে গালভরা হাসিয়াই উত্তর দিলেন, "তা হ'লে গানটা তোমার ভাল লেগেছে ? দেখ ভাই, রাগটাগ করনি ত ?"

সাস্মিতমুখে যতীন্দ্র কহিল, "রাতকে যখন দিন কর্‌বার উপায় জানা নেই, তখন রাগ ক'রে আর উপায় কি বলুন ? ওই শ্রেণীর গান আপনাদের আব কতগুলি পুঁজি আছে ?"

এবাব ঠান্‌দির পূর্ব্বেই তাঁহাব পিছন হইতে এক জন আত্মপরিচয়-গোপনকারিণী—শাশুড়ী-সম্পর্কীয়া সকৌতুকে বলিয়া উঠিলেন—"কেন, দু-একটা শিখবে না কি ?"

যতীন্দ্র পূর্ব্ববৎ হাসিমুখে তৎক্ষণাৎ সেই দিকে চাহিয়া জবাব দিল, "শিখতে চাইনে, তবে যাকে লক্ষ্য ক'রে আপনারা এই সমস্ত আগ্নেয় বাণগুলি ঝাড়লেন, আজকের এত বড় পরীক্ষার দিনটায় প্রাণপণে সবাই মিলে একসঙ্গে আপনাদের সমস্ত চোখা চোখা শরসন্ধান ক'রে তাকে একেবারেই বিঁধে ফেলুন না ? তার পর দেখা যাক্, এরও পরে তিনি নিজেকে খাড়া রাখতে পারেন কি না! তবেই বুঝবো, আমার কতখানি জোরকপাল, তবেই জান্‌বো, উনি কত বড় বীর!"

এই হাসির সঙ্গে একত্র মিশ্রিত তীব্র ব্যঙ্গভরা কঠিন অনুযোগের কথা সেই বাসরঘরের অল্পবুদ্ধি মহিলামণ্ডলীর বুকে পড়িয়া তাহাদের চিত্তকেও যেন একসঙ্গে লজ্জায় শিহরিয়া তুলিল। সত্যই ত তরুর সাক্ষাতে এ আলোচনাটাকে এতদূর অবধি গড়াইতে দেওয়াটা তো সত্যই ভাল হয় নাই! তথাপি মুখে কি কেহ কখন নূতন বিবাহের বরের কাছে নিজেকে হার মানাইতে চায়? শ্যালীসম্বন্ধীয়া কলিকা রোখ করিয়া বলিল, "তা যতীনবাবু! আমরা না হয় রাতকে দিন ক'রে ফেলেই—'ওহে সুন্দর' ব'লে তানই ধরলেম, কিন্তু ওই যে তরুর হাতের পাশে তোমার ঐ হাতখানা রয়েছে, তা' এ দুখানার তফাৎ কি আর তরুণী নিজের চোখেই দেখতে পাচ্ছে না? পরের মুখে ঝালই খাওয়া যায়, তাবলে পরের কথায় কি কালোকে সাদাও দেখা চলে? তাহলে না হয় বলুন আপনাকে যতীন বাবু না বলে এখন থেকে গৌরাঙ্গ বাবু বলে বলেই ডাকতে থাকি!"

কলির কথায় সকলের চক্ষু বর-কনের যুগল হস্তের উপর আসিয়া পড়িল এবং তরুলতা তৎক্ষণাৎ অসহিষ্ণুভাবে নড়িয়া চড়িয়া নিজের সুগঠিত ও সুগৌর হাতখানাকে একেবারে কাপড়ের তলায় ঢাকা দিয়া ফেলিল।

তখন যতীন্দ্র সকৌতুক হাসিমুখে মুখ তুলিয়া তাহার আক্রমণকারিণীকে স্মিতহাস্যে কহিল, "এই আমার উত্তর শুনুন।"

কলিকাও তখন হাসিয়া ফেলিল; সহাস্যে বলিল, "তা হ'লে দ্বিতীয়বার গান্ধারীর অভিনয় করবে বোধ করি, তরু।"

এই সময় বিনতা নিজের দলবল লইয়া এই ঘরের দ্বারে উকিঝুঁকি মারিয়া বেড়াইতেছিল, কথাগুলা তাহার কানে ঢুকিতেই সে সেইখান হইতেই তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিল, "তা বুঝি তুমি জান না, কলিদি! দিদি

বলেছিল যে 'রূপ নাকি একটা কিছু জিনিষ! মানুষের গুণ থাকলেই হলো'।"

কলি উচ্চহাস্যের সহিত কহিয়া উঠিল, "ওই শোন, ভাই গুণি। তোমার গুণগ্রাহিণীর গুণের কথা শুনলে ত! আমরা তোমায় গৌরই বলি আর কালাচাঁদই বলি, বাই কিন্তু নিজের মনে ঠিক দিয়ে রেখেছে যে সে কালমাণিককে মাথার মণি করে নেবেই নেবে।"

যতীন্দ্র হাসিমুখে কহিল, "নিজেরাই শুনুন আর শিখুন। যেহেতু, এ বাড়ীর জামাইদের মধ্যে দেখলুম, আমার মতন আফ্রিকাবাসী নাই হোক, তবু আরও দু'চার জন অল্পসল্প কালোও আছেন। তাঁদের পক্ষে কিছু সুবিধা হ'তে পারবে।"

তখন এই বয়সে অত বিবেচনা ও গুণগ্রাহিতার জন্য তরুর প্রশংসায় শতমুখ হইয়া পড়িয়া বাসরবাসিনীগণ পূর্ব্ব আলোচনাতে ইতি করিলেন এবং অবশেষে সকলেই যে তরুর সহিতই একমত, তাহাও ক্রমে ক্রমে প্রমাণ হইয়া গেল। তাহার পর আপোষে কতকটা মিটমাট হইয়া গিয়া আসর কিছু নরম পড়িয়াছে, তখন ঠান্‌দির দল নিরস্ত হইয়া শ্যালিকার দলকে গান শুনাইবার আমন্ত্রণ করিলেন। তখন অরগ্যানের ঢাকা খোলা—এসরাজ বেহালা সেতারের সুর বাঁধার ধুম পড়িয়া গেল। যতীন্দ্রও তখন ভবাবুকে পার্শ্ববর্ত্তিনীর প্রতি একটা স্নিগ্ধ দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক প্রসন্নচিত্তে সঙ্গীতসুধা পান করিতে মনোযোগী হইল। জীবনের প্রথম পরীক্ষা-সাগর সে সাঁতার দিয়া আসিয়াছে, কখন ফেল হয় নাই। জীবনের মধ্য-পরীক্ষাতেও তাহা হইলে হয় ত সে উত্তীর্ণ হইতে পারিবে।

নবম পরিচ্ছেদ।

নদীর ধারে ধারে আমগাছের সারি, কাঁঠাল নারিকেল কলা ও সুপারির সুনবিড় বন। ইহারই ইতস্ততঃ কয়েকটা উঁচুদরের জাম, জামরুল, গোলাপজাম, আতা, পেয়ারা, লিচু, বেল ও কপিথ বৃক্ষ। আবার, বাদাম ভুঁত নানাজাতীয় লেবু পিচ ও ফলসা গাছও দুই একটা করিয়া আছে। বাগানখানা ভুবনবাবুদের পার্শ্ববর্ত্তী জমিদার অঘোর চৌধুরীর পুত্র বিপ্রদাস চৌধুরীর। এক্ষণে উভয় পরিবারে অসোজন্য না থাকিলেও পূর্ব্বে পূর্ব্বে কাহারও সহিত কাহারও বেশ মনের মিল ছিল না। জমাজমি লইয়া মধ্যে মধ্যে এক আধবার ফৌজদারীও হইয়া গিয়াছিল। তাহার পর অনেক দিন হইতে আর কোন গোলমাল হয় নাই; এবার তরুর বিবাহে বিপ্রদাস বাবুর স্ত্রী কন্যা নিমন্ত্রণ-রক্ষা করিয়া গিয়াছেন, বিপ্রদাস বাবু নিজে আসিতে না পারিলেও আইবুড়ভাত ভালই পাঠাইয়াছিলেন।

ছেলের দল ঐ বাগানখানার উপর চিরদিনই লোলুপদৃষ্টিতে তাকাইয়া ছিল; কিন্তু ভয়ে কেহ কখনও সেই জমিতে পা দিতে পারে নাই। শুভেন্দুর কাছে সেই কথটা ফাঁস হইতেই সে সকলকেই টিটকারী দিয়া উঠিল, "আরে ছ্যাঃ! আমি হ'লে এদ্দিনে অন্ততঃ এর তিন ভাগ ফল পেটে পুরতাম।"

সলিল মাথা দুলাইয়া বলিল, "তাই ত গো! মুখে ওসব বলা ভারি সহজ, এ বড় বিষম ঠাঁই, এর একটা আনারস উপড়ে বেদো তাঁতি জেল খেটে মরেছিল। চারটে আম পেড়ে হরে ধাড়ার ছোট ছেলে নেপা ধেপে সাত হাত নাকে খত দিয়ে তবে কোনরকমে ছাড়ান পায়। যাও একবার পেয়ারা পাড়তে, টেরটি পেয়ে এস না দেখি।"

এই তাচ্ছিল্য বাক্যে শুভেন্দুর মনের মধ্যে যে মতলবটা খেলিয়া গেল, সে তখন আর সেটাকে ফাঁস করিল না, চাপিয়া গিয়া অবান্তর কথা পাড়িয়া বসিল।

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে সুশীলকে একপাশে টানিয়া আনিয়া শুভেন্দু তাহার কানে কানে বলিল, "জানিস, সুশী! আজ একটা খুব সাহসের কায করতে যাচ্ছি, সেখানে যাওয়া কিন্তু তোর কর্ম্ম নয়, তুই বরং তার চাইতে বাড়ী যা।"

শুভেন্দু জানিত, সুশীলের চিত্তকে উত্তেজিত করিয়া তুলিতে এর চেয়ে সহজ পন্থা আর নাই। হইলও তাহাই। ইহা শুনিয়া সাগ্রহে সুশীল প্রশ্ন করিল, 'কি কায করতে যাচ্ছ শুনি?"

শুভেন্দু যেন কতই অনিচ্ছুকভাবে থামিয়া থামিয়া জবাব দিল, "সে তোমার শুনে কোনই লাভ নাই। তোমাদের মধ্যে কেউ সে কাযে হাত দিতে কখনই ভরসা করবে না। সকলদের বিশ্বাস, তা করা অসম্ভব, তাই আমি তাদের দেখাতে চাই যে, যা তোমাদের সবার পক্ষে অসম্ভব, তা একা আমার পক্ষে অতি সহজ এবং—" সুশীল তাহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়া তাহার কাঁধে একটা ঠেলা দিল ও ঔৎসুক্য সহকারে বলিয়া উঠিল, "চল এক্ষুণি,—আমিও যাব।"

শুভেন্দু যেন কতই বিস্ময়ে কহিয়া উঠিল, "তুমি!"

সুশীল গম্ভীর ও দৃঢ়স্বরে উত্তর করিল, "হুঁ"—এবং এই বলিয়া লম্বা পা ফেলিয়া সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইয়া চলিল। তখন শুভেন্দু মুক্তকণ্ঠে হাসিতে হাসিতে ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে ধরিয়া বলিল, "আরে সোজাই চল্লে যে, আমাদের পথটা যে এরথেকে একেবারেই বাঁকা।"

ফলের বাগান এখন ফলশূন্য-প্রায়, তাই বাগানের রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা অবশ্য পূর্ব্বের অপেক্ষা কিছু শিথিল, কিন্তু বাগানের মাঝখানে

যে ঘাট বাঁধান পুষ্করিণী আছে—তাহাতে অনেক মাছ ফেলা হইয়াছিল। বাবুর মাছ ধরিবার সখ বড়ই প্রবল; পাছে সেই মাছ কেহ ধরিয়া লয়, সেই ভয়ে বিশেষ-ভাবেও যে পাহারার বন্দোবস্ত আছে, আশপাশ দেখিয়া শুভেন্দু সে খবরটা জানিতে পারে নাই এবং সম্পূর্ণরূপেই জনশূন্যবোধে তাহারা দুইজনে কুল ও পেয়ারা যত পারা যায়, নিজেরা খাইয়া সঙ্গীদের দেখাইবার জন্যও অপর্য্যাপ্ত সংগ্রহ পূর্ব্বক যেমন ঝপাং করিয়া গাছ হইতে নামিয়া পড়িয়াছে, অমনি সেই প্রায়ান্ধকারে কাহার বজ্রমুষ্টি তাহার পিঠের উপর পড়িল এবং সঙ্গে সঙ্গেই পিছন হইতে দড়ি দিয়া তাহার দুখানা হাতকেই চাপিয়া বাঁধিয়া ফেলিল। সুশীলের অবস্থাও ততক্ষণের মধ্যে তাহার অপেক্ষা যে বেশী ভাল ছিল না, সেটুকু দেখিতে পাওয়ার মত আলো সেখানে ছিল।

ঘাটের রাণায় মাচা বাঁধিয়া বসিয়া বিপ্রদাস বাবু একান্তমনে হুইলের ছিপে একটা বড় কালবোস মাছকে গাথিয়া ফেলিবার জন্য অনেক্ষণ ধরিয়া চেষ্টা করিতেছেন, পারিয়া উঠেন নাই, তাই মনটা বেজার হইয়া গিয়াছে। একবার ফাৎনায় টান পড়িল, ভারি ঠেকিল, তুলিয়া দেখেন, একটা মস্ত কোলা ব্যাং—আবার একটা কাঁকড়া আসিয়া চার খাইয়া গেল—কি মুস্কিল!—

এমন সময় বাগানের দুই জন মালী তাঁহার সঙ্গের দরওয়ানটার সাহায্যে দুই কিশোর চোরকে হাত বাঁধিয়া লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইল ও সুদীর্ঘ সেলাম বাজাইয়া বলিল, "ধর্ম্মাবতার! এই দোনো চোট্টা মিল কর, কলমবালা আমরুত সবকিই তোড়তাড় লিয়া, অউর পাটনাবালা বইরভি বহুত চোরায়কে লে যাতে রহা। মালিলোককে সাথ মিলকর দুষমনকো পাকড়া গ্যয়া।"

জলের মধ্যে একটা বড় মাছের পাখনা-নাড়ার মৃদু কম্পন অনুভব

করিয়া সেদিক হইতে দৃষ্টি না তুলিয়াই ধর্ম্মাবতার বিচার শেষ করিলেন, "থানা মে লে যাও।"

বিচারের রায় শুনিয়া শুভেন্দু সকোপে দাঁত দিয়া নিজের ঠোঁট কামড়াইয়া ধরিল; কিন্তু সুশীল কোনমতেই আপনাকে আর সামলাইতে পারিল না। তাহার মুখ সাদা হইয়া গেল, সমস্ত শরীর ঠক্‌ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল এবং তাহার কণ্ঠ ভেদ করিয়া একটা সকরুণ আর্ত্তস্বর বাহির হইয়া পড়িল। শব্দটা বিপ্রদাসের কানে গেলেও তাঁহার প্রাণে উহা স্পর্শমাত্র করিল না, তিনি যথা-পূর্ব্ব হুইলের চাকার দিকেই চাহিয়া স্থির হইয়া রহিলেন। কর্কশ-কণ্ঠে দরওয়ানজী বাজপেয়ী হাঁকার দিয়া উঠিল "আগে চলবে চল"—বলার সঙ্গে ছেলে দুইটির হাতে বাঁধা দড়ীতে একটা হেঁচকাটানও সে দিল, ভদ্রলোকের ছেলে বুঝিয়াও ছাড়ান দিল না। কিন্তু সুশীল তাহাতেও নড়িল না। যতদূর সাধ্য, শরীর মনে তাহার যতখানি বল যেখানে আছে, সে সমস্তকেই একত্র সংগ্রহ করিয়া সে প্রাণপণ শক্তিতে শক্ত করিয়া মাটী চাপিয়া দাঁড়াইল, মুখেও হয় ত কিছু বলিবার ইচ্ছা ছিল; কিন্তু প্রবল অশ্রুজলের কম্পনে কথা তাহার কণ্ঠের মধ্যেই ডুবিয়া গিয়াছিল এবং কি কথাই বা তাহার বলিবার আছে, তাহাও সে যেন বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। অথচ না কহিলেও যে এখনই কি সর্ব্বনাশ তাহার ঘটিয়া যাইবে, তাহা মনে করিয়া তাহার ভীষণ আর্ত্তনাদ করিতে ইচ্ছা হইতেছিল, মাটীতে গড়াগড়ি দিয়া ডাক ছাড়িয়া কাঁদিতে ইচ্ছা করিতেছিল। শুভেন্দুর অবস্থা দেখিবার অবসর তাহার মোটেই ছিল না, নিজের কথাই এখন তাহার কাছে সমস্ত পৃথিবীর আকারের অপেক্ষাও অনেক বেশী বড়। সর্ব্বশরীরের চলন্ত রক্ত উন্মত্তের মত ছুটাছুটী করিয়া যেন তখন শুধু রুদ্র-কল্লোলে এই কথাই তাহাকে বলিতেছিল—"বাবা

জানলে কি করবেন? বাবা জানলে কি বলবেন। এর চেয়ে বেশী আর বড় কোন ভাবিবার বিষয় তাহার কাছে ছিল না।

শুভেন্দু মৃদুস্বরে দরওয়ানজীর অনেক স্তবস্তুতিই করিতেছিল, কিন্তু সে সমস্ত ভস্মে ঘৃতার্পণের ন্যায় একান্ত ব্যর্থ করিয়া চোরোদ্ধরণিকের দল যখন পরমোৎসাহে স্কন্ধ শীকার লইয়া 'কুইক মার্চ' করিয়া চলিয়াছে, এমন সময় সেই অর্দ্ধ অন্ধকারচ্ছায়াচ্ছন্ন বনবীথির মধ্য হইতে একটি ক্ষুদ্র দীপশিখার ন্যায় ক্ষুদ্রাবয়ব বালিকা ত্রস্তপদে বাহির হইয়া আসিয়া উচ্চকণ্ঠে ডাকিয়া বলিল, "বাজপেয়ীজি! হামকো একঠো পাখী ধর্‌তো দিজিয়ে! এ কাঁহা চল্‌তা হ্যয়, জরা শুনিয়ে তো থোড়া খাড়া হোকে।"

বাজপেয়ী ঈষৎ বিপন্নভাবে খাড়া হইয়া বলিল, "দেখিয়েনা খোঁকিজী! দো'ঠো চোট্টা আপনা কলমকা পেঁড়সে বহের চোরাতে রহা, ময় অভি মহারাজকা হুকুম তামিল কর্‌নেকে ওয়াস্তে থানে পর দুষমন্ লোগ কো লে চল্‌তে থেঁ, অভি ময় কেইসে পাখী ধরুঙ্গা?"

'খোঁকী' দ্রুতপদে উহাদের সম্মুখে আসিয়াই যেন বিস্ময়ে একেবারে নির্ব্বাক্ হইয়া রহিল। পরে সন্দিগ্ধ মৃদুস্বরে সে বাজপেয়ীকে বলিল, "ঝুটা বাত নেহি কহ্না! ই তো বাবু লোক হ্যায়, চোট্টা কাহে কহা?"

বাজপেয়ী হস্তবদ্ধ আনতবদন ছেলে দুইটির প্রতি টিটকারী দিয়া রসিকতা করিয়া জবাব দিল, "আরে খোঁকিজি! আপতো লেড়কা-আদমি থি, আপকা মালুম নেহি হ্যায়, আজকাল বাবু লোক সব চোট্টা ঔর ডাকু বড়ে হোতা হ্যায়! চল্ বাবু! থানেপর চল্। এইসা বহোত বাবুলোক আজকাল থানেপর যাতে উতে থে।"

মেয়েটি সহসা বিদ্যুচ্ছটার ন্যায় প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়া তীব্র গম্ভীর আদেশের স্বরে উচ্চারণ করিল, "খবরদার! হিঁয়াই খাড়া রহনা, ম্যয় পিতাজীকো পাশ চল্‌তেহেঁ।"

এই বলিয়াই যেমনই অকস্মাৎ সে কানন ভেদ করিয়া বাহির হইযাছিল, তেমনই করিয়াই আবার নিমেষ-মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল। অপরাধীদ্বয় যদি নিজ নিজ দুঃখভারে অত বেশী অবসন্ন না হইয়া পড়িত, অথবা বয়স আর একটু অধিক হইত তাহাদের হয় ত বা কাননবিহারিণী কপালকুণ্ডলাকে স্মরণ হওয়া বিচিত্র ছিল না।

* * * *

"বাজপেয়ি!"

"খোদাবন্দ।"

"চোর লোগকো দো দো বেত লাগাকর্ ছোড় দেনা।"

"যো হুকুম মহারাজ!"

হুকুম শুনিয়া শুভেন্দুর চোখ জ্বলিয়া উঠিলেও সুনীলের অবসন্নতায় প্রায়-বিচেতনদেহে যেন তৎক্ষণাৎ জীবনীশক্তি পুনঃ প্রত্যাবৃত্ত হইল। দুই বেত! দুই বেত কেন, থানায় যাওয়ার পরিবর্ত্তে সে যে সহস্রবারও বেত্রাহত হইতে প্রস্তুত আছে।

থানায় গেলে তাহার পিতা যে সকল কথা জানিতে পারিবেন! আর জানিলে পর? সুনীল ভাবিতেও পারে না যে, তার পর কি হইবে বা কি হইবে না! সুনীলকে তিনি যে কিছুই বলিবেন না, ইহা নিশ্চিত;—কিন্তু তাঁহার বুক যে কেমন করিয়া ছিঁড়িয়া পড়িবে, সে কথা সুনীল ছেলেমানুষ হইলেও তাহার অজ্ঞাত নয়। সে যথাসম্ভব দৃঢ় ও স্থিরচিত্তে দণ্ড লইতে প্রস্তুত হইল।

"বাজপেয়ীজি! বহোৎ আস্তেসে বেত লাগানা, ভাইয়া! ম্যয় আপকো একঠো রুপেয়া দেঙ্গে।"—

অত্যন্ত মৃদুস্বরে উচ্চারিত হইলেও সান্নিধ্যবশতঃ এই করুণাপ্লাবিত শব্দকয়টি অপরাধিদিগের কর্ণে প্রবেশ করিল। সুশীল ইহাতে বারেক

সকৃতজ্ঞনেত্রে সেই ক্ষুদ্র করুণাময়ীর করুণা-কাতর স্নিগ্ধমুখখানির প্রতি চাহিয়া দেখিল।

"বাপ্ রে বাপ!" বেত্রাহত সুশীল লাফাইয়া উঠিল। দ্বিতীয়বার বেত উঠাইতেই কাতরস্বরে আর্ত্তধ্বনি করিয়া পতনোন্মুখ হইতেছিল, তাহার সম্মুখবর্ত্তিনী মেয়েটি তাহাকে দুই হাত বাড়াইয়া আগুলিয়া ধরিল। জলভরা চোখে অগ্নিবর্ষণ করিয়া রুদ্ধস্বরে বলিল, "খবরদার্!"

বাজপেয়ীর হাতের বেত যেমন ছিল, তেমনই রহিল।

শুভেন্দুকে অটল দাঁড়াইয়া বেত খাইতে দেখিয়া, বিশেষ এই অপরিচিতার পূর্ব্বপ্রলোভনবাক্য স্মরণ করিয়া সুশীল মনে করিয়াছিল, বেত খাওয়া জিনিষটা সন্দেশ খাওয়ার চেয়ে খুব বেশী তফাৎ নয়; কিন্তু নিজের পিঠে উহারই একটি ঘা পড়িতেই তাহার সমস্ত ধারণাটাই উল্টাইয়া গেল। উঃ, বাজপেয়ীর হাতে আস্তে মারা বেতেরই এই জ্বালা,—না জানি, তাহার পূরাদমে কতখানি বেদম হইতে হইত!—যে সুশীল কখনও কাহারও নিকট একটা চড়চাপড়ও খায় নাই, তাহার পক্ষে এ যে একেবারেই অসহ্য। ইহার দ্বিতীয় আক্রমণের ভয়েই তাহার মূর্চ্ছা যাইবারও উপক্রম হইল।

"বাজপেয়ি! জল্দি পানি লাও, দোঠো বয়েরকে ওয়াস্তে তোম ভালা আদমীকো জান্ লে' লেঙ্গে?"

বাজপেয়ীর এই ক্ষুদ্র মনিব-কন্যাটির এ প্রকার প্রভুত্ব দেখা অভ্যাস আছে, ইহাকে সে নানা কারণে অসন্তুষ্টও করিতে ইচ্ছুক ছিল না এবং সেইজন্য শুভেন্দু ও সুশীলকে সে একটু হাতে রাখিয়াই বেত লাগাইয়াছিল, ইহাতেও যদি ননীর পুতুল চোরকে মূর্চ্ছা যাইতে হয়, তাহা হইলে সে আর করিবে কি? ঘুষের টাকাটা তাহার নষ্ট হইল দেখিয়া উহাদের উপর তাহার ক্রোধের সীমা রহিল না, মনে মনে আপশোষ হইতে

লাগিল যে, এর চেয়ে বেত দিয়া উহাদের পিঠের চামড়া খানিকটা উঠাইয়া আনিতে পারিলে তবু হাতের কিছু সুখও হইত; আর বাবু-চোরদেরও তাহার কথা চিরকাল স্মরণ থাকিতে পারিত। ঈষৎ বিরক্তিসুরে সে তাই প্রতিবাদ করিয়া বলিল, "ভালা-আদমী কভি দোস্‌রাকো বাগিচামে চোরী কর্‌নে নেহি আতেহেঁ দিদি সাহাব!—এ দেখিয়ে! ডাকুলোগ মর্‌নেহি গ্যঁয়। দেখিয়ে উঠকে খাড়া হো গিয়া। ব্যস্‌! অভি হাম দোনোকো বাহার নিকালকর দোসরা কাম্‌পর চল্‌তে থেঁ।"

মেয়েটি কিছু না বলিয়া তাহার অভ্যস্ত চঞ্চল ত্রস্তপদে আর একদিকে চলিয়া গেল, এবং ফটকের প্রায় কাছাকাছি আসিয়া শুভেন্দু ও সুশীল দেখিল, সে এক ঘটী জল হইয়া ছুটাছুটী করিয়া আসিতেছে।

"খাবার জিনিষ কিছু নেই,—শুধু খাবার জল এনেছি, নিশ্চয়ই খুব তেষ্টা পেয়েছে! একটু জল খান।"

শুভেন্দু ঘাড় নাড়িয়া অসম্মতি প্রকাশ করিল, কিন্তু সুশীল বারেক নিঃশব্দ কৃতজ্ঞতায় আবার তাহার সেই করুণাবিগলিত মুখের পানে চাহিয়া প্রায় পূরা একসেরী ঘটীর এক ঘটী জল পান করিয়া ফেলিল। তৃষ্ণায় তখন তাহার গলা কাঠ হইয়া গিয়াছিল।

দশম পরিচ্ছেদ।

অনুকূলচন্দ্রের যে কথা, কাযও সেই। বাস্তবিকই ইহার ঠিক পরের দিন এলবার্ট বালিকা বিদ্যালয়ের গাড়ী আসিবার পূর্ব্বেই সেন্ট-পিটার্স-মিসন স্কুলের একটি বলদ যোজিত সাম্পান আসিয়া নীলিমাকে তাহাদের স্কুলবাড়ীতে লইয়া চলিয়া গেল। এদিকে এলবার্ট স্কুলের গাড়ী আসিয়া স্কুলের দাই যখন তাহার অভ্যাসমত ডাকাডাকি করিতেছিল, "নীলি-বউয়া! হো—নীলি-বউয়া! আপ কেত্তা দের্ কর্‌বে বউয়া! আইয়েজি! জল্‌দী আইয়ে!"

তখন বাড়ীর ভিতর হইতে বাহিরে আসিয়া নীলিমার পিতা তাঁহার হরিদ্র প্রভ দন্তপংক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক কোন অশিষ্ট জীব-বিশেষের ন্যায় যেন উহাকে দংশনোদ্যত ভাবেই চেঁচাইয়া বলিলেন:—"এই তোম কুত্তাকো মাফিক্ এইসা কাহে চিল্লাচিল্লি করকে আদমীকো কান খাতা হ্যায়! নিকালো নিকালো;—হিঁয়াসে নিকাল যাও।"

প্রত্যক্ষ রুদ্রমূর্ত্তি দেখিয়া দাই-বেচারী তটস্থ হইয়া পড়িল, মাথার কাপড়টা একটু সংযত করিয়া লইয়া স্বর নামাইয়া বলিল, "বউয়াকো বোলাতে হেঁ, বাবুজি! জেরা মেহেরবাণী কর্‌কর্ বোলা দিজিয়ে বাবু!—দের হোগিয়া।"

অনুকূল তাঁহার খিঁচান মুখকে অধিকতর খিঁচাইয়া পঞ্চমের স্বরকে সপ্তমে চড়াইয়া কহিয়া উঠিলেন, 'বউয়াকো বোলা দিজিয়ে!' নেই নেই, বউয়া ঔর কব্‌হু হিঁয়া পড়্‌নে নেহি যায়েগি। তোম্‌হরা বিবি-সাহেব লোগকো বোল দেনা কি ঐসা খারাব ইস্কুলমে খারাপ জানানা

লোগকা পাশ হামারা লেড়কীকো হাম ঔর কভি নেহি ভেজেঙ্গে। হুঁহা পড়ানা ঠিক নেহি হোতি হ্যায়, শুরুমা লোগকো দেখ্‌কর বহোত বেচাল শিখ যাতা হ্যায়। উন্‌ লোগকো নকরী ছোড়ানেকে ওয়াস্তে হাম গবর্ণমেণ্টমে দরখাস্‌ দেতে হেঁ। যব দোসরা মাইজী লোক আবেঙ্গে, তব ফিন্‌ হামারা লেড়কী হুঁয়া পর পড়নে যাবেঙ্গে—"

শকটারোহিণী বালিকাবৃন্দ উৎসুক-আগ্রহে ঝুঁকিয়া পড়িয়া উৎকর্ণা হইয়া এই বাক্য-সুধা পান করিতে করিতে পরস্পরের মুখ চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছিল, গাড়ী চলিতে আরম্ভ হইলে অকস্মাৎ চলার ঝাঁকানী বাঁচাইয়া লইয়া যে যাহার 'নজস্থানে আসন লইয়া বসিল। সর্ব্বপ্রথম মনোরমা তাহার তুইকাঠির বোনা হাতে লইয়া সুষমার দিকে চাহিয়া হাসিল, "বুঝলি সুষি! নীলির বাবার নামে সেই যে চিঠিখানা সুলোচনাদি' পাঠিয়েছিলেন না? তার জন্যেই নী লবেচারার আপার প্রাইমারীটা দেওয়া ঘটলো না। সে হয় ত এবার পাশ করে স্কলারশিপটাও পেতে পারতো।"

সুষমার পূর্ব্বেই প্রতিমা তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "আর সুলোচনাদি' মনোরমাদি'দের চাকরী শুদ্ধ না যায়। বল্লেন যে, 'গবর্ণমেণ্টমে দরখাস দেতেহেঁ' - দেখ বেচারারা বুঝি বিপদে পড়েন বা!"

মনোরমা ঠোঁট বাঁকাইয়া অবজ্ঞাসূচকস্বরে উত্তর করিল,—"ইঃ, নীলির বাবা তো ভা—রী একজন মাতব্বর লোক কি না! তাই উনি 'দরখাস' দিয়ে সুলোচনাদি'দের চাকরী ছাড়াবেন! আহ্লাদ প'ড়ে গেছে আর কি! বড়জোর একদিন ইন্‌স্পেকট্রেস এসে ওঁদের একটা কৈফিয়ৎ না হয় তলব করবেন।"

প্রতিমা মন্তব্য করিল, "তবু তো সে একটা অপমান! আর সুলোচনাদি' ভাই যে রকম তেজালো মানুষ—"

মনো ভ্রূভঙ্গি করিয়া বলিল,—"কিসের অপমান! তা হ'লেই ত আসল কথাটাও ধরা প'ড়ে যাবে। যিনি 'দরখাস্' দিচ্ছেন, তাঁর কাছে যে স্কুলের একটা গাদা টাকা পাওনা,—সেটিও সে ওঁরা জেনে যাবেন! তাতে অপমানটা হবে কার? সুলোচনাদি' কাঁচা মেয়ে নন, সব চিঠিরই তিনি নকল রাখেন। 'রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, উলুখড়ের প্রাণ যায়' তাঁর তো নয়; লোকসান হলো নীলি-বেচারারই!—আর একটা মাসও ছিল না—মোটে এই চব্বিশটা না-পঁচিশটা দিন বাদ—পরীক্ষাটা দিলে ও নিশ্চয়ই স্কলারশিপটা পেয়ে যেত!"

অনুকা কহিল "তখন ত ও' নিজেই ভাই, ওর মাইনের টাকা দিয়ে দিতে পারতো। আহা! সুলোচনাদি' এত তাড়াতাড়ি না ক'রে যদি একটু দেরী করিতেন, তা হ'লে হয় ত ওর পরীক্ষাটা দেওয়া হ'ত!"

সাবিত্রী এতক্ষণের পর 'ট্যাক্' করিয়া উঠিল—"সুলোচনাদি' ত আর 'ফান' নন, কেমন ক'রে জান্‌বেন বল যে, পাওনা টাকা দিতে বল্লেই নীলির বাবা মেয়ে আটকাবে।—এমন ছোটলোক ত এর আগে আর কখন দেখেন'নি তিনি।"

সাবিত্রীর মুখের ভয়ে সব মেয়েই মনে মনে উহাকে সমীহ করিত, শুধু করিত না মনোরমা। সে এখনও উহার মন্তব্যের বিরুদ্ধে সঙ্গে সঙ্গেই টিপ্পনী কাটিল,—"এমন ছোটলোক যে আর কক্ষণোই দেখেননি, তাও অবশ্য হলফ করে বল্‌তে পারিনে। তবে নীলির বাবার তবু একটা আক্কেলও আছে যে, মাইনে যখন দেবেই না, তখন মেয়েও না হয় আর পড়াবে না; কিন্তু কারু কারু আবার দেখি সেটুকুনও নেই।"

সুষমা অমনি তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "কিন্তু ভাই, নীলির বাবা সুলোচনাদি'দের সম্বন্ধে কি রকম অপমানের কথাগুলো সব বলেছেন

বলতো!—আমার তখন কিন্তু এমন ভয়ানক রাগ ধরছিল। আমি ওঁদের কিন্তু সব ব'লে দেব।"

প্রতিমা বলিল, "আমিও।"

সাবিত্রী কিন্তু সেদিকে কর্ণপাত না করিয়াই মনোরমার দিকে ভ্রূকুটি কুটিল মুখ তুলিয়া সরোষে কহিল, "খবরদার বল্‌ছি, আমার সঙ্গে লাগতে আসবে না! কেন, আমি কি তোর খাই না পরি যে, যখন তখন তুই আমাকেই চিপটেন কাটতে আসিস্?"—

গাড়ী আসিয়া বিদ্যালয়ের উচ্চপ্রাচীরবেষ্টিত কম্পাউণ্ডের মধ্যে প্রবেশ করিল। তখন আজিকার এই সকল অভিনব কাহিনী সর্বপ্রথম সুলোচনাদি'র কর্ণগোচর করণার্থে আগে নামিবার জন্য হুড়াহুড়ি পড়িয়া গেল। কিন্তু তাহারই ঠেলাঠেলিতে একটী সিক্সথ্ ক্লাসের ছোট্ট মেয়ে গাড়ীর পা-দান হইতে কাঁকরবিছান পথের উপর সজোরে পড়িয়া নাকমুখ ছেঁচিয়া কান্না জুড়িয়া দেওয়াতে সুসমাচার প্রচারিকাদের প্রথম উৎসাহের মুখে তখনকার মতন পাথর চাপা পড়িয়া গেল।

স্কুলের প্রথম ঘণ্টা বাজিয়া গিয়াছিল; সকল মেয়েই নিজ নিজ স্থানে আসন গ্রহণ করিয়াছে। কেবল দুঃসাহসিকা মনোরমা সুলোচনাদি'র সম্মুখে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া স্কুলের দাই এতবারিয়ার সাক্ষ্যর মধ্যে কোথায় কি ত্রুটি থাকিয়া যাইতেছে, তাহারই হিসাব রাখিয়া যাইতেছিল। এতবারিয়ার খানিকটা বলা হইয়া গেলে সে হঠাৎ ফোঁস করিয়া উঠিল,—"হ্যাঁ দাই 'গবর্ণমণ্টমে দরখাস দেতেহেঁ',—ওই কথাটা বড় যে বাদ দিয়ে যাচ্ছিস্?—আচ্ছা মজার লোক ত তুই দেখি! শুনুন, সুলোচনাদি'! নীলির বাবা আরও যে কত কথাই বল্লেন, তা আর আপনাকে কি বল্‌বো! আপনাকে দেখে নাকি মেয়েরা 'সব বেচাল

শিখছে, আপনাদের বদলে অন্য টিচার এলে তখন ওঁর মেয়ে নাকি পড়তে আসবে—আর সে ঢের ঢের কথা—"

ইনফ্যাণ্ট ক্লাসের মেয়েদের শ্লেটের উপর পেনসিল দিয়া যুক্তাক্ষর লিখিতে বসাইয়া ফোর্থ টিচার ব্রাহ্মবালা দে কৌতূহলাক্রান্তা হইয়া পায়ে পায়ে আসিয়া মনোরমার পিছনে দাঁড়াইয়া ছিল; মনোরমাকে এবার 'কমা' দিতে দেখিয়াই অসংহৃতভাবে সে জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিল—"আরও কি কথা বলে রে মনোরমা ?"

মনোরমা সমুৎসাহিত হইয়া—ঢের কথা বলিবার জন্য উহার দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইতেও সুলোচনা গম্ভীরমুখে মিস্ দে'র দিকে চাহিয়া বলিলেন "That is impertinence" বাবু!—মনো! যাও তোমার নিজের যায়গায় গিয়ে বসগে।"

খট্ খট্ করিয়া তিনি পাশের ঘরে চলিয়া গিয়া রেজিষ্ট্রার বাহির করিয়া তার পাতা উল্টাইয়া খসখস করিয়া নীলিমার নামটা তাহা হইতে কাটিয়া দিলেন। পাশের ঘরের মেয়েরা খোলা বইএর পাতার পাশ দিয়া আড়চোখে তাঁর ঐক্ত কার্য্য দর্শনান্তে ফিস্ ফিস্ করিয়া বলাবলি করিল, "ওরে, নীলি আজ থেকে নামকাটা সেপাই হয়ে গেলরে!"

ইতোমধ্যে মনোরমা আসিয়া স্বস্থান গ্রহণ করিয়াছিল। থর্ড টিচার প্রেমকুসুম দাস কয়েকটি মেয়েকে একটা নূতন আঁক দেখাইয়া দিতেছিলেন, ইঙ্গিতে মনোরমাকে কাছে ডাকলেন। মনো আসিলে স্বর একটু নামাইয়া বলিলেন, "কই, সে চিকনটা কেনা হয়ে এসেছে ?"

মনো ঘাড় দুলাইয়া জবাব করিল, "উঁহুঁ, সে আজকে মোটে কেনা হবে, কাল আপনি ঠিক পেয়ে যাবেন।"

"ইস্!—আর এ নটী গার্ল! রোজই তো কাল, কাল বলো, কবে কাল হবে শুনি ?"

মিস্ দাসের এই কথা শু'নয়া সাবিত্রী হিহি করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিয়া উঠিল—"ওর কাল' হ'তে এখনও অনেককাল লাগবে, প্রেম-কুসুমদি'! দেখছেন না কি মোটা।"

মনোরমা ভ্রূভঙ্গি করিয়া রুখিয়া উঠিল, "তোর মতন ত আর সব্বাই পাক্‌-তাড়ানী—কাক-তাড়ানী তা' ব'লে হ'তে পারে না! না সত্যি প্রেমকুসুমদি'! কাল ঠিক এসে যাবে দেখবেন। মাকে আমিও ক'দিন ধ'রেই কেবলই তাড়া দিচ্ছি, তা মা কি বলেন জানেন?"

"কি?"—বলিয়া প্রেমকুসুম একটি মেয়ের আনা কষা অঙ্ক দেখিতে আরম্ভ করিলেন।

"মা এমন দুষ্টু!—না, আমি সে কথা বল্‌বো না।—সে আপনি শুনলে রাগ করবেন!—মা,—মা বলে, তোর প্রেমকুসুমদি'র তো আর বিয়ে বন্ধ যাচ্ছে না—এত তাড়াতাড়ি কিসের? দোবড় এখন আনিয়ে!"—এই কথাটি বলিয়া মনোরমা মুখ নামাইয়া একটুখানি ঠোঁট টিপিয়া হাসিল। এবং সঙ্গে সঙ্গে সব মেয়ের ঠোঁটেই একটু একটু হাসি দেখা দিল।

প্রেমকুসুম হাতের পেন্‌সিল্‌টা দিয়া মনোরমাকে ছুড়িয়া মারিলেন,—তাহার পর ভাঙ্গা পেন্‌সিল্‌টা কুড়াইয়া দিতে হুকুম দিয়া উহাকে একটা ধমক দিয়া উঠিলেন, "কি—সব ডেঁপো হয়ে যে উঠ্‌ছেন! দাঁড়াও না, মিস্ বোস্‌কে তোমাদের সব বিয়ের কথা শুনিয়ে দিচ্ছি!—এই অলকা! তোর কানে ও কিসের দুল রে? সিরোপাল? সুন্দর ত! কতয় কেনা হয়েছে? কোথা থেকে আনানো হ'লো? দাম জানিস্?—ওঃ! মোটে কুড়ি টাকা! এক্সেলেণ্ট! এই মেয়ে! মাকে বলে আমায় একযোড়া আনিয়ে দে' না?"

অলকারা দুই বোন—অলকা ও অমুকা দুজনেই একসঙ্গেই সমুৎসুক—

কণ্ঠে কহিয়া উঠিল—"আজই বাড়ী গিয়ে মাকে বল্‌বো'খন আমি, মা কালই নিশ্চয় কল্‌কাতায় দাদাকে লিখে দেবে পাঠাতে।"

তখন অপর ক্লাস হইতেও একটি দুইটি বড়মেয়ে উৎসাহচঞ্চল-লোভাকুলকণ্ঠে ইহার প্রতিধ্বনি তুলিল—"ও ভাই অলি! আমিও মাকে ব'লে টাকা দেবো ভাই! আমাকেও একযোড়া দুল আনিয়ে দিতে হবে কিন্তু!"

যে মেয়ের অঙ্কের তিন ভাগ ভুল হইয়া ছিল, তাহাকে তিরস্কারপূর্ব্বক শ্লেটখানা ফিরাইয়া দিয়া প্রেমকুসুম ঐ মেয়ের উদ্দেশ্যে কহিলেন, "তোকে আবার এখনি কানের দুল কিনে দি'য় কি হবে রে মেয়ে? আবার তো দুদিন পরেই বিয়ের সময় দিতে হবে।"

মেয়ে জবাব দিল "হ্যাঁ, তা' বই কি! আর আপনার, আপনার বুঝি পরতে দোষ হয় না? আপনারও তো-"

"কি? বিয়ের সময় হবে? কে দেবে? দেবার যদি কেউ থাকতো তো কি এইখানে এই সব গোরু চরাতে আসি রে? এই সুধা! কতক্ষণ লাগে একটা ভাগ রাখতে? ভাবি চালাকি হচ্ছে!"

"এই যে হয়ে গেছে—প্রেমকুসুমদি'!"

"আচ্ছা প্রেমকুসুমদি'!--না বাপু, বল্‌বো না—আপনি হয় ত রাগ কর্‌বেন!"

"যা, যা, বলিস্‌নি, ডেঁপোর শেষ হয়েছে এই মেয়েগুলো! একদিন মিস্ বোসের কাছে না—এই, সব শীগ্‌গির ভাল ক'রে বোস, মিস্ বোস আস্‌ছেন যে! সুপ্রভা! চার সতেরং কত হয়? তবে যে এখানে চৌষট্টী লিখেছ বড়?"—

* * * * *

নীলিমা যতক্ষণ সেই ময়লা কাপড়ের দুর্গন্ধে আমোদিত বদ্ধ গাড়ীর

ভিতরে বসিয়া ছিল, সমানেই সে রাস্তার দিকে মুখ ফিরাইয়া থাকিয়া মুহুর্মুহুঃ চোখ মুছিয়াছে। তাহার নিতান্ত সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্যক্রমে সেই গোশকটের মধ্যে কোন বাঙ্গালীর মেয়ে উপস্থিত ছিল না, তাই তাহার এই অনাহূত অশ্রুজলের বেগ সামলাইয়া রাখার অদম্য চেষ্টা সত্বেও যে ছিটাফোঁটাটা জোর করিয়া বহির্মুখী হইতেছিল, সেটার জন্য আর কৈফিয়তের দায়ে পড়িতে হয় নাই। সারা পথই তার এমন করিয়া কাটিয়াছে, বিশেষতঃ যখন এলবার্ট স্কুলের গাড়ীখানা তাহার নূতন গাড়ীর পাশ দিয়া ইহাকে পশ্চাতে ফেলিয়া গম্‌গম্ শব্দে রাস্তা কাঁপাইয়া চলিয়া গেল, গাড়ীর মধ্য হইতে প্রতিদিনকার মতই মেয়েদের কল্‌কল্ করিয়া কথার শব্দ, হাসির স্রোতঃ বায়ুতরঙ্গে মিশিয়া নীলিমার কানের কাছে ভাসিয়া আসিল, মনোরমার তীক্ষ্ণ হাস্যের সহিত অনুকার ঝঙ্কারী-কলহাস্য একত্র মিশ্রিত হইয়া নীলিমার বুকের বাঁধাপর্দ্দায় যেন একটা ঘা দিয়াই কতকগুলা পুরাতন সুর বাজাইয়া তুলিল। কত সুদূর দিনের স্মৃতির ভাণ্ডার একসঙ্গে উলটিয়া পড়িল; আর যেন নিজেকে সামলান গেল না।—পাছে উহারা তাহাকে দেখিতে পায়, এই ভয়ে গাড়ীখানাকে দেখিয়াই সে তাহার সম্মুখের টানা ঝিলমিলি কয়টা নামাইয়া দিয়াছিল, আবার ভিতরের দিকে মুখ ফিরাইলেও তাহার এই অশ্রুপ্লাবিত মুখখানাকে আজিকার সম্পূর্ণ অপরিচিতা এই সকল সঙ্গিনীদের দেখাইতে হয়। নীলিমা বিপন্ন ভাবে অবশেষে নিজের দুই জানুর মধ্যে মুখ গুঁজিয়া ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া কাঁদিতে লাগিল। আজ ওই অত বড় গাড়ীখানার—অতগুলি মেয়ের মধ্যে শুধু তাহারই এতটুকু যায়গা খালি হইয়া গিয়াছে! না জানি তাহার কথা উহারা কত কি-ই বলাবলি করিতেছে? হয় ত তাহাকে আনিতে আজও গাড়ীখানা তাহাদের বড়ীর দরজার কাছে গিয়াছিল? কে না জানি কি বলিয়া

ফেরৎ দিল? ভাগ্যে এ সময় তাহার বাবা বাড়ী থাকেন না! কিন্তু আজ তো নীলিমা তাঁহাকে আসার সময় বাড়ীতেই দেখিয়া আসিয়াছিল? তবেই হইয়াছে! গাড়ী তো ঐ দিক দিয়াই আসিল? বাবা না জানি দাইকে কি কথাই বলিলেন? ঐ যে মেয়েরা অত কল্‌কল্ করিয়া কত কথাই বলাবলি করিতেছিল, অত হাসাহাসি করিতেছিল, সে তাহার, আর তাহার বাবার কথাই নহে ত?—

লজ্জায় নীলিমার চোখের জল শুষ্ক হইয়া গেল, এতক্ষণ স্কুলে পৌঁছিয়া দাই—তাহার সঙ্গে মেয়েরা পর্য্যন্ত যোগ দিয়া তাহাদের কথা কি ভাবেই বলাবলি হইতেছে? বাকি টাকা ফাঁকি দিয়া নীলিমা স্কুল ছাড়িয়া দিল শুনিয়া সুলোচনাদি' কত বড় ঘৃণার সঙ্গেই তাহার সম্বন্ধে বিচার করিবেন। আর ত দেখাও হইবে না যে, সে তাঁহাকে ভালরূপে বুঝাইয়া দিবে যে, এ কার্য্য সে একেবারেই নিজে ইচ্ছা করিয়া করে নাই। কিন্তু তাহাই বা কেমন করিয়া সম্ভব? সুলোচনাদি'র গম্ভীর মুখ দেখিলেই যে বড় ভয় করে, তাঁহার সঙ্গে কি সহজভাবে কথা কহা যায় যে, সে তাঁহাকে সুবিধা পাইলেও বুঝাইয়া দিবে যে, সে দোষী নয়? না না, সে কখনই হইবে না,—দোষী হইয়াই উহাদের নিকট হইতে তাহাকে চিরদিনের মত বিদায় লইতে হইল!—আবার চোখের জলে তাহার বুক ভাসিতে লাগিল এবং তাহার পারিপার্শ্বিকগণ তাহার এই মেঘ-বৃষ্টির ক্ষণিক খেলা অবাক্মুখে নিরীক্ষণ করিতে থাকিয়া বিশেষ কোন অর্থবোধ করিতে পারিল না। দুই এক জন পরস্পরকে নিম্নস্বরে প্রশ্ন করিয়াছিল, "ই-বাঙ্গালীন্ কাহাঁসে-আয়া?—ই-রোতা কাহে হ্যায়?" কিন্তু উভয় প্রশ্নেরই "কা' জানে।" এই উত্তর মাত্র পাওয়া গেল। অগত্যা তাহারা তাহাদের মধ্যে আকস্মিক সমাগতা এই নূতন ও অদ্ভুত জীবটি সম্বন্ধে অযথা কৌতূহলকে সম্পূর্ণরূপেই বিসর্জ্জন

দিয়া সম উর্দ্ধস্বরে এক যিশু-ভজন আরম্ভ করিয়া স্ফূর্ত্তিযুক্ত হইয়া চলিল :—

'—হে মেরা যেশু ! হে মেরা প্রভু ?
আইসিও মেরা লগ্‌গে,—ছোড়িও না কভু ।"

স্কুলের ঘর-বাড়ীর অবস্থা দেখিয়া অবসন্ন মন ঈষৎ একটুখানি সুস্থ হইলেও দেশী ও বিলাতী মেম এবং অবশিষ্ট বহুসংখ্যক যুনরী ন্যাকড়াপরা বেহারী হিন্দু ও মুসলমান মেয়েদের মাঝখানে দাঁড়াইয়া নীলিমার সমস্ত শরীর মন আবার যেন সঙ্কোচে গুটাইয়া এতটুকু হইয়া আসিল। ইহাদের মধ্যেই তাহাকে সারাদিন যাপন করিতে হইবে ?— ইহাদের কাছেই পড়া লইতে ও দিতে হইবে ? ওঃ, কোথায় মিস্ দে', প্রেমকুসুমদি,—এমন কি, সুলোচনাদি'র সেই গম্ভীর কঠিন মুখখানাও আজ তাহার মনের মধ্যে যেন মধুক্ষরণ করিতে লাগিল। অপ্রিয়ভাষিণী সাবিত্রী মনোরমাকে তাহার যেন আজ স্বর্গবাসিনী দেবকন্যার দল বলিয়াই মনে হইতে লাগিল। কি করিলে, ওগো, কি পুণ্য করিলে ইহারা তাহারা হইয়া যাইতে পারিত !

সঙ্গের দাই কি বলিয়া দিল, চিঠি দিল, শুনিয়া ও পাঠ করিয়া একজন মেম আসিয়া হতবুদ্ধি নীলিমাকে ডাকিয়া লইয়া গেলেন। একটি অপূর্ব্ব-দর্শন সুসজ্জিত কক্ষে আর এক জন স্থূলাঙ্গী রক্তবদনা মেম প্রকাণ্ড একটা চৌকিতে বসিয়া লেখাপড়া করিতেছিলেন ; নীলিমার সমভিব্যাহারিণী মেমটি তাঁহাকে ইংরাজীতে কি সব বলিতে তিনি একটা খাতা বাহির করিয়া নীলিমার দিকে ক্ষুদ্র ও কপিলবর্ণের চক্ষুর্দ্বয় ফিরাইয়া তাহাকে সম্বোধন করিলেন, "হে আমার প্রিয় বালিকা ! তোমারই নাম কি নীলিমা চাকারভারটী ?"

নীলিমা ঘাড় বাঁকাইয়া ইহার জবাব দিলে পুনঃ প্রশ্ন হইল—"তুমি এক্ষণে কত দিনের বৃদ্ধ হইয়াছ ?"

নীলিমা এ প্রশ্নের অর্থ ঠিক হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া নীরব থাকিলে মেম ঈষৎ অসহিষ্ণু হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "ও হায় হায় বেচারা বালিকা ! তুমি যদি তোমার নিজের মাতৃ-জিহ্বাকে (ইওর মাদার টং) ভুল কর, তবে আমি বড়ই দুঃখিত হইব।"

এইরূপে নীলিমাকে মিশন স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া লইয়া তাহাকে 'বেঙ্গলী ক্লাশে' পাঠাইয়া দেওয়া হইল। এই মিসনের সঙ্গে যে অনাথাশ্রম (অরফ্যানেজ) ছিল, তাহাতেই দুইটি বাঙ্গালীর মেয়ে এবং স্থানীয় দুই এক জন নিতান্ত দরিদ্রাবস্থ বাঙ্গালীর মেয়েকে ইহারা 'ভজন-সজন' দিয়া আনিয়াছে, ইহাদের লইয়া মিসেস্ গুঁই টিচারের অধীনে এক 'বেঙ্গলী ক্লাশ' খোলা হইয়াছিল। নীলিমা তাহারই অন্যতমা ছাত্রী হইয়া একটু-খানি দলপুষ্ট করিল।

সে যখন ক্লাশে ঢুকিল, তখন সেই ক্লাশের পড়া আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। মেয়েরা ভূমে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া চোখ মুদিয়া প্রার্থনা করিতেছিল ; কেবল মিসেস্ গুঁইই মধ্যে মধ্যে মিটিমিটি করিয়া চাহিয়া দেখিতেছিলেন যে, মেয়েরা কেহ চোখ চাহিতেছে কিনা। নীলিমাও উহাদের সঙ্গে যোগ দিতে আদিষ্ট হইয়া বসিয়া পড়িল এবং সকলের মুখে শুনিয়া শুনিয়া যতটা পারিল, আবৃত্তি করিল :—

"হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতঃ! তোমার নাম পবিত্র বলিয়া মান্য হউক,—তোমার ইচ্ছা আইসুক। আমাদের দিবসের আহার এই দিবসে আমাদিগকে দাও এবং আমাদের অপরাধ সকল ক্ষমা কর, যেমন আমরা নিজ অপরাধ সকল ক্ষমা করিয়া থাকি। আমেন।"

প্রার্থনা শেষ হইতেই মেয়েরাই সমস্বরে হুহু করিয়া গান ধরিয়া বসিল।

নীলিমা অজ্ঞতাবশতঃ হাঁ করিয়া তাহাদের মুখের দিকে চাহিয়াছিল, মিসেস গুঁই তাহার দিকে চাহিয়া গাহিবার ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন,—

"চেষ্টা করতে পারতে।"

নীলিমা যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিল।—

"বল না ভারত ঘুমাবে কত, পড়িয়া পাপের ঘোরে।
দেখ না চাহিয়ে নয়ন মেলিয়ে, ত্রাণ-ভানু ওই অ-দূরে,
হরি রাম কৃষ্ণ বিষ্ণু যাও ভুলে,
নোড়া-নুড়ি ফেল সাগরের জলে,
যদি পার চাহ ভবার্ণবকূলে, সার কর তবে যিশুরে।"

এই গানটি শেষ করিয়া পড়ার পালা। মিসেস গুঁই নিজের বাঙ্গালা বাইবেলখানি খুলিয়া আরম্ভ করিলেন—"ঈশ্বর বলেন শেষ যুগে এইরূপ হইবে।—আমি সমস্ত সংসারের উপর আমার আত্মার বর্ষণ করিব।"

সঙ্গে সঙ্গে সকল মেয়েই নিজ নিজ বাইবেলের পাতা আঙ্গুলে থুথু মাখিতে মাখিতে খুলিয়া ফেলিল ও সেইরূপ সমস্বরে আরম্ভ করিল:—

"আর তোমাদের পুত্রগণ ও তোমাদের কন্যাগণ প্রবচন বলিবে।

"আর তোমাদের যুবকরা দর্শন দেখিবে।

"আর তোমাদের প্রাচীনরা স্বপ্ন দেখিবে।

"হাঁ, আর সেই যুগে আমার দাসদের উপরে আর আমার দাসীদের উপরে আমার আত্মার বর্ষণ করিব ও তাহারা প্রবচন বলিবে।"

ছুটীর পূর্ব্বে পুনশ্চ প্রার্থনা ও সঙ্গীত হইয়া ছুটী হইল। এবারকার গানটি না গাহিয়া পাছে নীলিমার আত্মার অনন্ত দুর্গতিলাভ ঘটে, সেই ভয়ে উহা নীলিমাকে একখানি কাগজে লিখিয়া দেওয়া হইয়াছিল; তাহার আর ভুল করিবার সম্ভাবনা মাত্র ছিল না। সেই গানটি এইরূপ:—

"ওরে পাতকি !
ভবপারে যাবার উপায় কব্‌লি কি ?
ও তোর ব্রহ্মা সুরেন্দ্র, আব কৃষ্ণ মহেন্দ্র —
তারা আপন পাপেই হাবুডুবু তোমার উপায় কব্‌বে কি !"

ছুটী হইয়া গেলে মেয়েরা কপালে হাত ঠেকাইয়া "গুরুমা ! নমস্কার !" বলিয়া বিদায় লইতেছিল ; মিসেস গুঁই তাহাদেব ফিরিয়া ডাকিলেন ।

নীলিমার দিকে চাহিয়া বলিলেন—"এই মেয়েটা আজ কোথা থেকে এলো ? এই ! তোর নাম কি ?"

নীলিমা বিজড়িত স্বরে উত্তর কবিল—"শ্রীমতী নীলিমা চক্রবর্ত্তী।"

"হাঁ হাঁ, হিঁদুরা অর্থ না বুঝেই নাম রেখে বসে তা জানা আছে। তোর এমন ফরসা রং অথচ নাম রাখলো নীলিমা! – আমি হিঁদুবাড়ীতে এক জন ঘোর কালো রংয়ের মেয়ের বিদ্যুৎলতা নাম রাখতে শুনেছি। নীলিমা! আচ্ছা, আমি তোকে নেলী ব'লে ডাকবো—এই নেলি! তোরা পুতুলপূজো কবিস ত ?"

নীলিমাকে নতমুখ ও নীরব দেখিয়া বলিলেন—"খবরদাব ! আর কক্ষনও ও কাজ করিস্‌নে। নবকেব কথা শুনেছিস ? সেখানে দিনরাত আগুনে পোড়ায়।—পুতুলপূজো করলে তার অনন্ত নরক হয়, আর—নরকের যে কি যন্ত্রণা, সে সব আমি কাল তোকে ভাল ক'রে বুঝিয়ে দেব এখন ; আজ আর আমার সময় নাই! মনে কর, মৃত্যুব পর আর অনন্তকাল ধ'রে সেই বকম যন্ত্রণা ভোগ কবতে হবে। অথচ যিশুকে যদি ভজনা করিস্‌, শেষ বিচারের সময় যিশু তোকে কোলে ক'রে নেবেন। স্বর্গে অনন্ত সুখের অধিকারী হ'তে পারবি,—কেমন, পুতুল-পূজো ত্যাগ ক'রে এখন থেকে যিশুকে মান্‌বি ত ?"

অনন্ত নরকের ভয়েই হউক, আর মিসেস গুঁই-এর বিরাট বপু ও

তীক্ষ্ণ রসনার ভয়েই হউক, নীলিমা মাথা হেলাইয়া জানাইল যে, সে যিশুকেই মানিবে এবং এই কথাটা স্বীকার কবিবার সময় তাহার মাথার চুলেব গোড়া হইতে পায়ের আঙ্গুলের ডগা পর্য্যন্ত বারবার শিহরিয়া শিহরিয়া উঠিতে লাগিল. যেন কিসের একটা তাড়নায় সে এবার আর মিসেস গুঁইকে "নমস্কার" না বলিয়াই দ্রুতপদে সেখান হইতে বাহিব হইয়া আসিল।

অনন্ত সুখের প্রলোভনদাত্রী মিসেস গুঁইএর কদাকার ও প্রকাণ্ড মুখখানাকে হঠাৎ তাহাব সেই নরকের দ্বাবপালেরই বিকট মুখের মত ভীষণ বোধ হইল, সেই নরকেবই একটা প্রকাণ্ড হাঁ-করা কুমীরের মতই ভয়ানক বোধ হইতে লাগিল। তাহার হঠাৎ মনে হইল সেই মুখটা যেন তাহাকে গ্রাস কবিতে তাহার দিকে ভীষণ বেগে ছুটিয়া আসিতেছে। —সে যখন গাড়ীতে গিয়া উঠিল, মন্থগবতি গো-যান যখন চলিয়া চলিয়া মিসনবাড়ীব প্রশস্ত ময়দান ছাড়াইয়া রাস্তার বাহিব হইয়া পড়িল, তখন সে একটা অবরুদ্ধ নিশ্বাসকে জোর করিয়া যেন ঠেলিয়া ফেলিল; ভরসা কবিয়া যেন সেই অতুচ্চ প্রাচীরবেষ্টিত বিলুপ্ত চিহ্ন বাড়ীটার পানে চাহিতে সাহসী হইল কিন্তু তখনও তাহাব শরীরের ভিতরে ভিতরে কম্পনেব-বেগটা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয় নাই; তখনও তাহাব কপাল দিয়া শীতের দিনে টসটস করিয়া ঘাম ঝরিয়া পড়িতেছে। কেন, বা কি জন্য কিরূপ একটা অজ্ঞাত ভয়ের তাড়না সে খাইল, তাহা তাহাব নিকট বেশ সুস্পষ্ট নয়; কিন্তু তাহার জীবনে কিছু যেন একটা অভাবনীয়—একটা অজ্ঞাত অমঙ্গলের সূচনা আজ এইখানে দেখা দিয়াছে, বালিকা হইলেও ইহা তাহার সমস্ত অন্তরাত্মা যেন বুঝিতে পারিয়াই অমন করিয়া অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

তরুলতা শ্বশুরবাড়ী হইতে ফিরিয়া আসিয়া সকলের কাছে আদরে আপ্যায়িত হইল, কিন্তু যে ভাইটিকে সে বোধ করি এ পর্য্যন্ত সকলের অপেক্ষাই অধিকতর ভালবাসিয়াছিল, আজ শুধু তাহার নিকট হইতেই তাহার কোন স্বাগতসম্ভাষণ আসিল না। বিস্মিত হইয়া সুশীলের সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতে বিনতা ঠোঁট ফুলাইয়া জবাব দিল, "তুমি চ'লে গিয়ে পর্য্যন্ত দাদা না কি কোন দিনই বাড়ীর মধ্যে আসে! কারু সঙ্গে নাকি কথাই কয়! ছেলে ত দিন-রাত্তির অন্ধকার মুখ ক'রে বাইরের একটা ঘরে শুয়েই আছে। কেউ ডাকতে গেলে ভাল করে জবাবও দেয় না।"

তরু এই সংবাদে শঙ্কিতা হইয়া উঠিল "তার অসুখ করেনি ত? বাবা কি বলেন?"

বিনতা তাহার ফিতাবাঁধা বেণী দুলাইয়া জবাব দিল,—"বাবা কি বল্‌বেন,—বাবা কি কাউকে কোন দিন কিছু বলেন? ঠাকুমা ব্যস্ত হচ্ছিলেন, তাই বল্লেন, 'ওর শরীরটা হয়ত কিছু অসুস্থ আছে, আর তার চেয়েও তরুর জন্য মনটাই বোধ করি বেশী খারাপ, থাক, একটু রেষ্ট নিক।'—তাই এখন ছেলে শুয়ে শুয়ে 'রেষ্ট' নিচ্ছেন; একেবারে নট নড়ন চড়ন, নট কিচ্ছু!"

সেদিন যে দুঃসাহসিকতার পরিচয় প্রদান করিতে গিয়া অকস্মাৎ এই দুর্ঘটনা ঘটিয়া গেল, সুশীলের এত দিনকার সংযত ও সুভদ্র জীবন-যাত্রা প্রণালীর সহিত সেটার এতই অনৈক্য যে, সেই কাণ্ডটাতেই বোধ করি, তাহাকে একেবারে পাড়িয়া ফেলিত, যদি শুভেন্দু তাহার স্কন্ধে ভর

করিয়া তখনও তাহাকে পরিচালিত না করিত। বিপ্রদাস বাবুর বাগানের বাহিরে আসিয়া শুভেন্দু বুঝিতে পারিল, সুশীল নিঃশব্দে রোদন করিতেছে। শুভেন্দু তৎক্ষণাৎ খুব কাছে আসিয়া সুশীলের যে হাতটা কাছে পাইল, জোর করিয়া সেইটাকেই চাপিয়া ধরিয়া তীক্ষ্ণস্বরে ডাকিল, "সুশীল!"

সুশীল কথায় ইহার জবাব দিতে পারিল না, কিন্তু তৎক্ষণাৎ নিজের অপর হাত দিয়া কোঁচার কাপড় তুলিয়া চোখ মুছিয়া ফেলিল। শুভেন্দু কণ্ঠস্বরে তিরস্কার ভরিয়া তাহা সুশীলের উদ্দেশ্যে প্রয়োগ পূর্ব্বক কহিয়া উঠিল, "তুমি কচি ছেলের মতন কাঁদছো, সুশীল? তোমার বয়স চারবছর না চৌদ্দ বছর?"

এ প্রশ্নেরও সুশীল কোন উত্তর করিল না বটে, কিন্তু এই অবমাননাজনক প্রশ্নে তাহার অবসাদগ্রস্ত শিথিল শরীরে যে একটা উত্তেজনার মাদকতা তাহার শরীরের রক্তকে উষ্ণ করিয়া তুলিয়াছে, তাহা তাহার ধৃত হস্তের অকস্মাৎ কঠিন হইয়া যাওয়াতেই শুভেন্দু বুঝিতে পারিয়াছিল। তদ্ভিন্ন এই ছেলেটির চরিত্র-লিখা তাহার নিকট একান্তই সুস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে।

কিছুদূর দুই জনেই নীরবে পাশাপাশি চলিয়া আসিবার পর শুভেন্দু পুনরপি একটা আকস্মিক প্রশ্ন করিয়া বসিল, "এখন কি বাড়ী যাচ্ছো?"

সুশীল এই প্রশ্নে যেন একটুখানি হতবুদ্ধি হইয়া গেল, এই ভরা সন্ধ্যায় এবং এইমাত্র তাহাকে লইয়া যে ঘটনাটা ঘটিয়া গেল, তাহারও পরে তাহার মত চৌদ্দ বছরের ছেলেতে বাড়ী না গিয়া যে আর কোথায় যাইতে পারে, তেমন কথা তাহার মনের কোণেও কখন উঁকি দিয়া যায় নাই, তাই সে বিস্মিত ও বিপন্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "না হ'লে আর কোথায় যাব?"

শুভেন্দু এই প্রতিপ্রশ্ন শুনিয়া বাঘের মতন গর্জ্জিয়া উঠিল, "কোথায় যাবে? কুকুরের মতন চাবুক খেয়ে এসে কেঁদে ভাসিয়ে দিয়ে এখন বল্‌ছো, 'না হ'লে আর কোথায় যাব!' পিঠে ওই চাবুকের জ্বালা নিয়ে ভাত খেতে—ঘুমুতে পারবে? গলায় সে ভাত বাধবে না? চোখে ঘুম আস্‌বে?"

সুশীল আবার নীরব রহিল, কিন্তু অক্ষমতার অসহায় কোপে তাহার সর্ব্বশরীরে যে টান ধরিয়াছে, তাহা পরিষ্কার বুঝা গেল। শুভেন্দু উহার হাত ছাড়িয়া দিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল, বলিল "আমি তোমাদের মতন ভাল ছেলে নই, সুশীল! আমার ঐ অবিচারের চাবুকের জ্বালা বড়লোকের বাড়ীর পিঠে পায়েস জুড়িয়ে যাবে না—আমি এর প্রতিশোধ নিতে চাই।"

শুভেন্দু চলিতে আরম্ভ করিয়াই বুঝিল, সুশীলও তাহার সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছে। তৎক্ষণাৎ ঘাড় ফিরাইয়া কোমলকণ্ঠে সে বলিয়া উঠিল, "তুমিও এলে?"

"হাঁ" বলিয়া সুশীল হন হন করিয়া আগবাড়াইয়া চলিতে আরম্ভ করিল। মনে মনে হাসিয়া শুভেন্দু ডাকিল, "ওহে, শোন!"

"কি!" বলিয়া এবার সুশীলই ঘাড় ফিরাইল।

"রায়দীঘির পশ্চিম পাড়ে সেই সাদা বাড়ীখানা?"

"হুঁ"—

"বাড়ীর উত্তরধারের প্রকাণ্ড গোয়ালবাড়ীটা কখন লক্ষ্য ক'রে দেখেছ?"

"দেখেছি।"

"দিব্যি হবে।"

"কি?"

"তের বছরে এন্‌ট্রান্স পাশ করলেই যে মানুষ বিদ্বান্‌ হয় না, তুমি তার একটি একের নম্বরের উদাহরণ! চাবুকের জ্বালাব শোধ সেই প্রকাণ্ড চালাখানাব জ্বালায় ভোলবার বেশ সুবিধা হবে, তাই বলছিলেম, তোমার কি এতটুকুও বোঝবাব শক্তি নেই?"

সুশীলের মাথা হইতে পা অবধি সঘনে কাঁপিয়া উঠিল, "আগুন দেবে? সে যে মস্ত একটা অপবাধ!"

"আর দুটো পেয়াবা পাড়ার জন্য ভদ্রলোকেব ছেলেকে চাকব দিয়ে চাবুক খাওয়ানটা বুঝি বিশেষরূপ পুণ্যকার্য্য?"

"কিন্তু আগুন দিলে—"

শুভেন্দু হাত দিয়া পিছনে দেখাইয়া অনুচ্চস্বরে কহিল, "তুমি বাড়ী যাও"—বলিযা সম্মুখে অগ্রসর হইল। লোহা যেমন কবিয়া চুম্বকের আকর্ষণে আকৃষ্ট হয়, তেমন কবিয়াই সুশীলও নিঃশব্দে তাহাকে অনুসবণ কবিল।

গভীর বাত্রিতে ঘুম ভাঙ্গিয়া ভুবনবাবু তাঁহাব শয়নগৃহের মুক্ত বাতায়ন দিয়া, গ্রামেব দক্ষিণভাগে একটা অগ্নি-পর্ব্বত দেখিতে পাইলেন। মনটা তাঁহাব বড়ই বিমর্ষ হইয়া গেল, না জানি কে বা কাহারা বিপন্ন হইল! বিছানা হইতে উঠিয়া বাহিবে আসিলেন, দ্বার খুলিয়া বাবান্দায় পা দিবামাত্র তাঁহাব মনে হইল, কে যেন এক জন তৎক্ষণাৎ পাশেব ঘবেব দিকে সরিয়া গেল। সে ঘরটা সুশীলেব এবং উহার দ্বার যে ভিতর হইতে বন্ধ ও তাঁহার ঘরের দিকে মাত্র খোলা থাকে, সে কথা মুহূর্ত্তমধ্যে স্মরণ হইল না। মনে করিলেন, কোন পুরমহিলা আগুন দেখিতেছিলেন, তাঁহাকে দেখিয়া সরিয়া গিয়াছেন। নীচে নামিয়া আর দুই তিন জন চাকর ও দ্বারবান্‌কে যদি সম্ভব হয় ত বিপন্নদের কথঞ্চিৎ সাহায্যার্থ প্রেরণ করিয়া অনেকক্ষণ এদিক সেদিক ঘুরিয়া ফিরিয়া আবার সেইখানে

পা দিতেই আবার তেমনই করিয়া একটা ছায়ামূর্ত্তি সরিয়া গেল, এবং সঙ্গে সঙ্গেই একটা মর্ম্মান্তিক বেদনার চিহ্ন—অস্ফুট কান্নার শব্দ তাঁহার কানে আসিয়া পৌঁছিতে লাগিল। প্রথমে ইহাকেও লক্ষ্য না করিয়া তিনি নিজের ঘরে প্রবেশ করিলেন, কিন্তু কান্নার শব্দও যেন তাঁহাকে অনুসরণ করিয়া আরও স্পষ্ট হইয়া কানের কাছে আসিল, তখন বিস্মিত ও সন্দিগ্ধ হইয়া ভুবন বাবু তাঁহার ও সুশীলের ঘরের মধ্যবর্ত্তী দ্বারের নিকট আসিলেন। ঘর অন্ধকার, কিন্তু এবার বেশ স্পষ্টই বুঝা গেল যে, কান্নার শব্দ এই ঘরের মধ্য হইতেই সৃষ্ট হইতেছে বটে।

ভুবন বাবু ডাকিলেন, "সুশীল!"

উত্তর পাওয়া গেল না; কিন্তু কান্নার শব্দ বর্দ্ধিত হইল।

"সুশীল, আমার কাছে এস!"

ভুবন বাবু প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন, অনেকক্ষণ কাটিয়া গেলেও কেহ দেখা দিল না। এরূপ প্রায় হয় না। অতিমাত্র বিস্ময়ের মধ্যেই তাঁহার সহসা মনে হইল, হয় ত যে ছায়ামূর্ত্তিকে দুইবার অপসৃত হইতে দেখিয়াছিলেন, তাহা সুশীলেরই। ঐ অসহনীয় আগুন জ্বালার ভীষণ দৃশ্য চোখে দেখিয়া বালক ভয় পাইয়াছে, ব্যথিত হইয়াছে, আন্দাজে আন্দাজে কাছে আসিয়া বিছানার কাছে দাঁড়াইয়া "সুশু!" বলিয়া ডাকিতেই ভয় পাওয়া শিশুর মত সুশীল ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার বুকের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া আর্ত্তনাদের মত করিয়া উচ্চারণ করিল, "বাবা!"

"বাবা! ভয় কি? এস, আমার ঘরে এস;—আমি চাকরদের সব দেখতে পাঠিয়েছি—যদি কিছু করতে পারে, তার জন্যও তারা চেষ্টা করবে—"

"বাবুজি!"

"কে রে, রামপ্রসাদ ? কি খবর ?"

"আর খবর করতাবাবু ? রায় বাবুদেব গোশালা একদম রাখসে রাখ হোয়ে গেছে। সে জন্যে একটুক্ দুক্ষু নেই—চৌধুরী সাহেব বড় দুষমন আদমী আছে, লেকিন একঠো বাচ্ছী ইস্‌কে সাথ মব্ গিয়েছে, সেহি একঠো বড় আপশোষকা বাত হ্যায়।"

একটা সকরুণ আর্ত্তধ্বনির সহিত সুশীল সংজ্ঞাহারা হইয়া তাহার পিতার বুকের উপরেই ঢলিয়া পড়িল।

সেই হইতে সুশীলের এই রোগের উৎপত্তি, বাড়ীর লোক বলিতে লাগিল, একে ত তরুর জন্যে ওব মনে মোটেই সুখ ছিল না, তাহার উপর আবাব এই যে আগুন লাগা ও গোরু পুড়ে মরবার খবরটা আচমকা ঘুম ভেঙ্গেই দেখে শুনে তাহাব দযার শরীর একেবারে গ'লে পড়েছে রে!

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

ব্যাপারটা নেহাৎ মন্দ গড়াইল না। সে দিনের সেই নিশীথ অগ্নিকাণ্ডের গুপ্ত নায়করূপে যাহাকে অভিযুক্ত ও পুলিস-সোপর্দ্দ করা হইল, সে বিপ্রদাস চৌধুরীরই এক জন পূর্ব্ব-ভৃত্য। দিনচারেক পূর্ব্বে বাবুর একটা রূপাবাঁধান ছড়ি চুরি যাওয়ায় ইহার প্রতি সন্দেহে ইহাকে থামে বাঁধিয়া প্রহার করা হয় এবং ইহার পর সেই অপহৃত ছড়িটি আর এক জন ভৃত্যের নিকট হইতে পাওয়া যাওয়ায় তাহাকে পুলিসে চালান দেওয়া হয়। নিরপরাধে প্রহৃত ও অবমানিত গোপাল ছাড়া পাইবামাত্র তীরবেগে বাড়ীর বাহিরে গিয়া দাঁড়াইল ও চীৎকার শব্দে দশেধর্ম্মে দোহাই পাড়িয়া দেবতা মানুষকে সাক্ষী রাখিয়া শীঘ্রই এই নৃশংস অবিচারের শোধ লইবার প্রতিজ্ঞা করিল। পরে দ্বারবানরা তাহাকে আর একবার অর্দ্ধচন্দ্র দিতে অনিচ্ছুক ছিল না; কিন্তু ততক্ষণে সে পথে পড়িয়া দৌড় দিয়াছে। সাক্ষ্যের দ্বারা ইহাও প্রমাণ হইয়া গেল যে, কয়দিন ধরিয়াই তাহাকে চৌধুরীবাড়ীর আশেপাশে সন্ধ্যার পর চুপি চুপি ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখা গিয়াছে। আগুন লাগাইবার সময়টায় সে অবশ্য সাক্ষী রাখিয়া লাগায় নাই, তবে সব চেয়ে নিকটবর্ত্তী দোকানদার সাক্ষী দিল যে, এক ডিবা কেরোসিন তৈল ও একটা দিয়াশলাই এই উদ্দেশ্যেই সে তাহার দোকান হইতে রাত্রি নয়টার সময় কিনিয়া ওই দিকেই গিয়াছিল।

গোপাল এ সব কথার কিছুই অস্বীকার করিল না, শুধু তাহার উপর প্রযুক্ত এই ভীষণ অপরাধটাকেই সে অস্বীকার করিল। অনেক পীড়া-

পীড়িতে সে আদালতে বলিল, "বাগের মাথায় শোধ লইবার কথা বলিয়া আসিলেও বাবুর উপর যে তার শোধ লইবার উপায় নাই, তাহা সে এক দিনের মধ্যেই বুঝিয়াছিল। আর শুধু সেই জন্যই দেশে না গিয়া বাবুর বাড়ীর আনাচে কানাচে ঘুরিয়া মরিতেছিল।" কারণ জিজ্ঞাসায় অবনত-মুখে উত্তর দিল, "বাবুর শরীরে দয়া ধর্ম্ম কখনই নেই ; চাকরদের তিনি কখনও মানুষ মনে করেন না। 'শালা' 'ব্যাটা' ভিন্ন কোন দিন নাম ধ'রেও কারুকে তিনি ডাকতে পারলেন না,—অথচ তাঁ'র পোঁষা কুকুর-দের আদরের নাম 'টেবি' 'লুলু'। কাশ্মীরি বেরালটাকে আদর ক'রে 'গারল্যাণ্ড' ব'লে ডাকা হয়! লালমাছ, নীলমাছ, পাখী, পায়রা, হরিণ, খরগোসের পিছনেই তিন তিনটে চাকর। তাঁ'র বিলিতি কুকুরে রোজ তিন সের ক'রে মাংস খায়, কিন্তু চাকরদের বেলায় মোটা চালের ভাতের উপর সবদিন একটু শাকচচ্চড়িরও অভাব ঘটিয়া যায়—অথচ সেই ভাতের গরাস কয়টা তুলিবার মধ্যেও ফাই-ফরমাসের জন্য ডাকপড়াপড়ি বন্ধ হয় না। যাক্, তার জন্য আমি কিছু বলি না ; সে আমাদের বরাতের দোষ, আর জন্মে বাবুর কাছে ধার নিয়ে শোধ দিই নি, তারই জন্যে এবারে তার শোধ মিটিয়ে দিতে হচ্ছে। আর আর জন্মে কি পুণ্যকায ক'রে ফেলেছিলেন, তাই এ জন্মে উনি দশ জনের ওপোর এই হুকুমজারী ক'রে বেড়াচ্ছেন, এর জন্যে কাঁদাকাটি ক'রে আর হবে কি? আমি শুধু একটী বার দিদিমণির মুখটী দেখে যাবার জন্যে ক'দিন ধ'রে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। অমন দানব বাপের যে তেমন দেবতার মতন মেয়ে কোথা হ'তে এলো, সে আমরা তো সবাই ভেবে কূল পাইনে!"

গোপালের এ সব ছেঁদো কথা আদালতের সূক্ষ্ম বিচারে টিকিল না, যেহেতু গরীবের মত ছোটলোক তো আর সংসারে দ্বিতীয় নাই—উহারা যখন বড়মানুষের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, তখন নিশ্চিত জানা কথাই যে,

তাহার ভিতর পনের আনা সাড়ে তিন পাই ঈর্ষা ও বিদ্বেষ মিশ্রিত আছে। উহারা যদি মনিবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া কখন জয়লাভ করে, তবে সে দৃষ্টান্ত বড়ই মন্দ হইয়া দাঁড়ায়। সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় উহা ভৃত্য-জাতীয়ের শীতল শোণিতকে উষ্ণ করিয়া তুলে ও উহাদের স্পর্দ্ধা বাড়ায়। অতএব এ ক্ষেত্রে সবারই খুব সামলান দরকার বলিয়া নিতান্ত নিরপেক্ষ ন্যায়বান্ বিচারক ব্যতীত প্রায়ই ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষিত হয় না। তবে এমনটাও ঘটিয়া থাকে যে, যদি কালেক্টার "সাহেব" আবার কোন কারণে সেই মনিবটির উপর বিরূপ থাকেন, তবে সে ক্ষেত্রে ভৃত্যটি দোষী হইলেও জয়লাভ করে। এখানে তেমন ধারাটা নাকি ঘটে নাই; এবং শিক্ষিত উকিলের বক্তৃতায় বেশ বাঁধুনীও ছিল; সাক্ষীরাও খুব পাকা এবং হয়ত বা হাকিমটিও একটু কাঁচা। গৃহদাহকারী গোপালের বিরুদ্ধে রায় বাহির হইল।

দণ্ডাদেশ শুনিয়া গোপাল সাশ্রুনেত্রে বারেক উর্দ্ধে চাহিয়া বলিয়া উঠিল—"হা ভগবান!" তাহার পর নিজের উদ্গত অশ্রু সংবরণ করিতে করিতে সজলগাঢ়স্বরে আত্মগতই কহিল, "দিদিমণি রে! আমার এই সাজার কথা শুনে তুই কত যে কাঁদবি, ভাই! তুই ছুটে এসে আমার উপর চেপে না পড়লে সে দিন বাবুর হুকুমে আমায় তো মাধোসিং ব্যাটা মেরেই ফেলেছিল! আহা, তোর কচি মুখটি আর একটিবার দেখা হলো না রে!" বলিতে বলিতে প্রৌঢ় হু-হু করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। কাঁদিতে কাঁদিতে হাকিমের দিকে ফিরিয়া যোড়হাতে বলিল—"ধর্ম্মাবতার! আমার বাবুর মস্ত লোকসান হয়েছে, শুনেছি, মা-ভগবতীর হত্যাকাণ্ডও নাকি হয়ে গেছে। তা'র জন্যে আমি না-হয় শাস্তিই পাচ্ছি, তা মিনি অপরাধে হলেও আমার তেমন দুঃখু ছিল না, কিন্তু হুজুর! আমার দিদিমণি যদি সত্যি ক'রে মনে করে যে, তাঁ'র বাবার উপর

শোধ তোলবার জন্যে—আমি তাঁদের ভাত খেয়ে মানুষ,—আমি এত বড় লোকসান ঘটালাম, একটা অবোলা জীবের হত্যে করলাম; এই দুঃখুই যে আমার জেলখানায় মরণ ঘটলেও ঘুচবে না! এ দাগ আমার বুকে শেষ পর্য্যন্ত থেকে গেল।"

উকিলের দিকে চাহিয়া বলিল, "বাবু! এখন ত আপনার কাজ শেষ হয়ে গেছে; এখন একবার কৃপা ক'রে আমার বাবুর বাড়ী যেয়ে আমার দিদিমণিকে ডেকে বলে যাবেন যে' ত'ার গোপালদাদা, সত্যি তাঁর গোয়ালঘর পোড়ায়নি, তা'র ললাটের লেখনই এই কাজ করেছে, সে নয়। বাবু! আমার বউ নেই, ছেলে নেই, মে'য় নেই, কেউ নেই—আমার লেগে চোখের জল ফেল্‌তে শুধু ঐ একটি জনই আছে।—আহা রে! 'গোপালদাদা' বল্‌তে বাছা যে আমার অজ্ঞান হয়ে যায়। রাগের মাথায় তিড়বিড়িয়ে বেরিয়ে এনু—বাছা আমার অঝর ঝরে কে'দে কি ভাসিয়ে দিলে! যেমুন দেবতার চোখে জল ফেলান—তার ফল ফল্‌বে না?—" বলিতে বলিতে এবার সে নিজেই কাঠগড়ার মধ্যে বসিয়া পড়িয়া হাঁটুর মধ্যে মুখ লুকাইয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

আদালতের লোকেদের মধ্যে কেহ কেহ রুমালে চোখ মুছিলেন, কেহ বা মৃদু হাসিয়া অপরকে বলিলেন, "একটীং জানে মন্দ না!"—কেহ বলিলেন, "বেটা দাগী!"

ভুবন বাবুর বাড়ীতেও খবরটা প্রচার হইল। এখনকার দুর্ব্বিনীত ভৃত্যজাতীয় লোকেদের উপর প্রায় কেহই সন্তুষ্ট নহে। তাহারা এখন কথায় কথায় মনিবের উপর চোখ রাঙ্গায়; মাহিনা বাড়াইয়া না দিলে চাকরী ছাড়িয়া দেয়; ভাল খাওয়া-পরার দাবী তুলে; আবার অনেকেই গাঁজা, গুলী সিগারেট, বিড়ি, পশ্চিমারা ইহার উপর তাড়ি ও সিদ্ধিতে চুর হইয়া বাহিরে বাহিরে ঘুরিতেই ভালবাসে। মেজাজেরও ঠিক থাকে

না। মনিব চাহেন সস্তায় সুচরিত্র ও বিনীত ভৃত্য। ভৃত্য—কালধর্ম্মে বিনীত ত নহেই—সচ্চরিত্রও নহে, অধিকন্তু মনিব-পুত্রের অনুকরণে নবাবানায় চুলছাঁটা, সিগারেট টানা, পাতলা বিলাতি ফিতাপেড়ে সাড়ীটি পরা, লম্বা ঝুলের পাঞ্জাবী গায় দিবার সখটুকু পুরাদস্তুরই তাহাদের শিক্ষা হইয়াছে। তা হইবেই বা না কেন? যখনকার বাবুরা খাটো ধুতী, হাতকাটা বেনিয়ান ও ঠন্‌ঠনের চটি পরিত, তখনকার ভৃত্যদেরও সেই খাটো ধুতী ও বাহিরের জন্য একটা মেরজাই-ই যথেষ্ট ছিল। তোমরা যদি 'ঘোড়া-রোগে' শিক্ষিত হইয়াও মরিতে পার, উহারাই বা না চয়া থাকে কিসের জোরে? তোমাদের স্কুলের ছেলে "হাওয়াগাড়ী" মার্কা সিগারেট পকেটে লইয়া বেড়ায়, ওদেরও সেই বয়সের ছেলেরা তোমাদের ঘরে চাকরী করিতে আসিয়া অমন সুদৃষ্টান্তটা গ্রহণ করিবে না?

কিন্তু মানুষ নিজেদের দোষ দেখে না। তাই মনিব যখন কোপ্তা কোর্ম্মা দিয়া লুচি খাইয়া যাওয়ার পর বামুনঠাকুরের কৃপায় মোটাচালের ধরাগন্ধ ভাতের সঙ্গে শাকচচ্চড়ি ও ডালের ঝোলের অভাবে তোমার চাকর তোমার উপর চোখ রাঙ্গা করিয়া আসিল, তুমি অমনিই তাহার সেই রাঙ্গা চোখের ছবিখানি দেখিয়াই তাহার স্পর্দ্ধার পরিমাপ করিতে বসিলে। নিজের পূর্ণ উদরের চাপে শরীর হাঁসফাঁস করিতেছে, কাযেই চোখ যে তাহার কেনই রাঙ্গা হইল, সে কথাটি তো ভাবিলে না। ধমক দিয়া বলিলে, "এমন এক আধ দিন হয়।" সে ইহার জবাব দিল, "এমন বাড়ী কায করিতে পারিব না, যেখানে খাওয়ার এমন দুর্দ্দশা।" সংসারের সমস্ত বিশৃঙ্খল করিয়া রাখিয়া সে চলিয়া গেল। কাযেই কথা রটিল যে, ছোটলোকগুলার এখন বড়ই স্পর্দ্ধা হইয়াছে! কিন্তু কেন যে হইল, কাহাদের সহানুভূতিহীনতায়, হীনতার দৃষ্টান্তে হইল—সেইটুকু শুধু কেহ খুঁজিয়া দেখে না, ত্রুটী সেইখানেই।

গোপালের মত ভয়ঙ্কর গোঁয়ার-গোবিন্দ ছোটলোকটার এমন কঠিন দণ্ডাদেশে—তাই যাহাদের সর্ব্বদা চাকর রাখিয়া ঘর করিতে হয়, তাহারা অত্যন্তই উৎসাহিত হইয়া উঠিয়া সাগ্রহে বড় বড় বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করিল এবং বলিল, "এ না হইলে সংসারে টিকিয়া থাকাই ত মহা দায় হইয়াছিল! মনিবের জিনিষ খোয়া গেলে একটু কি করিয়াছে, না করিয়াছে—অমনি জ্বালাও তার ঘর, পোড়াও তা'র গোরু!—কি ভাগ্য যে তারও মুখে আগুণ ধরাইয়া দেয় নাই।"

ইতঃপূর্ব্বে এই সকল লোকই অতঃপর আর চাকর রাখিয়া ঘর করা দায় হইবে বলিয়া নিতান্ত হতাশার সহিত আক্ষেপ করিতেছিলেন।

শুভেন্দু খবরটা লইয়া নিতান্ত নিরপেক্ষভাবেই সুশীলের ঘরে ঢুকিয়াছিল, সেখানে তরু ও বীণাকে উপস্থিত দেখিয়া সে বাহির হইয়া যায় দেখিয়া বীণাই তাহাকে ডাকিয়া বলিল, "আসুন না শুভু'দা, চ'লে যাচ্চেন কেন?"

শুভেন্দুর সুশ্রী চেহারা ও নানাপ্রকার উদ্ভাবনী শক্তি ও সাহস তাহাকে বাড়ীশুদ্ধ সমুদয় ছেলেমেয়ের কাছেই নিতান্ত ঘরের লোক করিয়া তুলিয়াছিল, বীণার আহ্বানে শুভেন্দু আসিয়া তাহাদের একপাশে বিছানা চাপিয়া বসিয়া পড়িল। সুশীল বলিল, "দিদি আমায় একটা গোলোকধাম খেলার ছক তৈরী ক'রে দিয়েছে, খেল্‌বে শুভেন্দু?"

শুভেন্দু তাহার মুখের দিকে চাহিয়া ঈষৎ একটু হাসিয়া কহিল, "এখনও তুমি গোলোকধাম খেল নাকি?"

শুভেন্দুর সেই হাসি ও কথার সুরে সুশীলের কানের গোড়া অবধি লাল হইয়া উঠিল। বিনতা তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "ঠিক বলেছেন, শুভু'দা! দাদা এখনও এম্‌নি সব ছেলে মানুষী জিনিষ ভালবাসে যে, সে দেখলে আমার ভারী হাসি পায়। আমিও ওকে বলি যে, খেল্‌তে হয়

ত তাস দিয়ে গ্রাবু খেল, না হয় রিভার্সী খেল, না হয় ড্রাফ্‌ট খেল। তা নয় ছেলে খেল্‌বেন ত গোলামচোর, নৈলে গোলকধাম। আর দিদিরও ঠিক্ কি ওর মতন পছন্দ!”

সুশীল, তরু নিজেদের বিকৃত রুচির লজ্জায় বিব্রত হইয়া তৎক্ষণাৎ উহাদের সহিত সায় দিয়া গিয়া বলিল, “আচ্ছা খেল, তোমাদের যে রকম ভাল লাগে, তাই খেল।”

খেলা আরম্ভ হইল। শুভেন্দুব কাছে এক পড়াশুনা ছাড়া কোন কার্যেই কাহারও জয়েব আশা নাই; একবার, দুইবাব, তিনবার বার-বারই তাহার স্থান সর্ব্বপ্রথমে। কিন্তু এতবার জয়ী হইয়াও তাহার মন সেই জয়ের আনন্দেব প্রতি নাই, সে বসিয়া পর্য্যন্তই সুশীলের নিরুদ্যম, রক্তহীন, ও ম্লান মুখের প্রতি তীক্ষ্ণচক্ষুতে চাহিতেছিল. তাস লইতে গিয়া কত সময় তাহার হাত কাঁপিয়া যাইতেছে. উহা ও তাহার অজ্ঞাত ছিল না। মনে মনে বিরক্ত হইয়া চোক তাকাইয়া উহার উদ্দেশ্যে পাঁচশোবার “ভীরু” “অকর্ম্মণ্য” বলিয়া গালি পাড়িলেও কয় দিনের ভিতরে উহার শরীর-মনের অবস্থা দেখিয়া বোধ করি, তাহার মনে একটু অনু কম্পাও বোধ হইতেছিল। তাই তাহাকে মঙ্গল সংবাদে সুস্থ করিতে —নিশ্চিন্ত করিতে ইচ্ছুক হইয়া কথায় কথায় বলিয়া ফেলিল, “গোপালের যে বিচার শেষ হয়ে গেল।—”

সে বার বিন্তির খেলা চলিতেছিল; কিন্তু আগ্রহাতিশয্যে তাহার সকল সাবধানতা বিস্মৃত হইয়া গিয়া বিনতা টপ্ করিয়া ইস্কাবনের টেক্কা-খানাকে ‘পাশ’ গুঁজিয়া দিয়া উগ্র কৌতূহলে উচ্চ করিয়া প্রশ্ন করিল, “কি হোলো, শুভু’দা! কি দণ্ড তার হলো?—উঃ, লোকটা কি ভয়ানক! তার ফাঁসী হলেও দোষ হয় না।”

সুশীলের হাতখানা কাঁপিয়া হাতের তাস ক’খানা ধপ করিয়া মাটীতে

পড়িয়া গেল। তার মুখখানা একবার ভয়ানক লাল হইয়া উঠিল, ঠিক যেন মনে হইল, তাহার সমস্ত শরীরের যেখানে যেখানে যতটা রক্ত জমা করা ছিল, সে সবই যেন একটানে বোঁ করিয়া মুখে ও মাথায় উঠিয়া আসিয়াছে। শুভেন্দুর মুখের দিকে সে যখন উদ্দাম ব্যাকুলতায় অধীর দৃষ্টিপাত করিল, সেই অস্বাভাবিক রাঙ্গামুখে, আশ্চর্য্য উজ্জ্বল চোখ দুইটা যেন দুইটা ইলেক্ট্রিক ল্যাম্পের মত ভয়ানক রকম জ্বলিতেছিল। ঠোঁট তাহার নড়িতেছিল, কিন্তু তাহা শুধু উত্তেজনার জন্য, কি কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসার জন্যই কিছু বুঝা গেল না। শুভেন্দু বারেকমাত্র তাহার মুখে তীব্রকটাক্ষ করিয়াই বিনতার প্রশ্নের উত্তরে শান্ত উদাস কণ্ঠে জবাব দিল—"বেশী কিছু হয়নি.. .... চার বৎসর সপরিশ্রম জেল খাটতে হবে মাত্র।"

আবার সেই রাত্রির মতই আর একটা অব্যক্ত যন্ত্রণাধ্বনি করিয়া সুশীল অচেতন হইয়া পড়িল।

গভীর রাত্রি। পল্লীগ্রামের সুপ্তিমগ্ন মধ্যরাত্রি। শুধু মানবই নহে, যেন তাহাদের সহিত সমস্ত বিশ্বচরাচর, দেব, দানব, যক্ষ, রক্ষ, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ সকলেই শান্তিপ্রদায়িনী নিদ্রাদেবীর সুশীতল অঙ্কাশ্রয়ে বিশ্রাম করিতেছে। একমাত্র ঝিল্লীরব ভিন্ন কোথাও কোন শব্দই নাই। যেন মহাসাধনাক্ষেত্রে কোন যোগমগ্ন মহাযোগী সমাধিমগ্ন হইয়া আছেন; আর তাঁহার সর্ব্বসমাহিতচিত্তে কেবলমাত্র অনাদি প্রণবের একক ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হইতেছে এবং সেই ধ্বনি শুধু জানাইতে চাহিতেছে, সোঽহং—সোঽহং—সোঽহং! মানবের চিরশত্রু অহংকে সোঽহংএ মিলাইয়া দিবার সংযোজক কাল এমন আর দ্বিতীয় নাই। কিন্তু হায়, এ মহান্ সুযোগ যে মানুষের সারাজীবন ব্যাপিয়া কত সহস্র সহস্রবারই ব্যর্থ হইয়া ফিরিয়া যাইতেছে, তাহার যে কোন লেখা-

বোঝাই করা যায় না! কি যে নিরেট পাষাণ দিয়াই বিধাতা মানুষকে সৃষ্টি করিয়া পাঠাইয়াছেন; এর কাছে যে সমস্ত মহা মহাযোগই ব্যর্থ হইয়া ফিরিয়া যায়, তাহার যে সমুদয়ই দুর্য্যোগ, সুযোগ সে লইবে কোথা হইতে? ভুবন বাবুর পত্নীবিয়োগের পর হইতেই রাত্রির নিদ্রাটা তেমন গাঢ় হইত না; ভোরের দিকে তিনি বরাবরই একটু পড়াশুনা করিতেন। চণ্ডী ও গীতাপাঠও হয় ত হইত। এ সময়ে কেহ তাঁহার কাছে থাকা তিনি পছন্দ করিতেন না বলিয়া ছেলেরা তাঁহার কাছে শয়ন করিত না। আজ হঠাৎ এই মধ্যরাত্রিতে ঘুম ভাঙ্গিয়া তিনি আবার সে দিনের মত সেই চাপাকান্না শুনিতে পাইলেন। কান্নার শব্দ সুশীলের শয়নকক্ষ হইতেই আসিতেছে। উঠিয়া আসিয়া নিঃশব্দে সুশীলের বিছানার কাছে আসিলেন। শুনিতে পাইলেন, সুশীল কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতেছে, "কি হবে! আমি কি করবো? গোপালকে যে জেলে যেতে হচ্ছে—এখন আমি কি করি! বাবাকে কি ক'রে সব ব'ল?"

ভুবন বাবুর মনে হইল, কে যেন একগাছা চাবুকের বাড়ি তাঁহার মুখের উপর সজোরে আঘাত করিয়াছে। তিনি যেন সহসা টলিয়া পড়িতে গেলেন। তাহার পরক্ষণেই আপনার এই অতর্কিত ও অভাবনীয় গুরু আঘাতের যন্ত্রণা কথঞ্চিৎ সহনীয় করিয়া লইয়া সুগভীর দীর্ঘশ্বাসের মধ্যে কথা কহিলেন—"সুশীল! গোপাল কি তোমাদের সঙ্গেও ছিল না কি?"

সুশীল অকস্মাৎ এমনভাবে সম্বোধিত হওয়ায় ভয়ানক রকম চমকাইয়া উঠিয়াছিল; তাহার পর তাহার মনে সেই পরিমাণে বিস্ময়েরও সঞ্চার হইয়া গেল, বাবা কি তবে সবই জানেন? সে উঠিয়া বসিয়া অশ্রুভারাতুর ব্যাকুল উদ্‌ভ্রান্তস্বরে বলিল "না, কিচ্ছুই জানে না সে, তাকে বাঁচান—" বলিয়াই আবার কাঁদিয়া অধীর হইয়া বিছানার মধ্যে লুটাইয়া

পড়িল। এই ভয়ানক ব্যাপারটার জানাজানি ব্যাপারে তাহার জন্য যত বড় প্রচণ্ড লজ্জাই জমা করা থাক না কেন, তবু সে যে লুকোচুরির হস্ত হইতে বাঁচিয়া গিয়া তাহার বক্ষের মধ্যের অবরুদ্ধ তাপের প্রভাবে ফাটিয়া পড়া হইতে মুক্তিলাভ করিল, আপাততঃ সেই-ই তাহার পক্ষে যথেষ্ট!

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

চৌধুরী-পুকুরের তক্‌তকে নীলজলে তখনও সূর্য্যকরের সোণার গুঁড়া ঝিলিক্ মারে নাই; তাহার অগ্নিকোণে কহ্লারবনে ঘোর রক্ত-বর্ণের কহ্লার ফুলগুলা সবেমাত্র পাপ্‌ড়ী খোলা সুরু করিয়াছে; তাহার নিশীথ-বিশ্রামের গায়ের চাদর কমলপত্রে বিস্তৃত রহিয়াছে, মানব হস্ত-স্পর্শে তাহা এখনও তীরদেশ হইতে অপসৃত হইয়া যায় নাই। তাহার মৎসকুল এখনও বকের দৌরাত্ম্যে তীরসংলগ্ন খাদ্যান্বেষণ ত্যাগ করিয়া গভীর জলে আত্মরক্ষার জন্য পলায়নপর নহে,—দীঘির কূলে দীর্ঘ সোপানশ্রেণী, উপরে প্রকাণ্ড চত্বর, পশ্চাতে পুরাতন ছাঁদের সুবৃহৎ অট্টালিকা—ইহাই উমাপতি চৌধুরির নির্ম্মিত—এক্ষণে বিপ্রদাস চৌধুরীর আবাসবাটী। বাটীর প্রবেশদ্বার এখনও খোলা হয় নাই, তবে ভিতর দ্বারবান্‌জীর নাগরাজুতার শব্দ শুনিতে পাওয়া গিয়াছে—খুব সম্ভব এইবার ফটক খোলা হইবে। বাড়ীর উত্তরে বিশাল একটা ভস্মস্তূপ গত দুর্ঘটনার সাক্ষ্যস্বরূপে অনেকখানি স্থান অধিকার করিয়া পড়িয়া রহিয়াছে। সেই দিকে দৃষ্টি ফিরাইতেই ভুবন রায়ের বুকের মধ্যে লজ্জার আঘাত অসহনীয় বেগে পতিত হইল।

ভুবন বাবু কিছুক্ষণ এ-দিক ও-দিক ঘুরিয়া বেড়াইলেন, মন অস্থির, সময়ক্ষেপ সহ্য করা কঠিন বোধ হইল। কিছু পরে ফটক খোলার শব্দে সম্মুখে আসিয়া, দ্বারবান্ মাধো সিংএর হাতে একটা চিঠি দিয়া, বাবুর ঘুম ভাঙ্গিবামাত্র তাঁহাকে খবর দিতে বলিয়া, আবার সেখান হইতে চলিয়া আসিলেন। ইহাকে দেখিয়া নিরপরাধ গোপালের কথা আবার বেশী হইয়াই তাঁহার মনে পড়িয়া গেল।

বিপ্রদাস বাবু সচরাচর অধিকাংশ বাবুজাতীয় জীবেরই ন্যায় বেলায় শয্যাত্যাগ করেন এবং তাহার পর হাতমুখ ধুইয়া, চা খাইয়া, কেশ বেশ সারিয়া বৈঠকখানায় আসিতে তাঁহার ঐ শ্রেণীর লোকদেরই মত প্রায় সমান সময় লাগে। সেটা অন্ততঃ ঘণ্টা দেড়েক বা তদূর্দ্ধ। আজ এমন নিতান্ত অসময়ে ও অপ্রত্যাশিতভাবে তাঁহার সামান্য মাত্র পূর্ব্ব পরিচিত ভুবন রায়ের আগমন সংবাদে ও পত্রে বিশেষ কোন প্রয়োজনীয় ও গোপনীয় কার্য্যের উল্লেখ থাকায় তাঁহাকে এক ঘণ্টার মধ্যে সকল কার্য সমাধা করিয়া লইতে হইল। বিপ্রদাস বাবু জানিতেন, এই লোকটি বিলক্ষণ ধনী এবং সর্ব্বদা দেশে না থাকা প্রযুক্ত ইহার সহিত তাঁহার বৈষয়িক বিবাদেরও যে কোন যোগাযোগ নাই, তাহাও তিনি জ্ঞাত ছিলেন। আর তার উপর নিজে পয়সার লোক হইলে লোক একটু পয়সাওয়ালা লোকেদেরই বেশী পছন্দ করিয়া থাকে; বিপ্রদাস বাবুই বা তা'না করিবেন কেন?

সাক্ষাৎ যে এমনভাবে হইবে, তাঁহার তাহার বিন্দুমাত্রও ধারণা ছিল না, ভুবন বাবু দুই হাজার টাকার দুই কেতা নোট আগে ভাগে খেসারত ধরিয়া দিয়া তাহার পর সমুদয় ইতিহাসটাই জানাইয়াছিলেন কি না, তাই তাঁহার মূর্ত্তি অনেকখানিই বদল করিয়া শ্রোতার কানের ভিতর দিয়া মরমে পৌঁছিতে লাগিল এবং পাঁচশো টাকার বদলে দেড় হাজার টাকা উপরি লাভ হওয়ায়, ক্ষতিটাকে তাঁহার এক্ষণে আর তেমন লোকসান বলিয়া মনে হইল না। বরং দুই পার্শ্বের বিরাট গুম্ফকে ঠেলিয়া ফেলিয়া অর্দ্ধাবৃত সূক্ষ্ম ঠোঁটের আগায় একটুখানি হাসি পর্য্যন্ত ফুটাইয়া তুলিয়া তিনি নোট দুইখানি পাঞ্জাবী জামার পকেটে ফেলিতে ফেলিতে সংক্ষেপে কহিয়া উঠিলেন, "কি, ছেলেমানুষী!"

ভুবন বাবুর উচ্চ মস্তক আজ লুণ্ঠিত, তাঁহার বড় উন্নত আদর্শই চূর্ণ

হইতে বসিয়াছে, কিন্তু পুত্রের আত্মাপরাধ স্বীকারোক্তিতেই তাঁহার সে পিতৃ হৃদয়ে দুঃখের মধ্যেও সুপ্রচুর সুখের অভাব ছিল না। শীঘ্রই তিনি বিদায় লইয়া উঠিলেন, এখনই তাঁহাকে ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে জিলায় যাইতে হইবে। বিদায়কালে পুনশ্চ বিনীত মিষ্টবাক্যে কহিলেন, "বড় অন্যায় হয়ে গেছে; বেশী আর কি আপনাকে বলবো? মন থেকেই অপরাধীদের যতটুকু পারবেন ক্ষমা করবেন।"

বিপ্রদাস বাবু গম্ভীর হইয়া উত্তর করিলেন, "কিন্তু যারা প্রকৃত দোষী. তারা তো কই আমার কাছে এসে ক্ষমা চেয়ে গেল না!"

ভুবন বাবু নিরতিশয় লজ্জিত হইয়া মৃদু মৃদু কহিলেন, "হ্যাঁ, তারা ত আসবেই, নিশ্চয়ই আসবে। আসবে বই কি!"—কিন্তু মনে মনে তিনি এই দুর্ভাষী ও অহঙ্কৃত পুরুষের নিকট শুভেন্দুকে পাঠাইতে একটু সংশয়ই বোধ করিতেছিলেন।

বৈঠকখানার বাহিরে আসিয়া বিপ্রদাস তাঁহাকে বিদায় দিয়াছিলেন, এর চেয়ে বেশী সৌজন্যের অপব্যয় তিনি দেশী লোকের জন্য কখন করিতে পারিতেন না। ভুবন বাবু বৈঠকখানার দালান পার হইয়া কয়েকটা পৈঠা নামিয়া উঠান দিয়া চলিতে চলিতে পিছন দিক হইতে একটা সসঙ্কোচ আহ্বান শুনিতে পাইলেন,—"শুনুন!"

মুখ ফিরাইতেই এক অপূর্ব্ব দৃশ্য চোখে পড়িল! একটি দশ বৎসরের বালিকা, কিন্তু সেই মেয়েটির গায়ের রংয়ের চম্পক গৌরাভা, উজ্জ্বল ও বিশাল দুইটি চোখের স্বচ্ছ সরল ও সকরুণ কটাক্ষ, তাহার ঈষৎ স্ফুরিত আরক্ত অধরপুটের মৃদুকম্পন, সর্ব্বাপেক্ষা তাহার গোলাপী আভাযুক্ত গণ্ডের উপরকার গ্রন্থিচ্ছিন্ন মুক্তাহারের মতই নবীন রৌদ্রকরোজ্জ্বল অশ্রুমালার সমাবেশ তাঁহাকে মুগ্ধ করিল। ভুবন বাবু একান্ত বিস্ময়ের সহিত এই সহসা-উদ্ভূত করুণামূর্ত্তিটি নিরীক্ষণ করিতেছিলেন, এমন সময়

সেই অপরিচিতা বালিকা তাঁহার অধিকতর নিকটবর্ত্তিনী হইয়া নিজের কাপড়ের মধ্য হইতে বামহস্তখা'ন বাহির করিল, তাহার হাতে একটি রেশমের বোনা মণিব্যাগ। ভুবন বাবুর দিকে উহা প্রসারিত করিয়া দিয়া সে রুদ্ধপ্রায় গদ্‌গদস্বরে কহিয়া উঠিল, "এই নিন্, এই টাকা খরচ ক'রে আমার গোপালদা'কে ফিরিয়ে আনুন। আমি তিন সত্যি ক'রে বল্‌ছি, সে কক্ষণ আগুন দেয়নি, কক্ষণ আগুন দেয়নি, কক্ষণ আগুন দেয়নি।" বলিতে বলিতে সে দ্বিগুণ বেগে কাঁদিতে লাগিল।

ভুবন বাবু টাকার থলিটি হাতে না লইয়াই মেয়েটির সেই অশ্রুপ্লাবিত চাঁদপানা মুখের দিকে চাহিয়া সস্নেহে কহিলেন, "মা, তুমি ঠিকই বুঝ্‌তে পেরেছ, তোমার গোপালদা আগুন দেয়নি। দোষী দোষ স্বীকার করেছে, নির্দোষ গোপাল মুক্তি পাবে। তোমার টাকা রেখে দাও।"

মেয়েটির সুন্দর মুখখানি বর্ষা-আকাশের চাঁদের মতই ক্ষণেক উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। আবার তখনই কিছু ম্লান হইয়া গিয়া সে সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিল, "তবে যে সবাই বল্‌ছে, তার চার বৎসরের জন্য জেল হয়েছে! জেলখানা আমি মামাবাড়ী থেকে দেখেছি, সেখানে পাতর ভাঙ্গতে দেয়, ঘানি ঘোরাতে দেয়, এমনি বিশ্রী খাবার তাদের—গোপালদা তা হ'লে মরেই যাবে।"—এই বলিয়া মেয়েটি আঁচলে মুখ ঝাঁপিয়া পুনশ্চ কাঁদিয়া ফেলিল।

ভুবন বাবুর ইচ্ছা হইল, এই করুণাময়ী মেয়েটিকে বুকের কাছে টানিয়া লয়েন, মাথায় গায়ে হাত দিয়া একটু আদরের সহিত তাহাকে সান্ত্বনা করেন, কিন্তু সে যে কে, তাহাই তো জানা নাই? তাই সে ইচ্ছা দমন পূর্ব্বক গভীর স্নেহের সহিত কহিলেন, "হ্যাঁ, দণ্ড তা'র হয়েছিল বটে, কিন্তু তা'র দণ্ডের সংবাদ পেয়ে প্রকৃত দোষীর মনে অনুতাপের

উদয় হয় এবং সে দোষ স্বীকার করে। গোপাল দু' এক দিনের মধ্যেই ছাড়ান পাবে, এ তুমি নিশ্চিত বিশ্বাস করো।"

"তা হ'লে তো যে প্রকৃত দোষী, সেও এই রকম সাজা পাবে? উঃ, চার চার বৎসর জেলখাটা কি সোজা কষ্ট! তার কি হবে?"

ভুবন বাবুর অন্তরের মধ্যে ব্যাথাভরা আহত পিতৃত্ব যেন এই সহানুভূতিপূর্ণ করুণাধারায় টল্‌টল্‌ করিয়া উঠিল। তাঁহার. পুরুষের চক্ষুতেও এই ক্ষুদ্র বালিকার ওই সভয় ইঙ্গিতটুকুতে অশ্রুর আভাস দেখা দেয়, এমন অবস্থা হইল। তিনি ইহা দমনচেষ্টা পর্য্যন্ত না করিয়াই সবাষ্পস্বরে উত্তর করিলেন, "মা! ঈশ্বর তোমায় চিরসুখী করুন। কত বড় মহৎপ্রাণ নিয়ে তুমি এই স্বার্থ-মলিন সংসারে নেমে এসেছ! আশীর্ব্বাদ করি যেন এম্‌নি অম্লান থেকেই তাঁর পায়ে আবার ফিরে যেতে পার।"

দুইদিনের কুসঙ্গে পড়িয়া তাঁহার নিজ হাতে গড়িয়া তোলা সুশীল যে এত বড় একটা অন্যায়ের সহায়তা করিল, এ আঘাত তাঁহার বুকে যে বজ্রবলে বিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে!

মেয়েটি ঈষৎ লজ্জিতা ও নতমুখী হইয়াই পুনরপি সাগ্রহে মুখ তুলিয়া বলিল, "তাকে আবার তাহ'লে কি ক'রে বাঁচাবেন? এই টাকা নিয়ে তা'র জন্যে কিছু করুন না। শুনেছি, মোকদ্দমায় অনেক টাকা লাগে। তা' আমি অনেক টাকা কোথা থেকে পাব? বাবা আমায় খরচ করিতে পাঁচ টাকা ক'রে দেন, তারই কিছু কিছু রেখে এই তেরটা টাকা আমি জমিয়েছিলুম। এটা নিয়ে যান।"—থলিটি সে ভুবন বাবুর হাতে দিতে গেল।

"মা! আমি তাকে বাঁচাবার চেষ্টা করতেই যাচ্ছি, টাকা আমার সঙ্গে আছে, ও টাকা তুমি রেখে দাও, আবার অন্য কাজে লাগবে।"

বালিকা আস্তে আস্তে থলিটি আঁচলে বাঁধিল, তাহার মুখ বেশ প্রসন্ন বোধ হইল না ; বোধ করি, ইঁহার কথা তাহার যেন নিশ্চয় বিশ্বাস হয় নাই। ঈষৎ সন্দিগ্ধভাবে সে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি ত উকিল? তা হ'লে টাকা না পেলে তা'র জন্ম আপনি কেমন ক'রে চেষ্টা করবেন?"

অত্যন্ত বিষাদের একটুখানি ম্লানহাসি বর্ষাকাশের ভাঙ্গা মেঘপুঞ্জের মধ্যস্থ এক ঝলক সূর্য্যালোকের মতই ভুবন বাবুর বিমর্ষ মুখকে মুহূর্ত্তের জন্ম প্লাবিত করিল, তিনি গভীরতর একটা নিঃশ্বাস মোচনপূর্ব্বক সখেদে উত্তর করিলেন, "না মা! আমি সেই অপরাধীরই বাবা!—"

"সুলেখা!"—উপরের দালানের একটা ঝিলমিলি সরাইয়া নারীকণ্ঠে কেহ ঐ নামে আহ্বান করিল।

"যাচ্চি মা!" বলিয়া উত্তর দিয়াই সেই বিদ্যুদ্বরণী মেয়েটি বিদ্যুতের মতই মিলাইয়া গেল।

ভুবন বাবু ক্ষণকাল নির্নিমেষে সেই লুকাইয়াপড়া উজ্জ্বল মূর্ত্তিটির প্রতি বদ্ধদৃষ্টি হইয়া থাকিবার পর সহসা একটা দীর্ঘশ্বাস টানিয়া লইলেন। গভীর ব্যথাবিজড়িত গ্লানির মধ্য হইতে মনে মনে কহিলেন, "এক দিন আগে হ'লে, আমি মনে করতেম,—আজ আমি আমার মানসী প্রতিমাকে খুঁজে পেয়েছি, আমার সুশীলের জোড়া মিলেছে—কিন্তু আজ আর সে কথা মনে করবার কোনই অধিকার বা স্পর্দ্ধা আমার মনে নাই।—কিন্তু তবু সাধ হচ্চে—"

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

অতি কষ্টে গোপালের মুক্তিলাভ ঘটিল। প্রথমে এ সংবাদ সে ত বিশ্বাসই করিতে পারে নাই; পরে আনন্দে প্রায় মূর্চ্ছা যাইবার মত তাহার উপবাসক্লিষ্ট শরীর টলিয়া পড়িতেছিল। বাঁধনখোলা হাত দুইটা ঊর্দ্ধে তুলিয়া দরবিগলিত অশ্রুজলের মধ্য হইতে সে অস্ফুট ধ্বনিতে উচ্চারণ করিল -"তুমিই সত্যের!"

বাহিরে আসিয়া সে একটা জনরব শুনিতে পাইল যে, রায়বাড়ীর ভুবন রায় নাকি তাহার দিদিমণির কান্নায় গলিয়া বিস্তর পয়সা খরচ করিয়া তাহার উদ্ধার সাধন করিয়াছেন। আরও শুনিল, সেই ভুবন রায়ের, এক জন রাজার যত আয়, তেমনি ধারা টাকার আমদানী আসে এবং সেই ধনাঢ্য ব্যক্তিটি না কি ভবিষ্যতে চৌধুরী-কন্যার শ্বশুর হইবেন। কথাটা গোপালের বিশ্বাসও হইল এবং ভালও লাগিল। সম্প্রতি রায়বাড়ীর বিবাহে আইবুড়ভাত লইয়া গিয়া সে রায়েদের ঐশ্বর্য্য, বদান্যতা প্রভৃতি দেখিয়া আসিয়াছিল, আহার্য্য এবং বিদায় ভাল রকমই পাইয়াছিল। ও-বাড়ীর বড়বাবুর মেজাজও যে অসাধারণ ভাল, তাহাও লোকমুখে তাহার জানা আছে। তাহার দিদিমণি যদি সে বাড়ীর বউ হয় তো অন্যায় হইবে না। কিন্তু এখন দিদিমণিকে একবার দেখা যায় কেমন করিয়া? আর কি বাবু তাহাকে তাঁহার বাড়ীতে ঢুকিতে অনুমতি দান করিবেন?

বাড়ীখানার আশেপাশে চোরের মত লুকাইয়া ফেরাই যে তাহার পক্ষে প্রধানতম বিরুদ্ধ প্রমাণ দাঁড়াইয়াছিল, সে কথাটা প্রায় বিস্মৃত

হইয়া গিয়া সে আবার সেই দুষ্কার্য্যই করিতে লাগিল, ও শেষে এক দিন পুরাতন মনিব-বাড়ী মরিয়া হইয়া ঢুকিয়া পড়িতেও ছাড়িল না। দ্বারবান্ মাধোসিং তখন ফটকের পাশের কুঠরীতে আটা মাখিয়া মোটা মোটা লেচী পাকাইতে পাকাইতে অনতি-উচ্চৈঃস্বরে সুর করিয়া তুলসীদাস আবৃত্তি করিতেছিল;—

"তুলসীদাস হরি-চন্দন রগড়ে, পূজা করত রঘুবীর।"—

গোপাল এই চৌগোঁপ্পা সরযূ-পারীর কঠিন দৃষ্টি হইতে নিজের শীর্ণ ও খর্ব্ব আকৃতিটা গোপন করিয়া ফেলিবার কোন উপায়ই না দেখিয়া অবশেষে কাঁচুমাচুঁ মুখে দুই হাত কচলাইতে কচ্‌লাইতে তাহারই শরণাপন্ন হইল।

"ভাল আছ ত বাবা, দরোয়ানজি। মেজাজ খুস্ হ্যায়?"

"হাঁ জী, কাহে নেই?—কিসিকে নেহি চোরী কিয়া,—কিসিকে নেহি অপচয় কিয়া; কোই হামারে তব্‌লিব দে' শক্তে হেঁ?"

গোপাল চোরের অধম হইয়া গেল। কি বলিবে, কি করিয়া নিজের বক্তব্যটাকে প্রকাশ করিবে, তাহার খেই হারাইয়া ফেলিয়া সে বিমূঢ় হইয়া রহিল। অনেকক্ষণ পরে আবার ধসিয়া পড়া শরীরমনকে কোনমতে একটুখানি গুছাইয়া লইয়া সে আবার ক্রন্দনের সুরে আরম্ভ করিল, "দরোয়ানজী বাবা! হামার খোঁকি দিদিমণিকে একবারটি বুলিয়ে দেবে, বাবা? বাবা, তোমার কাছে হামি জন্মের মতন কেনা হয়ে থাক্‌বো, বাবা! একবারটি তেনাকে বুলিয়ে দাও।—"

মাধোসিং তাহার গঞ্জিকাপ্রসাদাৎ রক্তবর্ণ দুইটি চক্ষু অগ্নিতপ্ত লোহার ভাঁটার মত গোল করিয়া পাকাইয়া গোপালের দিকে তাহা যেন ছুঁড়িয়া মারিয়া তেম্‌নি বজ্রনির্ঘোষে হুঙ্কার করিয়া উঠিল, "কেঁও! ম্যয় চোট্টাকো সাথ ম্যয়কো খামিন্‌কা লেড়্‌কীকো মিল্‌নে দেঙ্গে?—"

আরও কোন কোন কথা সে বলিত, কিন্তু ক্রোধাতিশয্যে তাহার কথা বাহির না হইয়া তাহাকে অকস্মাৎ স্প্রিংয়ের মতন ছিটকাইয়া তুলিয়া বাহিরে ঠেলিয়া দিল, সে তৎক্ষণাৎ প্রচণ্ড বিক্রমে আসিয়া গোপালের পাঁকাটির মতন সরু গলাটা চাপিয়া ধরিয়া তাহাকে বাহিরের দিকে ধাক্কা দিয়া গর্জ্জনস্বরে কহিল, "নিকালো শালে! হারামজাদ! ফিন্ ডেরামে আগ্ ফুঁক্‌নে আয়া! বেহায়া, বদমাস! নিক'লো।—"

"দিদিমণি রে! আর তোকে দেখতে পেলাম না—" বলিয়া আর্ত্ত-নাদ করিয়া কারাবাসক্লেশে অর্দ্ধমৃত ও অনাহারী গোপাল সবেগে ফটকের বাহিরে প'ড়্'ত প'ড়তেও না পড়িয়া হঠাৎ কেমন করিয়া যে আটকাইয়া গেল, সে প্রথমে তাহা বুঝিতে পারে নাই। পরক্ষণে দেখা গেল, ঠিক সেই মুহূর্ত্তই একটি সুরূপ কিশোরের সহিত এক জন মাধোসিংহেরই সমপদস্থ অপরিচিত ব্যক্তি ফটকের মধ্যে প্রবেশ করিতেছিল; গোপাল তাহারই গায়ের উপর পড়িয়া যাওয়াতে মাটীতে পড়া হইতে বাঁচিয়া গিয়াছে। সে ব্যক্তি উহাকে ধরিয়া ফেলিয়া দাঁড় করাইল, গোপাল তখন চিনিল, সে ভুবন বাবুর দ্বারবান্—গিরধারদাস চোবে।

এ দিকে ইতোমধ্যে আর একটা কাণ্ড বাধিয়া গিয়াছে। গোপালের সেই উচ্চকণ্ঠের আর্ত্তনাদ বাহিরের অঙ্গন পার হইয়া ভিতর মহলের সন্নিহিত একতলার ঘরে পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট প্রবেশিকা-সোপান ও উপক্রমণিকা ব্যাকরণের পাঠে নিযুক্তা সুলেখার কর্ণে প্রবেশ করিয়াছিল। ধাতু রূপ করা তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করিয়া সে কশাহত জানোয়ারের মত তড়িদ্‌বেগে উঠিয়া দাঁড়াইয়া অধীরস্বরে কহিয়া উঠিল, "এ নিশ্চয়ই আমার গোপালদা' না হয়ে যায় না। কি হলো? গোপালদা' অমন করে চেঁচালো কেন? আবার কি মাধোসিং তাকে মারছে!"—

দিগ্বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য বালিকা তীরবেগে ছুটিয়া ঘরের বাহির হইয়া

গেল,—"মাধোসিং! মাধোসিং! তোম্ উস্‌কো একদম জান লেনে চাহ্‌তা হ্যায় কেয়া! কাহে ফিন্ মারতা হ্যায়জি?"

"ম্যয়কো কুছ্ কশোর নেহি হ্যায় দিদিসাহাব! হুজুরকা হুকুম হ্যায় যে ফিন্ কোভি উ দাগাবাজ আদমীঠো হুন্‌কা কোঠীকো মাইল ভর্‌মে আনে নেই শকে। ম্যয় তো তাঁবেদার হ্যায়।"

"কক্ষণ না, বাবা সে কথা নিশ্চয়ই বলেন নি! গোপালদা'! গোপালদা'! তুমি আমার কাছে এস! আহা, তুমি কি হয়ে গেছ, ভাই!"

বিগলিত করুণায় যেন শীতল জাহ্নবী-ধারা ঢালিয়া দিয়া সুলেখা এই কথা বলিয়া গোপালের দিকে চোখ ফিরাইতেই তাহার সেই সকরুণ দৃষ্টিটি এক মুহূর্ত্তেই বিস্ময়-রেখায় ভরিয়া উঠিল। শুধু তো তাহার গোপাল দাদাই নয়; তাহার সঙ্গে আরও যে কে দুই জন দাঁড়াইয়া আছে এবং তাহারই এক জনের দেহে ভর রাখিয়া দাঁড়াইয়া গোপাল কেমন যেন অবসন্নবৎ নিঝুম মারিয়া গিয়াছে। সুলেখা সহসা একটা অব্যক্ত ধ্বনি করিয়া উঠিল এবং ছুটিয়া আসিয়া দুই হাতে অর্দ্ধমূর্চ্ছিত গোপালকে জড়াইয়া ধরিয়া মর্ম্মান্তিক ব্যাকুলতার সহিত ডাকিয়া উঠিল—"গোপালদা! গোপালদা! আমি এসেছি যে।"

সেই স্বভাব-মধুর স্নিগ্ধ শীতল স্পর্শ ও সভয়স্বর যেন মন্ত্রৌষধির মতই মূর্চ্ছাতুর গোপালের ঘোর ক্লান্তিতে হতচেতনবৎ দেহে শক্তি-সঞ্চার করিল। সে সবেগে দৃষ্টি মেলিয়া একখানা হাত বাড়াইয়া দিয়া তাহাকে অন্বেষণ করিতে করিতে অস্ফুটস্বরে উচ্চারণ করিল, "দি,—দিদি, দিদিমণি আমার!"—তাহার চোখ দিয়া অবিরল জলের ধারা বহিতে লাগিল।

সুলেখার চোখ দুইটিও শুষ্ক ছিল না, তাহা বলাই বাহুল্য; কিন্তু সে

আর অনেক বেশী কান্নাই বোধ করি কাঁদিত; কিন্তু যে মুহূর্ত্তে তাহার সম্মুখবর্ত্তী কিশোরের দুইটি বিস্ফারিত ডাগর চোখের উপরে তাহার দৃষ্টি নিবদ্ধ হইয়া গেল, অমনই একটা গাঢ় লজ্জার লালিমায় তাহার সরস দাড়িম্ববীজতুল্য গণ্ড দুইটি আরক্ত করিয়া, তাহার কান্নাকেও যেন বাঁধ দিয়া বন্ধ করিয়া দিল। সে চিনিল, এ সেই ছেলেদেরই এক জন—যাহারা সে দিন তাহার বাবার হুকুমে বাজপেয়ীর হাতের বেত খাইয়া গিয়াছে। মনে মনে বিস্মিত হইল, তাহারা এখানে আবার কি জন্য আসিল? গোপালদার সঙ্গে আসিয়াছে কি? কিছু বুঝিতে পারিল না; কিন্তু তাহার ইহাদের কাছে ভারী লজ্জা বোধ হইল। পাছে সে দিনের কোন কথা আবার উঠিয়া পড়ে, সে ভয়ও একটু হইল।

"গোপালদা, এস, কিছু খেতে দিই গে"—বলিয়া সে ততক্ষণে অপেক্ষাকৃত সুস্থ গোপালের হাতে ধরিয়া তাহাকে লইয়া ভিতরের দিকে চলিয়া গেল।

সুশীলের অত্যন্ত লোভ হইতে থাকিলেও সে তাহার সম্মান-রক্ষাকর্ত্রীকে একটি কৃতজ্ঞতার কথাও মুখ ফুটিয়া বলিতে সমর্থ হইল না। বলিতে তাহারও অতিশয় লজ্জা বোধ হইতেছিল।

বিপ্রদাস বাবু বৈপ্রহরিক বিশ্রামশয্যায় শয়ন করিয়া আলবোলার নল টানিতেছিলেন, তাঁহার মাংসবহুল পদযুগল এক জন দাসীতে টিপিয়া দিতেছিল, তিনি তাহাকে তাঁহার স্ত্রীকে ডাকিয়া দিতে আদেশ করিলেন। গৃহিণী সত্যবতীর বয়স বিপ্রদাস বাবুর অর্দ্ধেকের অনধিক। আকৃতি অনেকটা সুলেখারই মত; প্রকৃতিতেও তাহার স্বভাবের পরিচয় পাওয়া যায়; তবে সে শিশু, ইনি পরিণতবয়স্কা জমিদারগৃহিণী এবং দুর্দ্দান্ত স্বামীর স্ত্রী। দ্বিতীয়পক্ষীয়া হইলেও চরিত্রের কোমলতা বশতঃ "প্রাণেভ্যোপি গরীয়সী" হইতে পারেন নাই—বিশেষতঃ বিপ্রদাসও

বৃদ্ধ নহেন; তাঁহার বয়স মাত্র পঞ্চাশোর্দ্ধ এবং পত্নী পঞ্চবিংশতি বর্ষীয়া।

প্রভুর ইঙ্গিতে দাসী বিদায় লইলে বিপ্রদাস বলিলেন—"তোমার বাড়ী পোড়ানর ব্যাপারটা সে দিন সব বলেছিলেম না? আজ ভুবন বাবু যে তাঁ'র ছেলেকে আমার কাছে ক্ষমা চাইতে পাঠিয়েছিলেন।"

সত্যবতী একটুখানি চঞ্চলভাবে স্বামীর দিকে বারেক চাহিয়া লইয়া মৃদুকণ্ঠে সংক্ষেপে উত্তর দিলেন, "ওঃ!"

বিপ্রদাস কহিলেন, "খাসা ছেলে।"

সত্যবতী মনে মনে ঈষৎ বিস্মিতা হইলেও মুখে মৌনী হইয়াই রহিলেন, ইতঃপূর্ব্বে এ শব্দ তিনি স্বামীর মুখ হইতে আর কখন বাহির হইতে শুনিয়াছেন কি না, বোধ করি, সেই কথাটাই ভাবিতে লাগিলেন।

বিপ্রদাসের আজ বোধ করি মনোবীণা খুব উচ্চ সুর-গ্রামে বাঁধা ছিল, কোন দিকে লক্ষ্য পড়িল না; আপনার চিন্তাধারারই অনুসরণ করিতে করিতে সত্যবতীকে লক্ষ্য করিয়া কহিতে লাগিলেন, "ভুবন বাবুর এখন ঢের টাকা রোজগার হচ্চে; শুনেছি, কলকাতায় না কি বড় বড় আট দশখানা ভাড়াটে বাড়ী—একখানা তার বিলিতি হোটেল ভাড়া দিয়ে রেখেছে; কারবারও খুব ফলাও, আবার এ দিকের জমীদারীরও অংশ আছে। তাঁ'র ঐ ছেলে তো মোটে একটিই। ছেলেটিও দেখতে ভাল, লেখাপড়াও মন্দ কর্‌ছে না, কেমন? কি বল? মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দেবে না কি?"

সত্যবতী চকিত হইয়া উঠিলেন, "এখনই?"

বিপ্রদাস কহিলেন, "আজই নয়, যখন হয় তখন, পছন্দ কি না?"

"কিন্তু ওদের লেখাকে যদি পছন্দ হয় তবে ত?"

বিপ্রদাস বিজয়গর্ব্বে তাচ্ছিল্যের হাসি হাসিয়া বলিলেন, "পছন্দ হয়

কি? হয়েছে। ভুবন বাবু সে দিন সুনি'কে দেখে খুব পছন্দ করে গেছেন। বিয়ের কথা স্পষ্ট না লিখলেও ওর রূপের কথা, গুণের কথা আজকের চিঠিতে না হোক তবু পাঁচ যায়গায় লিখেছেন। শেষে লিখেছেন, 'আমার ছেলে যদি আজ এত বড় অপরাধে অপরাধী না হতো তা হলে—যাক্, মনে কত সাধ যায়; সব সাধ কি আমরা মিটাইবার সৌভাগ্য লইয়া আসিয়াছি!'—আর কি স্পষ্ট বল্‌বেন?"

সত্যবতীর সুন্দর মুখ অকস্মাৎ গম্ভীর হইয়া আসিল, তিনি ক্ষণকাল নতমুখে নীরব থাকিয়া সহসা মুখ তুলিয়া বলিলেন, "কিন্তু সে কথাও তো সত্যি, সুশীল যা অন্যায় কাযটা করেছিল, তাতে বড় হয়ে—"

"সে ডাকাতের সর্দ্দার হবে? না, মোটেই তা'নয়—"

বিপ্রদাস এবার হাহাশব্দে হাসিয়া উঠিলেন—"ছেলেটির অতি নধর-কান্তি, মাধুর্য্যপূর্ণ নম্রমূর্ত্তি, সে এ সব কাযের যোগ্যই নয়। আমিতো বোকা নই; ভুবন বাবু কোন ইঙ্গিত না দিলেও আমি বুঝেছি ও জেরা ক'রে বা'র করেছি যে, আগুন দেবার পরামর্শ এবং দেওয়া সুশীলের নয়, শুভেন্দুর—ওঁর এক বন্ধুর ছেলের। সুশীল শুধু তার সঙ্গে ছিল। আর দেখ, যদিই তা'দিয়েই থাকে, ছোট বেলায় অমন কত ছেলের কত করে। সবাই তো আর তোমার এবং ভুবন বাবুর মতন ধর্ম্মধ্বজ ও ধর্ম্মধ্বজী নয়, ও সব কি আর ধর্ত্তব্য?"

একটু থামিয়া মৃদুহাস্যের সহিত পুনশ্চ কহিলেন, "ধর, এই আমিই ওর বয়সে কারু ঘরে আগুন না দিয়ে থাকি, একবার সংস্কৃত পণ্ডিতের টিকিতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিলুম, আর একটু হলেই গো-হত্যা নয়, ব্রহ্মহত্যাটা হয়ে যেতে পারতো। একবার না, যাক্ গে, তা তোমার কি মত বলো? আমি তো মন ঠিক ক'রেই ফেলেছি। আমি যখন ডাকাত হই নি ও-ও হবে না।"

সত্যবতী মনে মনে বলিলেন, "তুমি ডাকাতের চাইতে খুব বেশী তফাৎও নও!" প্রকাশ্যে বলিলেন, "দেখ, যা ভাল হয়। তা ওরা এখন ত আর বিয়ে দিতে চাইবে না। সুলেখা এখন যে বড্ড ছোট আছে।"

"এখন দেবার কথা তো আর হচ্ছে না'—বলিয়া বিপ্রদাস বাবু গম্ভীর মুখে ধূমপান করিতে লাগিলেন, স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করা তাঁহার পক্ষে এই যথেষ্টই হইয়া গিয়াছে বলিয়া তাঁহার মনে হইল। মেয়েমানুষের সঙ্গে বেশী কথা কহিতে গেলে নিজেকে খেলো করিয়া ফেলা হয় বলিয়া তাঁহার মনে বিশ্বাস ছিল। তা' ইতোমধ্যেই স্ত্রীর সহিত মনের কথা কহিয়া ফেলিয়া নিজেকে তিনি হয় ত বা একটুখানি খর্ব্ব করিয়া ফেলিয়াই থাকিবেন—কারণ, তাঁহার এই সকল কথাবার্ত্তার পরে তাঁহাকে একটুখানি প্রসন্ন বোধ করিয়া সত্যবতী ভয়ে ভয়ে এই সঙ্গে একটা আবজী পেশ করিয়া বসিলেন, হাতের নখ খুঁটিতে খুঁটিতে মুখ নত করিয়া মৃদুকণ্ঠে কহিলেন—"লেখা তো গোপালের জন্যে বড্ডই কান্নাকাটি করছে, সে যখন দোষী নয়, তখন তাকে বাড়ীতে রাখায় কি কোন দোষ আছে? যদি—"

বিপ্রদাসের মুখ প্রবিষ্ট আলবোলার নল বিবরপ্রবিষ্ট সর্পমুখের ন্যায় সবেগে বাহির হইয়া আসিল, ধূমধারা বর্ষাজলপ্রাপ্ত নল খাগড়ার বনের মত ঘন গুম্ফরাজীর মধ্য দিয়া ছড়াইয়া পড়িল, মনে হইল যেন, গভীর বনে দাবানল জ্বলিয়া উঠিয়াছে। গম্ভীর ও অবিচলিত কণ্ঠে তিনি কহিয়া উঠিলেন, "সে হারামজাদাটা কি আমার বাড়ীতে ঢুকতে পেয়েছে না কি? নাঃ, সুলুটা বড় জ্বালালে দেখছি! এসেছে না কি?"

সত্যবতী ভয় পাইয়া গিয়া নিজ নামের যথার্থ মর্য্যাদারক্ষায় সমর্থ হইলেন না। 'ইতি গজ' করিয়া বলিলেন, "আসার কথা নয়, যদি আসতে মত দাও, তাই বল্‌ছিলাম, সে ত আর দোষী নয়।"

"দোষী নয়? বল কি তুমি? সে আমায় জব্দ করবে ব'লে মুখের উপর শাসিয়ে যায় নি? তার পর এই যে দণ্ড না পেয়ে ফিরে এলো, এতে কি ওর কম আস্কারা বাড়লো ব'লে মনে কর? ব্যাটার ধরাকে যে এখন সরা জ্ঞান হবে, আর ওর দেখাদেখি সব লোকজন বিগ্‌ড়ে যাবে না! ওকে আমার বাড়ীর ত্রিসীমানার মধ্যে যেন খবরদার আস্‌তে দেওয়া না হয়, আমি যে মাধোসিংকে বলে দিয়েছিলাম,—এই কে আছিস্?"

সত্যবতী তাড়াতাড়ি অন্যপথে সরিয়া পড়িলেন ও যেখানে সুলেখা আপনি বসিয়া বহুদিনের অভুক্ত গোপালকে যত্নপূর্ব্বক আহার করাইতেছিল, সেইখানে গিয়া অগত্যাই তাঁহাকে সকল কথা প্রকাশ করিয়া বলিতে হইল। সুলেখার চোখ দিয়া অমনই জলের ফোঁটা টপ টপ করিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল; কিন্তু গোপাল এ সংবাদ পাইয়া খুব বেশী বিচলিত হইল না; সে তৎক্ষণাৎ সুলেখাকে সান্ত্বনা দিয়া কহিয়া উঠিল—

"কাঁদিস্ নে দিদিমণি! আমার জন্যে তোকে আর ভাবতে হবে না। তোর শ্বশুর তাঁর দরওয়ানকে দিয়ে আমায় তাঁর বাড়ীতে থাকবার কথা ব'লে পাঠিয়েছেন, বলেছেন, কল্‌কেতায় আমায় নিয়ে যাবেন। দুদিন দেখা হবে না বটে, আবার তুই ভাই, সেই ঘরই তো চিরদিন ধ'রে কর্‌বি।"

মুখ তুলিয়া সত্যবতীর সহসা-কৌতুক-স্মিত মুখের দিকে চাহিয়া পুনশ্চ কহিল, "খাসা মানুষ মা, আমার দিদিমণির শ্বশুর! দেবতুল্য লোক! জেল খানায় গিয়ে আমার মতন ছোট লোকের গায়ে হাত দিয়ে কি আদরটাই না করা। যেমন আমার সীতাদেবী দিদিমণি, তেমনি রাজা দশরথের মতন শ্বশুর হবে বাবু।"

সত্যবতী প্রীতি আনন্দে সস্নেহ-নেত্রে কন্যার মুখের দিকে চাহিলেন ; মন্দ নয়! ইহারই মধ্যে সংবাদটা ছুটিয়াছে ত অনেক দূর! অথবা এটা উহাদের নিছক কল্পনা মাত্র! তা কথাটা নেহাৎ মন্দ নয়, সুলেখার পিতা যদি ভুবন বাবুকে বৈবাহিক করেন, তবে তাঁহার জীবনে অন্ততঃ একটাও ভাল কায করা হইবে।

সুলেখা অশ্রুভরা দুই চোখে রোষের বাণ ভরিয়া গোপালের দিকে তাহার সন্ধানপূর্ব্বক উল্টান ঠোঁটে বলিয়া উঠিল, “ধ্যেৎ!”

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

নীলিমার বিদ্যাশিক্ষার উন্নতি এই মিশন স্কুলে আসিবার পর হইতে যত না হউক, বাইবেল পড়া ও যিশুর গান তাহাকে যথেষ্ট পরিমাণেই শিক্ষা করিতে হইতে লাগিল; এবং যতই তাহা শিখিল, মিসেস্ গুঁই বা মিস্ হর্ণের কিছুতেই তাহার সে শিক্ষা আর মনঃপূতই হইতেছিল না। মিসেস্ গুঁইএর ক্লাসে প্রথমেই প্রার্থনা-গান, তার পর প্রার্থনা, তার পর বাইবেলের "বুক অফ্ দানিয়েল", "জেনিসিস্ সামুয়েল"—এম্‌নি কোন না কোন একটা যায়গা পাঠ্য। তার পর হাতের লেখায়ও সেই বাইবেল, কোন দিন ডিক্‌টেসন দিলে সেও সেই বাইবেল, ইংরাজী হপ্তায় দুই দিন মাত্র, তাহাও সেই ওল্ড টেষ্টমেণ্ট হইতে ছত্র কতক করিয়া পড়ান হইত। বাকী রহিল অঙ্ক ও সেলাই, তা' ও দুইটার মধ্যে নাকি বাইবেল গুঁজিয়া দেওয়া কোনমতেই চলে না, কাযেই ও দুটাকে এই বাইবেলময় স্কুল-নিয়মের মধ্যে একান্ত ভাবেই সঙ্কুচিত করিয়া রাখা হইয়াছিল। তবে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিস রীড্ নীলিমার সৌভাগ্যবশতঃ তাহাকে একটুখানি কেমন সুনজরে দেখিয়া ফেলিয়াছেন, তাই হপ্তায় এক দিন করিয়া তিনি তাহাকে একটু উচ্চাঙ্গের শিল্পশিক্ষা দিতে চাহেন, ঘর হইতে ইহার জন্য উপকরণ যখন সে আনিয়া উঠিতে পারিল না, তখন আর কি হইবে? অগত্যাই ইহার বদলে অল্প-স্বল্প ইংরাজী ও অঙ্ক সে তাঁহার নিকট হইতে শিখিতে পাইল। তবে সে ইংরাজীও বাইবেল সম্বন্ধীয়, ইহা বোধ হয় বলাই বাহুল্য। ছাত্রদিগের অণুপরমাণুতে এইরূপে বাইবেলের শিক্ষা ও যিশুপ্রেম ইঁহারা ইন্‌জেক্ট করিয়া দিয়া নিজেদের কর্ত্তব্যপালনের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছিলেন,

এবং তপ্তলৌহের তরলধারে পরিপূর্ণ বীভৎস কুম্ভীরময় কুম্ভীপাকের হস্ত হইতে অনন্তমুক্তি প্রদানে উহাদিগকেও ধন্য করিতেছিলেন।

নীলিমা ক্লাসের কাহারও চেয়ে এই আত্ম-রক্ষা কার্য্যে অমনোযোগী-নী না হইয়াও ইহার জন্য উঠিতে বসিতে কিন্তু শিক্ষয়িত্রীদের নিকট ভৎর্সনা লাভ করিতেছিল। মিস হর্ণ এক দিন প্রশ্ন করিলেন, "আই হোপ, ইউ লাইক দি সাম্‌স্? (আমি আশা করি, Psalms তোমার ভাল লাগে)?

নীলিমা মিথ্যা বলিতে জানিত না, সে ভয়ে ভয়ে জানাইল যে, না তা' লাগে না।

"নো?—ওহ হাউ শক!" (না? উঃ কি ভয়ানক!) মিস হর্ণ চোখ কপালে তুলিয়া বক্ষে ক্রুশ চিহ্ন ধরিয়া দেহশুদ্ধি করিয়া লইলেন।

মিসেস গুঁই এক দিন সব মেয়েদেরই জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওই! তোরা সব পুতুলদের ভক্তি করিস? ওদের দেবতা মনে করিস?"

সব মেয়েই প্রায় ভয়ে ভয়ে চুপ করিয়া থাকিল। চুপকরা যখন অচল হইল, তখন যাহাদের মিথ্যা বলা অভ্যাস আছে, তাহারা সত্যকে অস্বীকার করিয়া বলিল, "নেহি, নেহি মান্‌তে হৈ, পহিলে মান্‌তে থি, লেকিন্ আব হিতো কেবল যেশুকো প্রেম কর্‌তে হেঁ।"

মিসেস গুঁই উহাদের দিকে প্রীতিকটাক্ষ করিয়া সন্তুষ্টভাবে কহিলেন, "উহে ঠিক কাম করতে হেঁ, তোম লোগ্‌কা আত্মা নরক সে বাঁচ গিয়া!"

শুনিয়া ঐ মেয়েরা হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল, যেন স্বয়ং যিশুখৃষ্টই বা পুর্ণজীবিত হইয়া আসিয়া তাহাদের অনন্ত পাপমুক্তির আদেশ প্রদান করিতেছেন এমনই নিশ্চিন্ততা তাহারা বোধ করিল।

মিসেস্ গুঁই তখন তাঁহার কোটরনিবাসী চোখ দুইটাকে ঠেলিয়া বাহির করিয়া কটমট করিয়া নীলিমার দিকে চাহিলেন, "তোমার বুঝি

ও কথা বলবার সাধ্য হলো না ? তুমি বুঝি এখনও ফুল-বেলপাতা দিয়ে পুতুলের পূজো করছো ?”

এতক্ষণ এই সময়েরই জন্য নীলিমা শ্বাসনিরোধপূর্ব্বক প্রতীক্ষা করিয়াছিল। সম্বোধিত হইয়া তাহাব বুকটা ঢিপ্ ঢিপ্ ঢিপ্ ঢিপ্ করিতে লাগিল। তাহার রক্তাল্পতায় পাণ্ডুমুখ অধিকতর বিবর্ণ হইয়া গেল। হাঁ৷ না কোন কথাই সে কহিতে পারিল না।

মিসেস গুঁই এর হয় ত বা বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, তাঁর অপর সকল হিন্দুস্থানী ও কয়েকটি নিতান্ত নিম্নশ্রেণীর বাঙ্গালী ছাত্রীদের আত্মার অপেক্ষা একটু উচ্চশ্রেণীর বাঙ্গালী ব্রাহ্মণকন্যা নীলিমার আত্মার বাজারদর কিছু অধিক হওয়াই সঙ্গত এবং সেই জন্যই বোধ করি, উহাকেই সুরক্ষিত করিবার জন্য তাঁহার আগ্রহটাও কিছু অধিকতবই দেখা যাইত। নীলিমাকে যে উঠিতে বসিতে যিশু-প্রেম শিক্ষা দিয়াও তাহার ফল এত বড় অফলা হইয়াছে, ইহা মনে করিতেই তাঁহার মন খারাপ হইয়া মূর্ত্তিও ভীষণতর হইয়া উঠিল।

“ফর্ সেম্! নেলি! ফর্ সেম্!—ঈশ্বর তোমায় আমাদেরই সঙ্গে এক রকমেরই মানুষের চেহারা দিয়াছেন, দেন্নি ? বয়সও তোমার এখন এই নেহাৎ কাঁচা, ইচ্ছা করিলে এখনও তুমি তাঁর নিজের ভেড়ার-ছেনা হ'তে পারতে। কিন্তু তা না করে, কি লজ্জার বিষয় যে, তুমি সয়তানকে আত্মবিক্রয় করে রেখে দিলে! ঈশ্বরের পুত্রকে শরণ না নিয়ে পুতুলের কাছে নিলে ? বাড়ী গিয়ে একবার বাঁ পায়েব লাথি দিয়ে দেখ দেখি, তোমার পূজো করা সেই পুতুলগুলো জ্যান্ত হয়ে উঠে তোমায় উল্টে লাথি মারতে পারে কি না! * তা যদি না পারে, তবে সে তোমায় নরক থেকে মুক্তি দিতে পারবে ?”

* ঘটনাটি কাল্পনিক বা অতিরঞ্জিত নহে, পরন্তু বাস্তব।

নীলিমার চোখে সহজে জল আসে না, আসিলেও তাহা সহসা ঝরিয়া পড়ে না, কিন্তু আজ আর তাহার চোখের জল চোখের মধ্যে ধরা রহিল না, গাছের পাতার শিশির বিন্দুর মতই তাহা এক মুহূর্ত্তে ঝরিয়া ঝরিয়া পড়িয়া গেল; কিন্তু ইহার ফল যে ভাল নয়, তাহা বুঝিয়াই সে পরক্ষণে অশ্রু সংযত করিয়া লইবার জন্য সচেষ্ট হইয়া পাশের দিকে মুখ ফিরাইয়া লইল।

কিন্তু চোখের জল তাহার গোপন ছিল না এবং দ্রষ্টার মনের অঙ্গে তাহা বোধ করি বিছার মতনই হুল ফুটাইয়া দিয়াছিল। মিসেস ওঁই একেবারে রুদ্রমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক দাঁতে দাঁতে ঘষিয়া চীৎকার শব্দ করিয়া উঠিলেন—"অ্যাঁ নেলি! এত দিন এত শিক্ষা পেয়ে তুমি পুতুলের শোকে কেঁদে ফেল্লে! কি ভয়ানক! কি লজ্জা! কি ঘেন্না! কোথায় আজ প্রভু যিশুর প্রেমে তোমার চোখ দিয়ে প্রেমের ধারা বইবে, তোমার স্বর্গের আলোক হাস্‌তে থাক্‌বে, তোমার আত্মা অনন্তকালের জন্য ত্রাণকর্ত্তা যিশুর আশ্রয়ে পরিত্রাণ লাভ করবে, তা'না হয়ে নুলো জগন্নাথ, জিব বারকরা কালামুখী ন্যাংটা মূর্ত্তি কালী, হাতীমুখো গণেশ মনে করতেও গায়ের রোম খাড়া হয়ে ওঠে—সেই-গুলোর শোকে তুমি চোখে সরষেফুল দেখছো! এই মেয়েরা! তোরা আর এর সঙ্গে এক বেঞ্চিতে বস্‌বিনে; ওর সঙ্গে কথা কবিনে; ওর দিকে কেউ চেয়ে পর্য্যন্ত দেখবিনে। ওর আত্মা একেবারে নরকের দোর গোড়াতে গিয়ে পৌঁছে গেছে। সেখানে ওর আত্মা হাঙ্গর কুমীরের আহার হয়েছে,—সেখানে ওর আত্মা কীট-পতঙ্গের আহার হয়েছে,—সেখানে ওর আত্মা সংসারের যাবতীয় পাপের ভারে ভারী হয়ে সংসারের যত কিছু ময়লা জিনিসের মধ্যে ডুবে গেছে; সেখানে ওর আত্মা আগুনের হাপরে যেমন গলান লোহা ঢেউ খেলতে থাকে, তেমন

ধারা গরম লোহার চৌবাচ্চার প'ড়ে জ্ব'লে যাচ্ছে, জ্ব'লে যাচ্ছে, জ্ব'লে যাচ্ছে !"

নীলিমার ঠোঁট ফুলিতে লাগিল, বুক ঠেলিতে লাগিল, চোখ ফাটিতে লাগিল। তাহার মনে হইতে লাগিল, বাস্তবিকই যেন এই মুহূর্ত্ত হইতেই তাহার উক্তবিধ দুর্দ্দশা আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। তাহার আত্মাটাকে (সেটা যে কোথায় আছে, তাহা না জানিলেও) যেন হাঙ্গরে চিবাইয়া, কুমীরে গিলিয়া, জোঁকেরা চুষিয়া, পতঙ্গে কুরিয়া খাইতেছে। গরম লোহা তরল অগ্নির মতই যেন তাহার সমস্ত শরীরকে পোড়াইয়া দিতেছে, অথচ তাহাকে ছাই করিতেও পারিতেছে না। নীলিমা হাঁপাইতে লাগিল, তাহার হাত ও পায়ের তলা ক্রমে ঠাণ্ডা হইয়া আসিল ; তাহার পর সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপিয়া একটা প্রবল কম্পন দেখা দিল, সে পতনোন্মুখ হইয়া দেওয়াল ধরিল।

মিসেস্ শুই একবারমাত্র তীব্রদৃষ্টিতে বোধ করি সেই তরল অগ্নিরই কতকটা ঝাপ্‌টা মারিতে চাহিয়া তেমনই সতেজে বলিয়া যাইতে লাগিলেন, "সেই গলা আগুনে প'ড়ে প'ড়ে দুষ্টাত্মা কর্ণে শুনবে, কিন্তু কোনমতে বুঝবে না ; চক্ষুতে দেখবে, কিন্তু কোনমতেই প্রত্যক্ষ করবে না। চীৎকার করিয়া ডাকিলেও কেহ আসিবে না। আবার এর চেয়েও ভীষণ দণ্ড পাবে—যখন ঐ আগুনের কুণ্ড হ'তে তুলে নিয়ে ময়লার পচা গন্ধময় পুকুরে ঠেলে ফেলা হবে। তখন চীৎকার ক'রে উঠলে সেই পচা ময়লা থেকে সহস্রটা ভীষণাকার কৃমিকীট কিল্‌কিল্ ক'রে মুখের মধ্যে—"

নীলিমার কানে শুনিবার, চোখে দেখিবার শক্তি সত্যই লোপ পাইয়া আসিল। অনেকক্ষণ পরে সে কতকটা আত্মস্থ হইয়া মুখ তুলিয়া, চোখ মেলিয়া চাহিয়া দেখিল,—তাহার ক্লাসের মেয়েরা তো বটেই, অন্যান্য

ক্লাসের মেয়েরাও ক্লাস ছাড়িয়া তাহার বিচার দেখিতে আসিয়া জমা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে মিস্ হর্ণও আসিয়া নিতান্ত সকরুণভাবে দাঁড়াইয়া মধ্যে মধ্যে "হাউ সকিং!" "হোয়াট এ পীটি!" ইত্যাদি রূপ আপশোষ জানাইতেছিলেন। নীলিমার চক্ষু-কর্ণের এ সকল দৃশ্য ও মন্তব্যের জন্য বিশেষ অবসর ছিল না। মিসেস্ গুঁইব প্রকাণ্ড তামাটে মুখখানা ও কণ্ঠেব কাংস্যরব দর্শন-শ্রবণেব জন্যই তাহাব অপমানাহত ভীত চিত্ত উগ্র আগ্রহে চকিত হইযা উঠিল। মিসেস্ গুঁই কিন্তু সমধিক শীতল হইয়াছিলেন।

তরল তপ্ত লৌহ বুঝি একটুখানি জুড়াইয়া আসিয়াছিল না কি, বলাও যায় না; কতকটা সংযতভাবে তিনি তখন পাঠ কবিলেন—"এবং সেই পরাজিত সকলেও করে, যাহাদেব উপরে আমাব নাম ডাকা হইয়াছে। অতএব আমাব বিচাব এই, পরজাতীয়দিগের মধ্যে যাহারা ঈশ্বরের প্রতি ফিবে, আমরা যেন তাহাদিগকে কষ্ট না দিই, কিন্তু তাহাদিগকে লিখিয়া পাঠাই, যেন তাহারা প্রতিমা ঘটিত অশুচিতা হইতে, ব্যভিচার হইতে গলা টিপিয়া মাবা প্রাণী হইতে এবং রক্ত হইতে স্বতন্ত্র থাকে।"

"নেলি? এখন বেশ ভাল ক'রে নিজের অবস্থাটা বুঝতে পেরেছ ত? আচ্ছা, আজ সাবা রাত্রি ধ'রে অনুতাপ ক'বে নিজের পাপ ক্ষালন কর গে যাও। পবিত্রাত্মার কাছে ঐ পশুর হৃদয়ের বদলে একটি মানুষের হৃদয় প্রার্থনা ক'রে খুব চোখের জল ফেল গে' দেখি! কি বল্‌বো, তুমি আমাদের বোর্ডিংএর মেয়ে নও, তা হ'লে একদিনেই তোমায় আমি ঠিক ক'রে নিতুম। না খেতে দিয়ে ঘরে বন্ধ থাকলে আর শাস্তিব কথা শুনলে পুতুল পুজো বের হয়ে যেত।"

সকলের তীব্র ও অনেকেরই ঘৃণাপূর্ণ পর্য্যবেক্ষণদৃষ্টির মধ্য দিয়া ভীত,

কম্পিত, লজ্জাবিবর্ণ, সঙ্কোচে ম্রিয়মাণ নীলিমা ক্লাসের বাহিরে আসিয়া একটা আর্ত্তশ্বাস গ্রহণ করিল। পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত তাহার তখন যেন টলমল করিতেছিল, একটা প্রচণ্ড অনিবৃত্ত ভয়ে যেন তাহার সমস্ত মনটাকে আর্ত্ততায় অস্থির করিয়া তুলিতেছিল; সে ভয়টা অবশ্য শুঁই বা মিস্ হর্ণের উদ্দেশ্যে, অথবা তাঁহাদের বর্ণিত সেই ভীষণ নরকযন্ত্রণার ভবিষ্য আতঙ্কজনিত, তাহা নিশ্চিত করিয়া না বুঝিলেও তাহার নিশ্বাসে প্রশ্বাসে কেবলই মনে হইতে লাগিল যে, সে গিয়াছে যেন জন্মের মত, ইহপরকালের মত, অনন্তকালেরই মত একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে!

তাহার ক্লাসের মেয়েরা তখন ছুটির পূর্ব্বেকার প্রার্থনা-গান গাহিতেছিল।

"ইশ মশি মেরা প্রাণ বাঁচাইও"—

তাহাদিগের সেই প্রার্থনার সঙ্গে প্রাণের তান মিশাইয়া তাহার ভয়ার্ত্তচিত্তও যেন অকস্মাৎ আজ প্রাণের প্রাণেরও মধ্য দিয়া ঐ গান সপ্তস্বরে গাহিয়া উঠিল। মর্ম্মের ভিতর হইতে ভীত ত্রস্ত ব্যাকুলচিত্ত কাতর উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া আর্ত্তস্বরে বলিতে লাগিল—

"ইশ মশি মেরা প্রাণ বাঁচাইও',—মেরা প্রাণ বাঁচাইও,—মেরা প্রাণ বাঁচাইও।"

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

সে দিন বাড়ী ফিরিবার মুখে সারা পথটাই নীলিমা গভীর উৎকণ্ঠার সহিত ভাবিতে ভাবিতে আসিল যে, সে দিন বাড়ী ফিরিয়া সে মা'র কাছে প্রথমেই জানিয়া লইবে যে, খৃষ্টধর্ম্মের চেয়ে হিন্দুধর্ম্ম বড় কি ছোট? খ্রীষ্টান না হইয়া হিন্দু থাকিলেই মানুষকে অনন্ত নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় কি না, হিন্দু থাকিয়াও স্বর্গযাত্রা করা চলে কিনা—সে সম্বন্ধেও সবিশেষ জানিয়া লইবার জন্য তাহার সারা চিত্তে উদ্বেগ ও আগ্রহের যেন আর অন্ত রহিল না। মিসেস্ শুইং আজ বিদায়কালে পুনশ্চ তাহাকে দৃঢ় আদেশের সহিত বলিয়া দিয়াছেন,—মিস্ হর্ণ নিশ্চিত বিশ্বাসে পিঠ চাপড়াইয়া বলিয়াছেন,—কা'ল তাঁহারা তাহাকে 'গুড বিলিভার' দেখিতে উৎসুক রহিলেন। অসহ্য অশিক্ষিত ষাঁড়ে চড়া মহাদেব, ঠুঁটো জগন্নাথ, কুচরিত্র শ্রীকৃষ্ণ, উলঙ্গিনী কালী (হোয়াট্ এ সেম!) এদের প্রতি ভক্তি ছাড়িয়া 'সেভিয়ারের' শরণাপন্ন হইলেই যখন তাহার দীন-আত্মা অনন্ত অসীম সুখের অধিকারলাভে সমর্থ হয়, তখন অনর্থক নিজের ক্ষুধিত আত্মাকে সেই অনায়াসসাধ্য সুধাপাত্র কেনই বা সে পান করাইয়া চিরঅমরতা দান না করিয়া থাকে? এ'না করিলে তাহার পাপ আবার অন্যান্য 'হীদেন'-দের চেয়ে কোটিগুণ অধিকতরই হইবে। যেহেতু, যীশু যে 'খৃষ্ট' এবং তিনিই যে একমাত্র ঈশ্বরের পুত্র এবং সকলের ত্রাণকর্ত্তা, তাহার সম্বন্ধে নীলিমাকে বহুদিন ধরিয়া বিশেষভাবে জ্ঞান দান করা হইয়াছে। যেহেতু, নীলিমা বিশেষভাবেই জানে যে, পিতৃ-পুরুষ দায়ুদ প্রবাচক ছিলেন এবং ঈশ্বর দিব্য-

পূর্ব্বক তাঁহার কাছে শপথ করিয়াছিলেন, তাঁহার ঔরসজাত একজনকে তাঁহার সিংহাসনে বসাইবেন, এই জন্য তিনি পূর্ব্ব হইতে দেখিয়া খৃষ্টের পুনরুত্থানের বিষয়ে এই কথা কহিলেন যে, তাঁহাকে পাতালে ফেলিয়া রাখা হইল না। তাঁহার মাংসও ক্ষয় পাইল না। এই যীশুকে ঈশ্বর উঠাইলেন, আমরা সকলে এ বিষয় সাক্ষী। অতএব ঈশ্বরের দক্ষিণহস্ত দ্বারা উন্নীত হওয়াতে এবং পিতার কাছে অঙ্গীকৃত পবিত্র আত্মা প্রাপ্ত হওয়াতে এই যাহা তোমরা দেখিতেছ ও শুনিতেছ, তাহা তিনি বর্ষণ কর্‌লেন। কারণ, দায়ুদ স্বর্গে আরোহণ করেন নাই; কিন্তু তিনি নিজেই বলেন,—'প্রভু আমার, প্রভুকে বলিলেন, তুমি আমার দক্ষিণে উপবেশন কর, যে পর্য্যন্ত আমি তোমার শত্রুগণকে তোমার চরণের পদাসন না করি, অতএব সমস্ত কুল নিশ্চয় জ্ঞাত হউক যে, যে যীশুকে ক্রুশে দেওয়া হইয়াছিল, তাঁহাকেই ঈশ্বর প্রভু খৃষ্ট উভয়ই করিয়াছেন।'

মিস্ হর্ণ শাম্পানীর দ্বারের কাছে অগ্রসর হইয়া আসিয়া পুনশ্চ কহিলেন, "মন পরিবর্ত্তন কর, এবং তোমাদের পাপবিমোচনার্থ তোমরা প্রত্যেকে যীশুখৃষ্টের নামে বাপ্তাইজ হও; তাহাতে তোমরা পবিত্র আত্মাদান প্রাপ্ত হইবে।"

নীলিমার সমস্ত অন্তর ভরিয়া এই শেষ কথাগুলারই প্রতিধ্বনি অনবরত তাহারই নিজের উভয় কর্ণে ফিরিয়া ফিরিয়া বাজিয়া উঠিতেছিল,—"তোমাদের পাপবিমোচনার্থ তোমরা যীশুখৃষ্টের নামে বাপ্তাইজ হও * *" যদি বাস্তবিকই সেই ঘোরতররূপ অনন্ত নরকজ্বালা হইতে মুক্তিলাভান্তর ইহাতে অনন্তকালের জন্য সুখসেব্য স্বর্গবাস ঘটে তবে কেনই বা সে "যীশুখৃষ্টের নামে বাপ্তাইজ" না হইবে? মিসেস্ 'শুঁই বলিয়াছেন, "অবিশ্বাসীর আত্মাকে সহস্রকোটি বিষাক্ত কীট সহস্র

সহস্র কোটি বর্ষ ধরিয়া প্রতিনিয়ত কুরিয়া কুরিয়া কাটিয়া কাটিয়া খাইতে থাকিবে; কাহারও সাধ্য নাই যে, সে দুর্দশার হাত হইতে তাহাকে রক্ষা করিতে পারে! ইহার উপায় একমাত্র যিশু।"

নীলিমার মায়ের মুখ মনে পড়িয়া গেল। মা'র কথা মনে হইল। মা, তার স্নেহময়ী মা, তিনি যে সামান্য একটু মাথা ধরিলে কতই না ব্যাকুল হইয়া, সেটুকু ক্লেশ হইতে তাহাকে উদ্ধার করিতে সচেষ্ট হয়েন, আর ঐ অত বড় বিপাকের মধ্যে তাহাকে ডুবিতে দেখিয়া সেই মা কি কখন নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে পারিবেন? কখনই না, কখনই না—মা তাহাকে নিশ্চয়—নিশ্চয়—সেই অন্ধতমসাচ্ছন্ন, ঘৃণিত ও বিষাক্ত কৃমিকীটে পরিপূর্ণ, গলিত ময়লায় শ্বাসরোধকারী দারুণ দুর্গন্ধে ভরা নরককুণ্ড হইতে, গলিত লৌহের তরল অগ্নির ভীষণ আধার হইতে নিশ্চয়—নিশ্চয় রক্ষা করিবেন। অসম্ভব, নীলিমার এ দুরবস্থা তার মা থাকিতে ঘটা একান্তই অসম্ভব! মা'র কাছে কোনমতে এই মুহূর্তেই গিয়া পৌঁছিতে তার সমস্ত মনপ্রাণ ও ইন্দ্রিয়বৃত্তি সকল একান্ত উন্মুখ হইয়া উঠিল। অথচ কি ধীরমন্থর গতি ওই বলদ দুইটার পায়ে, আর সেণ্টপিটার্স মিশন স্কুল হইতে নীলিমাদের বাড়ীর রাস্তাটাও কি না তেমনই বিষম দীর্ঘ!

বাড়ী ফিরিয়া এক রকম ছুটিয়া উপরে উঠিতে উঠিতে নীলিমা উচ্চকণ্ঠে ডাকিয়া উঠিল—"মা!"

অধীর ও উদ্‌গ্রীব আগ্রহে মায়ের ঘরের দিকে ছুটিয়া চলিল। কিন্তু এ কি! নীলিমার সকল ব্যগ্রতাই যে সহসা ঘোর নৈরাশ্যের তীরে আছাড় খাইয়া পড়িল! এ অসময়ে তার মায়ের ভাঁড়ার ঘরের মধ্য হইতে তাহার পিতার কণ্ঠের সাড়া আসিতেছে কেন? নীলিমা সহসা নিজের অনন্ত নরকযন্ত্রণায় ভয়াবহতা বিস্মৃত হইয়া গিয়া তাহার মায়ের 'আসন্ন

কোন বিপৎপাতের সভয় কল্পনায় শুষ্ক হইয়া উঠিল। নিশ্চয়ই কোন কিছু অঘটন না ঘটিলে এ সময় তাহার পিতাকে ইটখোলার তদারক ফেলিয়া এখানে টানিয়া আনে নাই। তার উপর তাঁর ভাণ্ডারগৃহ প্রবেশেই যে মস্ত বড় একটা বিপদের সূচনা করিতেছে। নীলিমা স্রোতো-হৃত কুসুমদামের মতই সেইখানে নিশ্চল হইয়া রহিল এবং সেখান হইতেই সে এই কথাগুলি শুনিতে পাইল।

"বল কি তুমি গিন্নি! ছোঁড়াটাকে ত আজ বছর চারেক হ'তে চল্লো ভুবোন রায় পুষছে, তোমার বাড়ীমুখো হ'তে দেয় নি,—বাড়ীতে থাক্‌বার মধ্যে ত তুমি আর তোমার মেয়ে, আর ঐ দাসী মাগী এক বেলায় দু মুঠো খায়, আর আমার কথা ছেড়েই রাখ না কেন, আমি ক'টাই বা ভাত মুখে দিই? রাত্রে ত গোনা সাতখানা রুটীর বেশী যদি কখনও নিয়ে থাকি ত বড় জোর—দু'খানা। তা ঐতেই তোমার মাসকাবারের দু দিন আগে চাল, গম, নুণ, আলু সব কিছু ফুরিয়ে গেল! কি হয় বল দেখি?"

নীলিমা তাহার মায়ের মুখ হইতে এই রূঢ় প্রশ্নের কোন সঙ্গত বা অসঙ্গত উত্তরই শুনিতে পাইল না। অপ্রাপ্ত উত্তরের জন্য ক্ষণকাল সময়ক্ষেপ করিয়া তাহার পিতাই পুনশ্চ আরম্ভ করিলেন,—"নিশ্চয়ই চাল-টাল নিয়ে কিছু করা হয়ে থাকে, নিশ্চয়ই কোন কিছু হয়।—না হ'লে বলি, দুটো মানুষের পেটে তো আর সত্যিই রাক্ষস ঢোকেনি? সব যায় কোথায়? ভাল কথা, ধোপার হিসাবে যে এবার দেখছি সাতখানা ধুতী লিখে রেখেছ, আবার রুমাল একখানা রয়েছে, তার মানেটা কি? এক ধোপে তিন তিনখানা ধুতী প'রে বাহারটা দিলেন কে শুনি? রুমালখানা কার? তোমার না কি?"

নীলিমার বুক ঢিপ্ ঢিপ্ করিতে লাগিল। শেষ কথা কয়টা তাহার

মা'র উদ্দেশ্যে তাহার পিতা যে স্বরে যে শ্লেষের ভাবে উচ্চারণ করিলেন, তাহাতে তাহার মনের মধ্যে মা'র জন্য একটা দারুণ অপমানের আঘাত লাগিল। তাহার চিরসহিষ্ণুশীলা সর্ব্বত্যাগিনী মায়ের প্রতি এ শ্লেষের বিদ্রূপ কাহারও পক্ষেই যে অশোভন! অথচ তাহার বাবা খুব নিশ্চয় করিয়াই জানেন যে, এ রুমাল কাচান কার।

এবারও স্বর্ণলতার নিকট হইতে কোন কৈফিয়ৎ আদায় করা গেল না। তিনি যথাপূর্ব্ব মৌনী হইয়াই রহিলেন। নীলিমা অর্দ্ধমুক্ত দ্বারপথে তাঁহার স্তব্ধ নির্ব্বাক্ প্রস্তরমূর্ত্তির একটা অস্পষ্ট আভাস দেখিতে পাইতেছিল। তাঁহার পাতলা ও শুষ্ক ঠোঁট দুখানি পরস্পরে এমনই আঁটিয়া রহিয়াছে যে, দেখিলে মনে হয়, বুঝি বাটালীর চাড় না দিয়া উহাকে আর এ জন্মে খুলিতে পারাই যাইবে না। নীলিমা কণ্ঠোত্থিত দীর্ঘশ্বাস সাবধানে নিরোধ পূর্ব্বক ঈষৎ সরিয়া দাঁড়াইল।

পূর্ব্বে শুনা গিয়াছিল, 'বোবার নাকি শত্রু নাই!' কিন্তু এ ক্ষেত্রে ঐ প্রবচনটির মর্য্যাদা আদৌ রক্ষিত হইল না, স্বর্ণলতার সহিষ্ণুতাপূর্ণ মৌনতার সকল সম্মানকে তুচ্ছতর করিয়া দিয়া অনুকূলচন্দ্রের হিংস্র ও কুটিল কণ্ঠ তীক্ষ্ণ শ্লেষের সহিত উচ্চারণ করিল—"বল না? কথা কইছো না কেন? বল? কোন্ রাণীধীরাণী মহারাণীর ধোপে দু'খানা কাপড়ে কুলোয় না? আবার রুমাল দিয়ে মুখ মোছবার দরকার হয় কার? এত যাঁর সখ, তাঁকে বলো, নিজে যেন গিয়ে তিনি টাকা রোজগার ক'রে আনেন। তার বাবা শালা তো আর চোর দায়ে ধরা প'ড়ে যায় নি যে, বারমাস পাতর পাতর খাবার ভাত জোগাবে, কাপড় জোগাবে, আবার রুমাল জোগাবে এবং তার কাচাই জোগাবে। তিনখানা কাপড় কেন পরা হয়েছিল শুনি? রুমালই বা জুটলো কোত্থেকে?"

স্বর্ণলতার সেই প্রস্তরগঠিতবৎ মূর্ত্তির সেই পরস্পরসংযুক্ত ওষ্ঠাধর

এবার ঈষৎ কম্পিত হইল এবং উহার মধ্য হইতে ধীর ও শান্তভাবে উত্তর বাহির হইয়া আসিল—"স্কুলে প্রাইজের দিন পরবে ব'লে একখানা আধময়লা সাড়ী বেশীর ভাগ কাচিয়ে নিয়েছিলেম।"

"বিবি বেসান্তের জন্যে! তাই বল! তা সেজে গুজে পরীটি হয়ে তিনি তো দিব্যি স্কুল-ঘর কর্‌চেন, একটা বরও তো কই এখন পর্য্যন্ত জোগাড় করবার নামটী নেই! কি হলো তা হ'লে, আর তাঁকে এতদিন ধ'রে লেখাপড়া শিখিয়ে টিখিয়ে লায়েক ক'রে—যদি নিজের একটা হিল্লে লাগিয়ে নিতেই না পারলেন?"

নীলিমার পায়ের আঙ্গুলের ডগা হইতে মাথার চুলের গোড়া পর্য্যন্ত যেন একটা ভীষণ লজ্জার প্রভাবে শিহরিয়া কণ্টকিত হইয়া উঠিল। তাহার শরীরের রক্তে সেই অকথ্য লজ্জার জ্বালা যেন আগুন হইয়া ধোঁয়াইয়া উঠিতে লাগিল। দাঁত দিয়া সে এমনই জোরে নিজের ঠোঁট কামড়াইয়া ধরিল যে, তাহাতে তাহার ঠোঁট কাটিয়া রক্ত পড়িল।

তাহার মায়ের মুখ সে এখন আর দেখিতে পাইল না বটে, কিন্তু তিনি যে এত বড় নির্লজ্জ অপমানেরও পর একটিমাত্র প্রতিবাদ করিলেন না, ইহাতে তাহার বাপেরও চেয়ে মায়ের প্রতিই অধিকমাত্রায় ক্রোধ ও অভিমান জাগিল। এ কি অন্যায় চুপ করিয় থাকা! সংসারে স্বামীই কি সব? মেয়ে কেউ নয়? বাপ হইয়া মেয়েকে এমন দুরন্ত অপমানটা করিলেন; অথচ ইহার প্রতিবাদ করিবার জন্য একটিমাত্র জিহ্বাও নাড়ল না? নীলিমা না হয় মেয়ে হইবার অপরাধে এও সহ্য করিবে, কিন্তু তাহার মায়ের ত উচিত ছিল, তাহার হইয়া দুইটা কথা বলা! তবে কি মা'ও আর তাহাকে আগের মতন যথেষ্ট ভালবাসেন না? তাই বা কেমন করিয়া বলা যায়? মা তো কখন নিজের কেও অপমানের চূড়ান্ত হইয়াও মুখ খোলেন না? তবে কি মিসেস গুঁইএর

কথাই ঠিক ? তিনি যে বলেন, হিঁদুর মেয়েরা কেবল লাথি-ঝাঁটা খাবার জন্তই জন্মিয়াছে। তাহারা ক্রীতদাসীর চাইতেও অধম, পালিত পশুর অপেক্ষাও অধীন এবং পোষা কুকুরের হইতেও প্রভুপদানত ! তা মিথ্যাই বা কি ? তাহার মায়ের যে অবস্থা সে আজন্ম ধরিয়া প্রত্যক্ষ করিয়া আসিতেছে, সে আর এই মিসেস গুঁইএর বর্ণনা হইতে বিশেষ প্রভেদটা কি ? এই হিন্দুর মেয়ের জীবন ? জীবন্তেই ত তাহাদের নরকের দ্বারে বসিয়া কাটাইতে হয়, মরণের পরে যে নরকে যাইতে হইবে, সে আর এমন বিচিত্র কি ? না, এর চেয়ে নিশ্চয়ই খৃষ্টধর্ম্ম ভাল। কিন্তু খৃষ্টও তো পুরুষকে "স্ত্রীজাতির মস্তক" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন ?

ঘরের মধ্য হইতে অনুকূলের কণ্ঠস্বর শোনা গেল—"দেখ, ও সব নবাবী আমার ভাত খেয়ে চল্‌বে না, তা তোমাদি'কে এই স্পষ্ট ক'রেই আমি ব'লে দিচ্ছি। এক ধোপে তিন তিনখানা কাপড় কাচান ? আমার বাপ কখন এমন কথা কানে শোনেনি ! তা আবার একটা ধুম্বোধাড়ী মেয়ের জন্তে ?—গিছি আর কি ! আর দেখ, চালটালগুলোও একটু কম ক'রে খরচ করো, আমি কি শেষে তোমাদের জন্তে সিঁদকাঠি নিয়ে সিঁদ কাট্‌তে যাব নাকি ? পাব কোথায় ? আচ্ছা, আমায় আবার এখুনি ইটখোলায় ফির্‌তে হবে। দাও দেখি এক গেলাস খাবার জল, পেটটায় কেমন খিদে খিদে বোধ হচ্চে। পেট ভরে জলটা খেয়ে যাই।"

নীলিমা ধীরে ধীরে সেখান হইতে অপসৃত হইয়া চলিয়া গেল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

নীলিমার মনের মধ্যে একটা ভীষণ বিদ্রোহের ঝড়ের হাওয়া অবিরল বেগেই বহিতে থাকিল। মন তাহার পিতৃ-অবিচারের আঘাতে আঘাতে ক্রুদ্ধ, ক্ষুব্ধ ও ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিল। পূর্ব্বসঞ্চিত যতটুকু সম্বল—যতটুকু বিবেকবুদ্ধি তাহার জমা করা ছিল, সেই সামান্য সঙ্গতির পুঁজি লইয়া সে এই প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীর দুর্দ্দম আক্রমণকে প্রতিরোধচেষ্টা যে করে নাই, তাও নয়; কিন্তু বিরুদ্ধ পক্ষের অজস্র শরক্ষেপে সে দুর্ব্বল চেষ্টা কোথায় যে ভাসিয়া গেল, তার খবরই রহিল না, শেষকালে নিজের কাছেই সে নিজে পরাস্ত হইয়া এই সিদ্ধান্তই স্থির করিয়া ফেলিল যে, হিন্দুধর্ম্মে কিছুই সার নাই এবং হিন্দুধর্ম্মের উপাসক যাহারা, তাহাদের মধ্যটাও অতএব অসার হওয়াই স্বাভাবিক এবং ইহার প্রমাণ তাহারই বাপ-মা। হিন্দু স্বামীর কর্ত্তব্যজ্ঞান ও ধর্ম্মবুদ্ধি যে কত বড় নিষ্ঠুরতা ও স্বার্থপরতার উপর সংন্যস্ত, তাহা সে আজন্ম ধরিয়াই দেখিয়া আসিয়াছে, আর হিন্দুনারীও যে পুরুষের হাতের কত বড় খেলার পুতুল, তাহাও তাহার এক দিনের দেখা নয়। এই হিন্দুসমাজে স্বামী স্ত্রী সম্পর্ক! এই হিন্দু-পুরুষের কর্ত্তব্যজ্ঞান, এই হিন্দু স্ত্রীর পাতিব্রত্য! এই যদি হিন্দু হওয়ার ফল হয়, অমন হিন্দুত্বে জলাঞ্জলি দেওয়াই সহস্রবার ভাল। তাহার মায়ের যে জীবন সে নিত্য প্রত্যক্ষ করিতেছে, একটা পাশবদ্ধ জন্তুর জীবনের অপেক্ষা সে জীবনের প্রভেদ কতটুকুই?

কিন্তু হিন্দু-সমাজের সকল পুরুষই কি তাহার পিতার মত হৃদয়হীন? সব নারীই কি তাহার মায়ের মত চির-অত্যাচার-পীড়নে জড়পিণ্ডে

পরিণত ? এ কথাটাও নীলিমার বিদ্রোহবিষে জর্জ্জরিত বিষিষ্ট চিত্তে যে উদিত হয় নাই, তা নয়। কিন্তু ইহার সমাধান সে তাহার নিজের স্বল্প অভিজ্ঞতার মধ্যে কোথাও খুঁজিয়া পাইল না। তাহার পিতার অভদ্র আচরণে তাহাদের বাড়ীতে সংরের কোন ভদ্রপরিবারের মেয়েদের আসা যাওয়া কোন দিনই থাকিতে পায় নাই। বিশেষ কোন বড় সমারোহকার্য্যের নিমন্ত্রণ কদাচিৎ আসিলে লৌকিকতা দিবার ভয়ে অনুকূলচন্দ্র স্ত্রীকন্যাকে সে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে দিত না। সহপাঠীদের বাড়ীতে কদাচিৎ কোন কিছু উপলক্ষ্যে সে দু'তিনবার নিমন্ত্রণ খাইতে গিয়াছে। সেইটুকুই তাহার হিন্দুসমাজের সহিত পরিচয়। সেখানেও সে খুব বেশী উন্নত ভাব প্রত্যক্ষ করে নাই। তাহা ভিন্ন বাড়ীর আশেপাশের হিন্দু নামধেয় অন্ত্যজজাতীয় স্ত্রীপুরুষের কলহ-কাকলিত উচ্ছৃঙ্খল জীবনের কতকটা আভাস তাহার চোখে পড়িয়াছে। প্রকৃত হিন্দুর কি আশয়, কি আচরণ, সে সকলের কোন ধারণাই সে কোন দিন পায় নাই। আজ নিজের সেইটুকু সঞ্চয়কে লইয়াই সে হিন্দুনারীর অবস্থা, তাহাদের আচার-ব্যবহার, তাহাদের আশা আগ্রহ এই সমুদয়ের বিশ্লেষণ করিতে বসিয়া সে সেখানেও কোন কিছু একটা বড় জিনিষকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিল না। নিমন্ত্রণ-গৃহে সে হিন্দুনারীকে অপরের পাতে মাছের মুড়া পড়িতে দেখিয়া নিজেকে খর্ব্ব বোধে অভিমানভরে ছল ধরিয়া অনাহারে উঠিয়া পড়িতে দেখিয়াছে; পতিবাসিনীর অঙ্গে অলঙ্কারপ্রাচুর্য্য দেখিয়া নিজের কপালের ও অলঙ্কার প্রদানে অসমর্থ 'পোড়ামুখো' মিনষের প্রতি অজস্র গালিবর্ষণ করিতে শুনিয়াছে, নিমন্ত্রককে বস্ত্রালঙ্কারের জাঁকজমক দেখিয়া দেখিয়া আদর আপ্যায়নের তারতম্য করিতে দেখিয়াছে। কোন উচ্চ রাজকর্ম্মচারীর, বর্ষীয়সী পত্নীকে তাঁহার দরিদ্র প্রতিবেশিনী সম্বন্ধে তীব্র ঘৃণার সহিত বলিতে

শুনিয়াছে—"কেরাণী-ধ্যারাণীদের বউয়ের সঙ্গে আমি কথা কইনে।"—তবে এই কি হিন্দুর সমাজ? হিন্দুনারীর কি এই সঙ্কীর্ণ শিক্ষা? অথবা ইহা ভিন্ন তাহাদের আর উপায়ই বা কি? পুরুষ তাহাদের কণ্ঠে চরণে লৌহনিগড় বদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে নিজেদের সেবাদাসী মাত্র করিয়া রাখিয়াছে, কেমন করিয়া মুক্তবায়ুজাত বিশুদ্ধ জীবনের সহিত তাহারা পরিচিত হইতে পারিবে? মানবজীবনের প্রকৃত সার্থকতা কোথায়, তাহার কোন সংবাদই কি তাহাদের সীমাবদ্ধ সঙ্কীর্ণ গণ্ডীঘেরা জীবনের মধ্যে প্রবেশপথই পাইয়াছে? দু'খানা গহনা পড়িয়া নিমন্ত্রণ বাড়ীর বড় মাছের মুড়াটাকে উপভোগ করিতে পাওয়াই বোধ করি তাহাদের হিসাবে নারীজীবনের চরমপ্রাপ্তি!

নীলিমার চিত্ত একটা গভীর ব্যথায় আচ্ছন্ন হইয়া রহিল। নিজের ধর্ম্মসমাজকে অপরের সহিত তুলনায় অত নীচে নামাইয়া দিতে বুকে তাহার কাঁটা ফুটিতেছিল, অথচ তা ভিন্ন আর কোন পথই সে দেখিতে পাইল না। তাহাদের স্কুলের মেয়েরা—মিসেস গুঁই, মিসেস গুঁইএর সতীনঝি মিস্ এনা সরকার, সে মধ্যে মধ্যে তাহাদের মিশন স্কুলে বেড়াইতে আসে; এমন কি, তাহাদের অরফ্যানেজের হিন্দুস্থানী মেয়েগুলা, দাইরা শুদ্ধ কেমন সতেজ, কেমন স্বাধীন, কেমন সুখচঞ্চল ও আত্মনির্ভরশীল! তাহার মা অকারণে তাহার বাপের কাছে কি অকথ্য লজ্জাকর লাঞ্ছনায় লাঞ্ছিতা হইয়াও ঘৃণ্য অপরাধীর মত নীরবে নির্ব্বিবাদে সে লাঞ্ছনাকে বুকে তুলিয়া লইতেছেন, এমন কি, নিজের মেয়ের প্রতি হীন অবিচারকে পর্য্যন্ত এতটুকু প্রতিবাদ করিবার সাধ্য বা শক্তি তাঁহার নাই, অথচ খৃষ্টান স্কুলের একটা ক্ষুদ্র টিচারও সে দিন 'বড়মেমের' নিকট গালি খাইয়া আদালতে যাইবার ভয় দেখাইল। না; হিন্দুত্বে পুরুষত্ব নাশ করে, নারীত্ব জড়ত্বে পরিণত হয়, মনুষ্যত্ব পশুত্বে অবনত হইয়া

পড়ে। এমন ধর্ম্মকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করিতে যাওয়া প্রবল মিথ্যাকে নির্লজ্জ-ভাবে প্রশ্রয় দান, নীলিমা মিথ্যাকে—ছলনাকে একান্তমনে ঘৃণা করে। সে যাহাকে নিকৃষ্ট বোধ করিয়াছে, তাহার আশ্রয় গ্রহণ কখনই করিবে না। এবার অন্তরের সহিতই সে মিসেস শুঁই ও মিস হর্ণের কাছে স্বীকার করিবে যে, খৃষ্টধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ, সে যীশুখৃষ্টকেই মানিবে। দেবতার পূজা মনে মনেও আর করিবে না।

রাত্রে মায়ে ও মেয়েতে এক বিছানায় শুইত। নীলিমার যত কিছু মনের কথা এই সময়েই সে তাহার মায়ের কাছে সেগুলি নিবেদন করিয়া দিত। স্বর্ণলতা যথাসাধ্য তাহার প্রশ্নের সমাধান করিয়া তাহাকে বুকে টানিয়া লইতেন। ঘুমাইবার পূর্ব্বে নিজের কপালে মায়ের নীরস অধরের একটি স্নিগ্ধস্পর্শ সে প্রাণপণে কামনা করিত, যদি কোন দিন গভীর চিন্তার ভারে আচ্ছন্নচিত্তা মাতা সেটুকু দান করিতে ভুল করিতেন, পাওনাদার তাঁহাকে রেহাই দিত না। 'আঃ, মা! আজ আর আমার ঘুম হবে না দেখ্‌ছি।' বলিয়া মা'র কোল ঘেঁষিয়া আসিত। তাহাতেও কার্য্য হাঁসিল না হইল ত অভিমানভরে 'তোমার আজ কি হয়েছে মা? মাঃ, কি যে করছো?' এমনই করিয়া নিজের দিকে তাঁহার বিক্ষিপ্ত চিত্তটিকে আকর্ষণ করিয়া আনিয়া নিজের প্রাপ্যটুকু সে অনাদায়ী ফেলিয়া রাখিত না। বিশেষ করিয়া ধরিতে গেলে সমস্ত রাত্রিদিনের এইটুকুই তার প্রধানতম সম্বল। এ ভিন্ন আর মায়ের কোল, মায়ের আদর, মায়ের স্নেহ উপভোগ করিবার অবসর সে আর ভাল করিয়া কখন্ পায়? ভোরে উঠিয়াই মা তাহার ঘরের কাযে লাগিবেন, সে যতটুকু সাধ্য সে সম্বন্ধে তাঁহার সাহায্যে লাগিবে, তার পর নাকেমুখে ভাত গুঁজিয়া স্কুলে ছোটা, ফিরিবার অল্প পরেই প্রায় অনুকূলচন্দ্রের গৃহ প্রত্যাবর্ত্তনের কাল আসিয়া পৌঁছিয়া যায়। কারণ,

তেল পুড়িবার ভয়ে এ বাড়ীর লোকরা কখনই সন্ধ্যার পরে বিছানার বাহিরে থাকে না।

আজ বিছানায় ঢুকিয়াও নীলিমা নিজের চিন্তাধারাতেই ভাসিয়া চলিল, মা যে কতক্ষণে আসিলেন, সে তাহা ভাল করিয়া জানিতেও পারিল না। স্বর্ণলতা অন্য দিন বিছানার মধ্যে প্রবেশপথেই মেয়ের নিবিড় আগ্রহে ভরা বাহুবেষ্টনে বদ্ধ হইয়া থাকেন, আজ মশারি গুঁজিয়া নিজের বালিসে মাথা রাখার পরও মেয়ের কোন সাড়াশব্দ না পাইয়া কিছু বিস্মিত, কিছু আশাহত ভাবে ক্ষণকাল প্রতীক্ষা করিয়া থাকিবার পর মনে মনে এই সমাধান করিয়া লইলেন যে, সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

আজ অপরাহ্ণে নীলিমার মুখ দেখিয়া, তাহার শরীর যে আদৌ ভাল নাই, সে সম্বন্ধে তাঁহার মনের মধ্যে যথেষ্টই শঙ্কা ও সংশয় জন্মিয়া উঠিয়াছিল, তাই এখন শান্তভাবে নিদ্রা যাইতেছে মনে করিয়াই তাঁহার উদ্বেগশঙ্কিত ভীরু চিত্ত অনেকখানি স্বস্তি বোধ করিল। গভীরতর একটা দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করিয়া তিনি অপর দিকে ফিরিয়া শুইয়া অত্যন্ত সাবধানে শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ করিতে লাগিলেন, ভয়—পাছে অসুস্থ কন্যার নিদ্রাভঙ্গ হয়! নিজের অতৃপ্ত ক্ষুধিত ক্ষুব্ধ চিত্ত যে বুভুক্ষু হইয়াই আজ পড়িয়া রহিল, তাহার জন্য মনের মধ্যে কিছু কি ব্যথা জাগে নাই? কিন্তু সে জাগিলেই বা কি হইবে? স্বর্ণলতা ত নিজের বলিতে কোথাও কিছু বাকী রাখেন নাই। নিজের আশা-তৃষ্ণা, সুখ-দুঃখ, কিছুরই ত তাঁর বহিঃপ্রকাশ নাই। যা আছে, তা তাঁহার ঐ মৌন সুপ্ত, শান্ত বুকের অতলের মধ্যেই তলাইয়া আছে।

নীলিমার যখন মায়ের কথা মনে পড়িল, তখন তাহার বোধ হইল, মা তাহাকে তাহার চিরদিনের প্রাপ্য সেই সামান্য আদরটুকু পর্য্যন্ত না জানাইয়াই দিব্য নিশ্চিন্ত চিত্তে ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন! তাহার মনে

হইল, সে দিন যে মিস হর্ণ বলিতেছিলেন, 'এ দেশের লোকদের মনে 'ফিলিং' জিনিসটা আদৌ নাই। তারা এখনও সেই আদিম ভাবেই আছে,—এর অর্থ তাহাদের মধ্যে সম্যক্‌রূপে জ্ঞানের বিকাশ নাই, তাই অন্যের মন বুঝিয়া মনের বিনিময় করিতে তাহারা জানে না; শুধু প্রতিপালিত জীববিশেষের মত গতানুগতিকভাবে চলিতে বা আদেশ পালন করিতে পারে।' তা এ কথাগুলার মধ্যে বুঝি আদৌ মিথ্যা বা অতিরঞ্জন দোষ নাই। সে দিন সে যে মিস হর্ণের প্রতি ইহার জন্য মনে মনে অতিমাত্রায় রুষ্ট হইয়াছিল, তার জন্য তাহার অনুতপ্ত হওয়াই উচিত।

সে দিন স্কুলে গিয়া সে মাথা ঝুঁকানর পরিবর্ত্তে হিন্দুস্থানী ও অন্য কয়জন বাঙ্গালী সহপাঠিকাদের দৃষ্টান্তে হাঁটুগাড়িয়া বসিয়া মিসেস গুঁইকে নমস্কার করিল। যীশুর গান সে এত দিন মুখেই উচ্চারণ করিত, সে দিন প্রাণ দিয়া গাহিল, তার পর জিজ্ঞাসিত হইবার পূর্ব্বেই মিসেস গুঁইএর সামনে আসিয়া আপনা হইতেই বলিয়া বসিল, "আজ থেকে আমি আর দেবদেবী মানি না, একমাত্র যীশুখৃষ্টকেই এবার থেকে মানলুম।"

তাহার কণ্ঠস্বরের দৃঢ়তায় মিসেস গুঁই কিছু বিস্মিত ভাবে তাঁহার মিটমিটে চোখ চশমার পরকলার মধ্য দিয়া তীক্ষ্ণ করিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন। মুখে তাহার অস্বাভাবিক কিছু দেখা না গেলেও সেখানে যে গলার স্বরের সহিত একটা সামঞ্জস্য সুরক্ষিতই রহিয়াছে, সেটা সেই ছেলে-ধরা কার্য্যে বিচক্ষণা মহিলাটির বুঝিতে বাকী থাকিল না। তিনি অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া উঠিয়া উহাকে নিজের ছিটের গাউনের পকেট হইতে বাহির করিয়া একটা চকোলেট হাত বাড়াইয়া দিয়া বলিলেন, "এই নে'। একটা চকোলেট খা' দেখি।"

নীলিমা সেটা লইয়া একবার ইতস্ততঃ করিল, বারেক তাহার মুখখানা

রাঙা হইয়া উঠিল। তার পর সে হঠাৎ কঠিন দৃঢ় হইয়া উঠিয়া সেটা টপ্ করিয়া নিজের মুখের মধ্যে ফেলিয়া দিল। ইহার পূর্ব্বে তৃষ্ণায় গলা শুকাইয়া কাঠ হইলেও সে কোন দিন স্কুলের মধ্যে দাঁড়াইয়া এক চোক জলপান পর্য্যন্ত করে নাই।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

নীলিমার এইবারে কপাল ফিরিল।

মিসেস গুঁই তাহাকে শুভদৃষ্টিতে দেখিতে আরম্ভ করিতেই মিস হর্ণ, মিস বিল্, মাদাম পিয়ী সকলেরই নিকট হইতে অল্পবিস্তর কৃপা তাহার প্রতি অযাচিতভাবেই ক্ষরিত হইতে লাগিল। মিস হর্ণেরই এ বিষয়ে উদ্যম ও অধ্যবসায় পূর্ব্বাপর অধিক ছিল; এখন তাহা মাত্রাতিক্রমেরই উপক্রম করিল। মিসেস গুঁইএর মুখে কি সমাচার লাভ করিয়াই তিনি সে দিন প্রায় শ্বাসরুদ্ধাবস্থায় রক্তবর্ণ মুখে ছুটিয়া আসিলেন। হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিয়া উঠিলেন—

"নেল্! ইহা কি সুসমাচার! তুমি যীশস্ ক্রাইষ্টের প্রতি বিশ্বাসী হইয়াছ? ইহা কি সত্য?"

নীলিমা বাইবেলের পৃষ্ঠা হইতে দৃষ্টি না তুলিয়া তেমনই নতমুখে মাথা হেলাইয়া নিজের এ বিষয়ে সম্মতি জ্ঞাপন করিল।

"ইজ নট্ ইট্ গ্লোরিয়াস্!" (ইহা প্রশংসার্হ)

"তুমি এখন যীশস্ ক্রাইষ্টেব পবিত্র নামে বাপ্তাইজ হইতে সম্মত আছ, আশা করি।"

নীলিমার শরীরের প্রতি শিরা, প্রত্যেক লোমকূপ যেন এই প্রস্তাব-মাত্রেই একটা অননুভূতপূর্ব্ব আতঙ্কের শিহরণে শিহরিয়া খাড়া হইয়া উঠিল। বক্ষশোণিতের সবল ধারা যেন অকস্মাৎ বাধাপ্রাপ্ত স্রোতহত নদীবক্ষের মতই স্তব্ধ ও অচল হইয়া পড়িল। তাহার চক্ষুতে দৃষ্টি স্থির রহিল, অথচ সে যেন তাহা দিয়া তাহার সম্মুখবর্ত্তিনী বিদেশিনী প্রশংসাভি-

কার শুভ্র মূর্ত্তি সুস্পষ্টভাবে আর দেখিতে পাইল না। ঠোঁট খুলিয়া সে কি যেন একটা সম্মতিসূচক বাক্য বলিতে গেল, কিন্তু ভিতর হইতে তাহার সর্ব্বদেহমনের নিদারুণ দৌর্ব্বল্য তাহার জিহ্বা তালু ওষ্ঠাধর সকলকেই এমনই অবশ ও অ-বল করিয়া রাখিল, যাহাতে করিয়া এতটুকু শব্দও তাহারা বাহিরে আনিতে তাহাকে সহায়তা করিল না। রক্তচিহ্নহীন পাংশু ও ক্ষীণ ওষ্ঠ বারেক কম্পিত হইয়াই থামিয়া গেল।

মিস হর্ণ পুলকিতচিত্তে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে শীকার-করা পাখীর মত তাহার বিবর্ণ স্তব্ধ মুখের দিকে চাহিয়া ছিলেন, একটু বুঝি মায়া হইল। কাছে আসিয়া পিঠে হাত বুলাইয়া, মাথায় হাত দিয়া স্নেহকণ্ঠে বলিলেন, "মাই গার্ল! নিজেকে অশান্ত করিও না, কিছু দিন সময় লও। যীশস্ ক্রাইষ্টকে মনে মনে পূজা কর, তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ কর,—যেমন একটি ভেড়ার ছানা। আমি তোমায় অন্তরের সঙ্গেই এ বিষয়ে সাহায্য করব। কয়েক দিনের মধ্যেই তুমি নিজে বুঝিতে পারিবে যে, 'বিলিভার' হইয়া তুমি এ সংসারেই কত উন্নতি করিতে পারিবে। অন্য জগতের কথা ত দূরের, এ জগতেই বা তুমি 'আন্‌বিলিভার' থাকিয়া কি পাইয়াছ?

নীলিমার রক্তহীন, বর্ণলেশশূন্য শুভ্র মুখ ত্বরিত শোণিতোচ্ছ্বাসে সিন্দূর-রাঙ্গা হইয়া উঠিল। তাহার অবসাদ-অবসন্ন সমুদায় স্নায়ুপেশী যেন নবীন জীবনীশক্তির পুনরভ্যুদয়ে জীয়ন্ত ও সতেজ হইয়া উঠিল। তাহার সংসার সুখভোগে অপরিতৃপ্ত, তৃষিত মনপ্রাণ যেন ওই তীব্র প্রলোভনবাক্যের যাদুযষ্টিস্পর্শে ক্ষণেকের মধ্যেই নিজের সমুদায় অতীতটাকে সুখহীন, স্নেহহীন, আশাহীন ও নিরানন্দবোধে উহাকে পরিত্যক্ত পুরাতন সর্প-নির্ম্মোকের মতই বিদায় দিয়া নব নব আশাজালে বিজড়িত ও নবীন সুখোদ্দীপনায় পরিপূর্ণ নূতন জীবনকে, সমুজ্জ্বল ভবিষ্যৎকে সাগ্রহে স্বাগত জানাইতে চাহিল। ঐ কয়টি বাক্যের প্রতিধ্বনি তুলিয়া তাহার উৎ-

পীড়িত অভিমানী চিত্ত বিদ্রোহ করিয়া জবাব দিল—সত্যই ত, পরলোকের কথা ত অনেক দূরের—ইহলোকেই বা সে কি পাইয়াছে, কি পাইতেছে? কি পাইলে সে তাহার গৌরবে, তাহার বন্ধনে, তাহার আশ্বাসে ইহাদের দান তাহার চিরজীবনের সুখ সৌভাগ্য ঐশ্বর্য্য গৌরব, পরজীবনের অটুট শান্তি সব ত্যাগ করিতে পারে? মায়ের বুকে তাহার জন্য স্নেহের সঞ্চয় নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু সেই নিরুপায় ব্যর্থ স্নেহ, যাহা স্নেহপাত্রকে অকথ্য অপমান হইতেও এতটুকুও রক্ষা করিতে অসমর্থ, তাহা থাকিলেই বা লাভ কি, আর না থাকিলেই বা ক্ষতি কতটুকু? তাহার পর বাপ? তাহার কথা মনে পড়িতেই নীলিমার সর্ব্বশরীরে যেন একটা টান ধরিল, বুকে একটা প্রবল চাপ বোধ হইল। ঐ পিতার কন্যা হইয়া থাকার চেয়ে তাহার আর সব কিছুই হওয়াই ভাল। ঐ পিতার আশ্রয় অতীত ও বর্ত্তমানে যাহাই হউক, ভবিষ্যতে তাহার ভাগ্যে আরও যে কিছু আছে, তাহার ঠিকানাই বা কি? তাহার মা যে জীবন চিরদিন ধরিয়া বহন করিতেছেন, সে জীবনের স্মৃতিতেই যে নীলিমার হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। পিতার নির্ব্বাচনে একান্ত শস্তার দরে, খুব সম্ভব ঐ দরেরই কেহ নীলিমাকে ক্রয় করিয়া লইবে, তাহাদের শ্রোত্রীয় শ্রেণীর চক্রবর্ত্তীর ঘরে পয়সা লইয়া মেয়ে বেচারও ত প্রথা আছে। অতএব ভবিষ্যতের দড়ী-কলসীর চাইতে এদের আশ্রয় কি শ্রেয়: নয়? মরণের চাইতেও কি খৃষ্টান বেশী পর? তাহার বুকের রক্ত—জমাট বাধিয়া ওঠা রক্ত—ফেনাইয়া ফেনিল হইয়া উঠিল। সে অস্থির অথচ সুদৃঢ় কণ্ঠে উত্তর করিল, "বাপ্তাইজ আমি হ'বো; কিন্তু তার পূর্ব্বে আমি ভাল ক'রে শিখতে চাই। আমায় ইংরেজী বাইবেল ভাল ক'রে পড়াতে হ'বে। আমার শিক্ষার যাতে উন্নতি হয়, তার ব্যবস্থা আপনাকেই করতে হ'বে। তার পর আমি বাপ্তাইজ হবো।"

এত কথা ও এমন কথা সে যে কেমন করিয়া এত সহজে বলিয়া গেল, সে যেন তাহার পক্ষে একটা ইন্দ্রজাল বা স্বপ্ন কিন্তু বলিতে পারিয়াই সে বিস্ময়ের সঙ্গে সঙ্গেই অপরিসীম তুষ্ট ও তৃপ্ত হইল। তাহার এ কথা বলিবার প্রয়োজন ছিল এবং বলিতে পারার শক্তিসঞ্চয়ের জন্যই যে সে তাহার এই ভীরু দুর্ব্বল নিরুপায় জীবনের সমস্তটাকে বদল করিতে চায়। সে দিনের ইচ্ছামাত্রেই যে এই আত্মপ্রকাশের সামর্থ্য তাহার মধ্যে দেখা দিয়াছে, ইহাতে সে ভবিষ্যৎকে খুবই উজ্জ্বল ও সুন্দর বলিয়া কল্পনা করিল।

মিস হর্ণ যে তাহার প্রস্তাবে তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন, তাহা বলাই বাহুল্য এবং এই শুভ-সন্দেশ সঙ্গীনীদের বাঁটিয়া দিবার জন্য ক্ষিপ্রচরণে প্রায় ছুটিয়া গেলেন। তাঁহারাও একে একে বা একে দুইয়ে আসিয়া কেহ নীলিমাকে এক গোছা ভায়োলেট ফুল, কেহ এক বাক্স চকোলেট, কেহ বা একখানা লাইফ অফ আওয়ার লর্ড (Life of our Lord) এমনই কিছু না কিছু উপ [illegible]েবের সঙ্গে তাহাকে অজস্র আদরবর্ষণে মুগ্ধ ও আপ্যায়িত করিয়া গেলেন। অতঃপর মিসেস গুঁইএর উপর কড়া হুকুম পড়িল, যেন নীলিমাকে তিনি খুব সস্নেহ ব্যবহার করেন। তা মিসেস গুঁই নিজেও সে বিষয়ে যত্ন লইয়াছিলেন। কেবল স্বভাব নাকি মানুষ মরিলেও সংশোধিত হয় না !—তবে তাহার পর হইতে মিসেস গুঁই-এর ক্লাশে নীলিমাকে বড় বেশীক্ষণ থাকিতে হইত না। মিস হর্ণ তাহার ইংরাজীর, মিস বীল্ তাহার ছবি আঁকার ও সেলাইয়ের শিক্ষাভার লইলেন ; এমন কি, মাদাম [illegible] বীও কখন কখন কয়েকটা ফ্রেঞ্চ শব্দ শিখাইয়া তাহাকে স্নেহ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। মায়ের সংযত উচ্ছ্বাসহীন মাপাজোকা আদরের স্থানে সমুৎসাহিত সোচ্ছ্বাস স্নেহের বন্যা পরিপ্লাবনে তাঁহাকে ভাসাইয়া দেবার উপক্রম হইল। মিসেস গুঁই

নিত্য তাহাকে উঠিতে বসিতে বুঝাইতে লাগিলেন যে, খৃষ্টান হইলে তাহার সুখের সীমা থাকিবে না। তিনি বলিলেন, "এই দেখ্ না কম বয়সে বিধবা হয়ে ভাইয়ের সংসারে খেটেখেটে মরছিলুম, একাদশী ক'রে প্রাণটা বার হবারই যোগাড় হ'ত, লোভে জিভটা খসে গেলেও এক টুক্‌রো মাছ নিজের পাতে নেবার যোটি ছিল না; ভাগ্যে ভাগো না এরা আমায় ভজন ভাজন দিয়ে বার ক'রে আন্‌লে, তাই আজ আবার আমার একবার ছেড়ে দু'দুবার বিয়ে হ'লো, মাছ ছেড়ে বেকন ফাউল পর্য্যন্ত অনায়াসেই চলে যাচ্চে। হাত পুড়িয়ে বেঁধে মরবার বদলে খানসামায় তোফা বেঁধে খাওয়াচ্চে, নিজে যেখানে খুসী যাচ্চি আস্‌ছি, একটা কৈফিয়ৎ কাটবারও কেউ কোথাও নেই তো। তোরও খুব সুখ হ'বে দেখিস্ কি না। তোর তো এমন খাসা চেয়ারা র'য়েছে; ভাল খেতে পরতে পেলেই তুই একজন লেডী বনে যাবি, চাই কি কোন সিভিলিয়ান কি ব্যারিষ্টার ফিরিঙ্গী সাহেবের নজরেও লেগে যাবে। আমি দেখতে তেমন ভাল নই ব'লে আমার ও সাধটি আর পূরো হ'লো না। দু'বারই আনক্লিন নেটিভ হজ্‌ব্যাণ্ড (নোংরা দেশী স্বামী) জুটলো।"

গভীর ঘৃণায় আবার নীলিমার বুক ভরিয়া উঠিল, ফিরিঙ্গী সাহেবকে বিবাহ করিতে নাকি আবার বাঙ্গালীর মেয়েয় কখন পারে? তা হউক সে সিবিলিয়ান, হউক সে ব্যারিষ্টার, হউক সে লাট সাহেব। তার চেয়ে গরীব হিন্দু—নীলিমার মনটা গুটাইয়া আসিতে লাগিল। হিন্দু? হিন্দুকে বিবাহ করিলে যা হয়, সে ত সে চিরজীবন ধরিয়াই দেখিতেছে। সে যদি খৃষ্টান হয়, বিবাহ সে তাহার মত দেশীয় খৃষ্টানকেই করিবে, তাহাদের মধ্যে কি কোন উপযুক্ত রূপ-গুণবান্ পাত্র নাই? আর সে বিবাহ ত আর কাহারও স্বেচ্ছাচারের জবরদস্তিতে হইবে না,

সে স্বয়ং নির্ব্বাচন করিয়াই ত তখন পতি বাছিয়া লইতে পারিবে। তবে আর তাহার এত ভয়ভাবনা কিসের? নীলিমা হাঁপ ফেলিয়া বাঁচিল।

নিলীমার মা মেয়ের মনের এত বড পরিবর্ত্তনটা ধারণা করিতে না পারিলেও তাহার বাহ্যিক একটা বিশেষ বদল হওয়া লক্ষ্য করিলেন। সে যেন পূর্ব্বের মত তাঁহার কাছে মন খুলিয়া আর কথা কহে না, চুপচাপ গম্ভীর হইয়া থাকে। পূর্ব্বে তাঁহার গৃহকার্য্যের যেটুকু সাহায্য স্বেচ্ছা প্রণোদিত হইয়াই করিত, এমন কি, কত সময় তাঁহার নিষেধ পর্য্যন্ত মানিত না, এখন সে সবই সে পরিত্যাগ করিয়াছে, এমন কি কত সময় বিশেষ প্রয়োজনে ডাকিয়াও তাহার সাড়া পাওয়া যায় না, এমনই গভীর অন্যমনস্কতায় সে ডুবিয়া থাকে। যতক্ষণ বাড়ী থাকে, বই লইয়াই—কোন একটা কোণের ভিতর লুকাইয়া বসিয়া থাকে স্কুলের সময় আসিলে ছুটাছুটি আসিয়া নাকে মুখে দুটি ভাত গুঁজিয়া ছুট দেয়; স্বর্ণলতা মেয়ের সামনে নিঃশব্দে থাকেন, আড়ালে তাহার বুক ঠেলিয়া দীর্ঘশ্বাস উঠিয়া আসে। মেয়ের মনে যে একটা বিরাট চিন্তা ও বেদনা দিনে দিনে পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিতেছিল এবং সেটা যে তাঁহাদের প্রতি অভিমান প্রসূত, এটুকু তিনি বুঝিয়াছিলেন, কিন্তু বুঝিলেই বা তাঁহার উপায় কি? চিরদিনের অত্যাচারপীড়নে তাঁহার সকল মনোবৃত্তিই যে মূর্চ্ছাবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহার পক্ষে তাই এটুকুও যে একান্ত অপ্রতিবিধেয়। তাহার জীবনের শেষ শান্তি ঐ মেয়ের সহানুভূতিটুকু; তা' সেটুকুও যে তিনি এবার হারাইতে বসিয়াছেন, সে ক্ষতি তাঁহার মনে বিষম হইয়া বাজিলেও বাহিরে তাহা লইয়া তাঁহার কোনই অভিযোগ উপস্থিত করার আগ্রহ বা অস্থিরতা দেখা দিল না। দিন শুধু গতায়াত করিতে লাগিল।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

সেবারে গ্রীষ্মের বন্ধে বেলা ১১টার ডাউন পঞ্জাব মেলে নামিয়া দুইটি সুদর্শন তরুণ পুরুষ একটা ভাড়া গাড়ী করিয়া অনুকূলচন্দ্রের জীর্ণ দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল। এক জন দীর্ঘায়তশরীর, বলিষ্ঠ, উজ্জ্বলতর গৌরাঙ্গ ও স্বভাবচঞ্চল। সে ছেলে গাড়ীখানা আসিবার পূর্ব্বক্ষণেই লম্ফ দিয়া নামিয়া পড়িল ও তাহার সঙ্গী দ্বিতীয় ব্যক্তির জন্য অপেক্ষামাত্র না করিয়াই ছুটাছুটি গিয়া রুদ্ধ দ্বারের কড়া ধরিয়া সজোরে নাড়িতে আরম্ভ করিয়া দিল। তাহার সবল হস্তের আকর্ষণে মরিচাধরা পুরাতন কব্জা যখন খসিয়া পড়িবার উপক্রম করিতেছে, ঠিক তেমনই সময় ভিতর হইতে কে এক জন অতি সঙ্কুচিত ধীর হস্তে দ্বার খুলিয়া দিয়া নিঃশব্দে ভিতরের দিকেই সরিয়া দাঁড়াইল। ততক্ষণে দ্বিতীয় আরোহীও গাড়ী হইতে নামিয়া তাহার ভাড়া চুকাইয়া দিয়াছে এবং ঈষৎ সঙ্কোচের সহিত সহচরের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে।

প্রথম ব্যক্তি দ্বিতীয়কে লক্ষ্য করিয়া "এস হে সুশীল!"—বলিয়াই মুক্ত দ্বারের মধ্যে পা বাড়াইয়া দ্বারের পার্শ্বে সঙ্কুচিতা নীলিমাকে পলায়নোদ্যতা দেখিয়া সোৎসাহ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "হাঃ, নীলিমণি যে! থিন অ্যাণ্ড র‍্যাগেড্ আজ এভার! (সেই রকমই শুঁটকি এবং ন্যাকড়া-পরা!)"

কথার স্বরে নীলিমা তাহার দাদাকে চিনিয়া সকৌতুকে ফিরিয়া দাঁড়াইল এবং সুদীর্ঘ পাঁচ বৎসর পরে সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিতমূর্ত্তি জ্যেষ্ঠের প্রতি চাহিতেই বিস্ময়ের আতিশয্যে তাহার মুখ দিয়া আর একটিও

বাক্যস্ফুরণ হইল না। শুভেন্দুর হিম গৌরবর্ণ সহরের বদ্ধ জল-বায়ুতে ও সুখস্বাচ্ছন্দ্যের আতিশয্যে এবং সযত্নপরিমার্জ্জনে শতগুণ ঔজ্জ্বল্যসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছে। তাহার দৃঢ় মাংসপেশীযুক্ত দেহে কোমলতা স্ফূর্ত্ত হইয়াছে। তাহার উপর অসাধারণ বিলাসিতাপূর্ণ সাজসজ্জায় তাহাকে পূর্ব্বের সেই খাটো ও ময়লা ধুতী পরা গা-খোলা গরীবের ছেলে বলিয়া চিনে কাহার সাধ্য। ময়ূরছাড়া কার্ত্তিকটির মতই তাহাকে অত্যন্ত সুন্দর দেখিতে হইয়াছিল।

বিস্ময়ের প্রথম বেগ একটুখানি প্রশমিত হইয়া আসিলে "কে? দাদা?" বলিয়া নীলিমা উহার পায়ের কাছে প্রণাম করিতে উদ্যত হইতেই দ্বারের বাহিরে আর একটা জুতাপরা পায়ের শব্দ হইল এবং আরও একজন কেহ দ্বারের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, জানিতে পারা গেল। তাহার মুখটার সবখানি দেখিতে না পাওয়া গেলেও সে-ও যে তাহার দাদার মতই একজন তরুণ পুরুষ এবং সাজপোষাকে ও রূপেও প্রায় তাহার সমকক্ষ, সেটুকু সেই চকিতের দৃষ্টিতেই নীলিমা দেখিয়া লইয়াছিল। তাহার উদ্যত প্রণাম-নিবেদন মধ্যপথেই বাধিয়া গেল এবং সে এই অপরিচিত নবীনের আকস্মিক অভ্যুদয়ে থাকিবে কি পলাইয়া যাইবে, তাহা কোন মতেই স্থির করিতে না পারিয়া মনে মনে অশান্ত ও চঞ্চল হইয়াও স্রোতোজলবদ্ধ শৈবালখণ্ডের মতই আটকাইয়া রহিল।

ততক্ষণে শুভেন্দু বন্ধুর দিকে ফিরিয়া ডাকিয়া উঠিল, "এস না, সুশীল, নীলুটিকে আবার তোমার সমীহ করতে হবে না কি? উঃ রে!—ওঃ, লগেজগুলো? তাই ত!—তাই ত হে! কে নিয়ে যাবে? এই নীলি! তোদের চাকর টাকর কেউ আছে, বল্‌তে পারিস? এই ট্রাঙ্কফ্রাঙ্কগুলো বাড়ীর মধ্যে নিয়ে যায় কে, বল ত?"

দাদার কথা শুনিয়া ও তাহার বিপন্ন মুখচ্ছবি দেখিয়া নীলিমার মনের মধ্যে সকৌতুক হাসির সঙ্গে একটু মায়াও হইল। শুধু দাদা থাকিলে সে হয় ত বলিয়া ফেলিত, "চাকরবাকরের মধ্যে এক আমিই আছি, চল আমিই না হয় নিয়ে যাই—" এবং সাধ্যানুযায়ী সেগুলা বহিবার সাহায্যও সে দাদাকে অবিলম্বে করিতে আসিত, কিন্তু দাদার সমভিব্যাহারী দ্বিতীয় লোকটিকে স্মরণ করিয়া সে তাহার কিছুই না করিয়া শুধু মাথা নাড়িয়া জানাইল যে, চাকরচাকর কেহ এ বাড়ীতে নাই। সঙ্গেসঙ্গেই বহু দিনের পরে সদ্যসমাগত ভাইএর প্রতি তীব্র বিরক্তিতে তাহার মনটা পরিপূর্ণরূপে ভরিয়া উঠিল—বাড়ীর সব হালচাল জানিয়া শুনিয়াও দাদা শুধু শুধু এ কি ছেলেমানুষী করিয়াছে!—এই বাড়ীতে আবার কোন ভদ্রলোককে কেহ সাধ করিয়াই ডাকিয়া আনে! এ দিকে শুভেন্দু আগাগোড়া যে ভয় করিয়া বৎসরের পর বৎসর প্রত্যেক ছুটীটায় সুশীলকে ঠেকাইয়া আসিতেছিল, নিজ গৃহের যে দৈন্য দুর্দ্দশা, কাপণ্য সে প্রাণান্তেও তাহাকে দেখাইতে এক বিন্দু ইচ্ছুক ছিল না, তাহার সে সকল চেষ্টাকে ব্যর্থ করিয়া এবার এই পথ দিয়া সপরিবারে নাইনিতাল হইতে ফিরিবার সময় এই ষ্টেশনে পৌঁছিয়াই ভুবনবাবু যখন তাহাদের দুজনকেই এখানে নামিতে আদেশ দিলেন, তখন দু'একটা দুর্ব্বল আপত্তি করিতে থাকিলেও জোর করিয়া ট্রেণে চাপিয়া থাকিয়া সে আদেশ লঙ্ঘন করিতে শুভেন্দুর মত দুঃসাহসিকেরও সম্পূর্ণ সাহসে কুলায় নাই। ইহার উপর তাহার মনের মধ্যে আর একটা যে বিষম উচ্চাকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিয়াছে, সেটার সিদ্ধিলাভার্থে তাহার এখন ঐ লোকটিকে ষোল আনার উপর সন্তুষ্ট রাখাই প্রয়োজন। এই সকল স্বার্থচিন্তা স্মরণে আনিয়া মনের উষ্মা মনেই মারিয়া আরক্ত-গম্ভীর মুখে প্রতিপালকের আদেশে সে পিতৃমাতৃদর্শনে প্রস্তুত হইয়া

নামিয়াই পড়িল। তাহার পর সুশীলকেও যখন তাহার সঙ্গে নামার আদেশ হইল, তখন তাহার মাথায় যেন কে মুগুর মারিয়াছে, এমনই ভাবে চমকাইয়া সে প্রবল প্রতিবাদ করিতে যাইতেছিল। দুর্ভাগ্য ক্রমে ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই তীক্ষ্ণ নিষেধাজ্ঞা প্রচার করিয়া পঞ্জাব মেলের হুইশেল গর্জ্জিয়া উঠিয়াই তাহাতে গতিবেগ প্রদান করিল। সঙ্গে সঙ্গে নিজের সুট কেস দুইটা দড়াম করিয়া প্লাটফর্ম্মে ফেলিয়া দিয়া সুশীলও এক লম্ফে নামিয়া পড়িল। ঠিক এই সময়টিতেই চলন্ত গাড়ীর জানালা দিয়া ভাইয়ের অ্যাটাচীকেস বাহির করিয়া দিবার সময় বিনতার অপ্রসন্ন দৃষ্টি শুভেন্দুর ক্রোধক্ষুব্ধ নেত্রের উপর অজস্র করুণাধারা বর্ষণ করিয়া আসিল। নিজের আঁচলের পিনে আঁটা হল্‌দে গোলাপটাকে পিন খুলিয়া সে এমন ভাবে প্লাটফরমে ফেলিয়া দিল, যেন সেটা নিজে নিজেই খসিয়া পড়িয়াছে। অনেকখানি ছুটিয়া আসিয়া সেটা সুশীল কুড়াইয়া লইতে উদ্যত হইয়াছে, এমন সময় শুভেন্দুর কোন একটা কথা মাথায় ঢুকিয়া পড়াতে সে একলম্ফে আসিয়া সেটা তাহার হাত হইতে ছিনাইয়া লইয়াই চাহিয়া দেখিল যে, বিসর্পিতগতি চলন্ত ট্রেণের কোন একটি জানালার মধ্য হইতে একটি অস্পষ্টপ্রায় মুখচ্ছবি এখনও সেই দিকেই স্থির হইয়া চাহিয়া আছে। শুভেন্দু মনে মনে বলিল, 'ভারি বেঁচে গেছি রে!"

যাহাই হউক, লগেজগুলাকে নিজেরাই ধরাধরি করিয়া কোনমতে উপরে লইয়া যাওয়া হইল। স্বর্ণলতার সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটিতেই শুভেন্দু তাড়াতাড়ি তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়া উঠিল, "হাউডু ইউডু মাদার— ওঃ আই মীন্ মা! ভাল আছ ত?"

স্বর্ণলতার অতি বিশীর্ণ পাণ্ডুমুখে বহুকাল পরে একটা আনন্দের স্মিতরশ্মি ক্রীড়া করিতেছিল, পশ্চিমাকাশের শেষ রক্তিমা সান্ধ্যধূসরতা ভেদ করিয়াও যেমন আত্মপ্রকাশ করে, তাঁহার বহু দিন পরে পাওয়া

এই সন্তান-মিলনের আনন্দ এতই প্রচুরভাবে তাঁহার চিরসংযত চির-সমাহিতবৎ চিত্তক্ষেত্র ব্যাপিয়া উঠিয়াছিল যে, তাহা ভাঁটাপড়া মরা নদীর বুকে আকস্মিক বন্যার প্লাবনের মতই যেন কুলুকুলু রবে ভরিয়া উঠিল। পরিপূর্ণ সানন্দচিত্তে তিনি তাঁহার প্রায়-অপবিচিত ছেলেব দিকে চাহিয়া চাহিয়া অনেক কষ্টে সুখের অশ্রু সংবরণ করিয়া লইলেন। পরক্ষণেই শুভেন্দুব পার্শ্ববর্ত্তী তাঁহাবই পদধূলি লইতে অবনততনু আর একটি শোভন মূর্ত্তি তরুণেব প্রতি তাঁহাব মন দিতে হইল। মাতার বিস্ময়ে মুগ্ধ দৃষ্টির নীরব প্রশ্নোত্তবে শুভেন্দু উত্তর দিল, “ও সুশীল, ভুবনবাবুব ছেলে; তোমাদের বাড়ী বেড়াতে এসেছে।” তার পর এ দিক ও দিক চাহিয়া ঘোর বিবক্তির সহিত সহসা বলিয়া উঠিল, “এই পাঁচ বছরে তোমাদের বাড়ীর পুরণো ‘রুল’ সমস্তই ত দেখছি ঠিক বজায় আছে! দেখ, সুশীলকে যদি এককাপ চা-টা ক’রে দিতে পেরে ওঠো। আমাকেও দেবে অবশ্য সেই সঙ্গে দুএক কাপ, সেটা বলাই বাহুল্য।”

স্বর্ণলতাব শুষ্ক মুখে যে সজীবতাটুকু দেখা দিয়াছিল—সেটুকু মরুসলিলবৎ নিমিষে নিঃশেষ হইয়া গেল। তিনি ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া আস্তে আস্তে বলিলেন, “এখন তোমবা নাওয়া খাওয়া ক’বে নিলে হ’ত না? বিকেলে তখন চা খেতে—”

শুভেন্দু অসহিষ্ণুভাবে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, “উহুঁঃ,—সে হ’বে না। সে ভা-রী দেরী হবে। এক কাপ চা এখনই না খেলে শরীরের ‘ম্যাজম্যাজানি’ কিছুতে ঘুচবে না। যাও, দেখি, চট্ করে, নীলিকেও বরং ডেকে নিয়ে যাও, শীগ্‌গিব যাতে হয়, তাই করো। ওঃ, মাদাব! বি এ গুড্ গাল।”

স্বর্ণলতা বিপন্ন ভাবে থাকিয়া পরিশেষে মৃদুস্বরে উত্তব করিলেন, “চা ত বাড়ীতে নেই, শুভ! বাজার থেকে ওবেলা আনিয়ে রাখব’খন;

তাই বল্‌ছিলুম, দুপুর বেলা এখন নাই বা চা খেলি, চান ক'রে নিয়ে—"

এই পর্য্যন্ত বলিয়াই তাঁহার মনে পড়িল, হাঁড়িতে তাঁহার নিজের ভাগের কয়টি মোটা চাউলের ভাত আছে, আধখানা আলুভাতে ও একটুখানি ভাজাকলাইএর দালের সঙ্গে কয়েক খণ্ড পেঁপে সিদ্ধ মাত্র তরকারীর স্থানীয় হইয়া আছে। সেই জিনিষ এই দুই বহুমূল্য সিল্কের পাঞ্জাবী ও চকচকে পাম্পস্ পরা সুন্দরকান্তি যুবাপুরুষের—তা' হউক সে নিজেরও ছেলে-কোলের সামনে ধরিয়া দিবার কথা মনে হইতেই স্বর্ণলতার সমস্ত শরীর যেন শিথিল হইয়া আসিল। জীবনে হয় ত এই প্রথম বারের জন্যই স্বর্ণলতার মন সম্পূর্ণভাবে নিজের কর্ম্মকে ত্যারস্বরে ধিক্কার দিয়া উঠিল। তাঁহার মনে হইল, মেয়েমানুষ হইয়া যদি তাঁহার জন্ম না হইত, ছেলে যদি তাহার না জন্মিত, সে ছেলে যদি ধনী বন্ধুর সঙ্গে না আসিত! পরক্ষণেই আসন্ন বিপদের যথাসাধ্য প্রতি-বিধানচেষ্টাও যে এই মুহূর্ত্তে করা অবশ্য প্রয়োজন, তাহা স্মরণে আশায় ত্রস্ত হইয়া "তোমরা ওই ঘরে কাপড়-চোপড় ছাড়, বাবা, আমি রান্না চাপিয়ে দিই গে।"—বলিতে বলিতে যথাসাধ্য দ্রুতপদে তিনি চলিয়া গেলেন।

শুভেন্দু পশ্চাৎ হইতে চাপা দাঁতের মধ্য দিয়া তীক্ষকণ্ঠে বলিয়া উঠিল "ড্যাম্ ইওর রান্না। রাঁধবে যা ছাই তা আমার জানাই আছে! চা যে দিতে পারবে না, সে আমি আগাগোড়াই জানতুম, এমন জায়গায়ও মানুষ মরতে আসে। কাকাবাবুর যেমন কাণ্ড!—"

প্রায়-হতবুদ্ধি ও সঙ্কুচিত সুশীলের দিকে চাহিয়া সে বলিল, "তোমাকে শুদ্ধ আবার জোটালেন! আমার বলে 'আপনি শুতে ঠাঁই পায় না শঙ্করাকে ডাকে,' তাই হয়েছে! বাড়ীই যদি আমার বাড়ীর মত হ'বে,

তবে আর এতকাল ধরে আমি পরের দুয়োরে ধন্না দিয়ে প'ড়ে আছি কেন ?"

সুশীল এতক্ষণ নির্ব্বাক বিস্ময়ে ও তাহার সহিত সমপরিমাণে মিশ্রিত ঘোর লজ্জাভিভূতভাবে মাতাপুত্রের মিলনকথা শুনিতেছিল এবং নিজেকেই ইহাদের এই বিপদবিড়ম্বনার হেতুভূত দেখিয়া অত্যন্তই লজ্জাক্ষুণ্ণ হইয়াছিল। এখন স্বর্ণলতাকে প্রস্থিত হইতে দেখিয়া সে একটুখানি যেন শান্তিবোধ করিল এবং শুভেন্দুর একটুখানি কাছাকাছি সরিয়া আসিয়া বিব্রত স্বরে চুপি চুপি কহিয়া উঠিল, "কি কর্‌ছো, শুভ্‌দা! কাকীমাকে কেন অত ব্যস্ত করচো? আমরা হঠাৎ এসে পড়েছি, এমন সময় কোথায় কি ব্যবস্থা ক'রে তুলবেন? একটা বেলা চা না হয় নাই বা খেলে! চুপ ক'রে যাও। এস কাপড়-চোপড়গুলো ছেড়ে ফেলে একটু ঠাণ্ডা হওয়া যাক!"

বিরক্তি অ-প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গের সুরে শুভেন্দু সুশীলের এই কথার প্রত্যুত্তরে জবাব দিল, "যে বাড়ীতে মাথা গলিয়েছ, ঠাণ্ডা এখানে হ'তেই হবে। গায়ের সবখানি রক্ত জ'মিয়ে বরফ ক'রে দিয়ে না ফিরতে হয়, দেখন! "

উপেক্ষার চাপাসুরে অসন্তোষের সহিত সুশীল বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, "কি কর, শুভ্‌দা! কাকীমার মনে কত কষ্ট হবে এ সব শুন্‌লে, তা কি তুমি একটুও ভেবে দেখচো না?"

শুভেন্দু তার অষ্ট্রেলিয়ান হাফ রেশমের টানা দেওয়া পাতলা পাঞ্জাবীতে লাগান চুণি বসান সোনার বোতাম খুলিতে খুলিতে ভুরু কুঁচকাইয়া তীব্র করিয়াই উত্তর দিল,- "দেখ, সোজা ও সত্য কথাই বল্‌বো, তা'তে কা'র মনের মধ্যে গিয়ে সে কি হুল ফোটাবে না ফোটাবে, তা'র জন্যে প্যাঁচ লা'গয়ে কথা কওয়া আমার কোষ্ঠীতে

লিখিত নয় ; তার জন্যে তোমরা কবি মানুষরা আছ, কথার কাব্যি বানিয়ে হয়কে নয়, রাতকে দিন তৈরি ক'রে তোল।—এই নীতি ! একটু গরম জল এনে দে' দেখি, দাড়ীটা কামিয়ে নিই।"

বিংশ পরিচ্ছেদ

ঘরের ছেলে যখন ঘরের বাহিরে গিয়া পরের মধ্যে পরিণত হয়, তখন সে যেমন অনায়াসে ও অতিমাত্রায় পর হইয়া যায়, সত্যকার পরও ঠিক ততখানি পর হইতে কুণ্ঠা বোধ করে, তাই এই দারিদ্র্যপূর্ণ এবং কার্পণ্যে কঠোর গৃহস্থালীর সহস্র অভাবের অভিযোগে ঘরের ছেলে শুভেন্দুর সুগঠিত নাসা যতই অধিক ঊর্দ্ধে উঠিয়া থাকিল, পরের ছেলে সুশীলের লজ্জাবিপন্নতা ততই অধিক বর্দ্ধিত করিয়া তাহার মনকে একেবারে যেন এই নির্বান্ধব ও অসহায় সংসারের মধ্যবর্ত্তী করিয়া টানিয়া লইতে লাগিল। বন্ধুর ত্রুটী সে যে কোথা দিয়া এবং কেমন করিয়া শোধরাইয়া লইবে, কি করিয়া কোন্ কথা বলিয়া এই দুটি নিরুপায়া নারীর একান্ত অসহায় অবস্থার অপরিসীম লজ্জা-বেদনা প্রশমিত করিয়া দিবে, ইহা যেন সে দিশাহারা হইয়া খুঁজিয়া বেড়াইল এবং ইহার জন্য তাহার স্বভাবতঃ স্বল্প-ভাষী সংযত স্বভাবেরও সময় সময় ব্যতিক্রম করিয়া নিজেকে সে নির্দ্দয়-ভাবেই মুখর ও চঞ্চল করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

শুভেন্দু যখনই বিলাসবস্তুর অভাবে একান্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিয়া মাতাকে অনুযোগ ও পিতার উদ্দেশ্যে তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিতে থাকে, সুশীলকেও সেই সঙ্গে সঙ্গে এতদুভয়কেই যথাসাধ্য সমর্থন করিয়া জানাইয়া দিতে হয় যে, শুভেন্দুর মাতার অনুপায়তায় এবং পিতার অক্ষমতা বা কৃপণতায় তাহার পক্ষে কিছুমাত্রই অসুবিধা ঘটিতে পারে নাই।

শুভেন্দুর পিতা যথাকালে বাটী ফিরিয়া এই শুভদর্শন তরুণ দুইটিকে দেখিয়াই অকস্মাৎ বাতাহত কদলীকাণ্ডের মত প্রায় পতনোন্মুখ হইলেন।

প্রায় সন্ধ্যার স্বল্পালোকে অস্পষ্টভাবে দেখিয়া উচ্চকণ্ঠে হাঁকিয়া উঠিলেন, "কে গা তোমরা? আমার বাড়ীতে কিসের মতলবে এসে ঢুকেছ? এটা যে অতিথশালা নয়, তা বোধ করি তোমরা টের পাও নি? আচ্ছা, এখন কষ্ট করে নিজের নিজের পথ দেখে নাও দেখি।"

নীলিমা সেইমাত্র মাতাপুত্রীর সমবেত চেষ্টা-যত্নে সংগ্রহ করা দু' বাটি গরম চায়ের সঙ্গে সামান্য একটু আটার মোহনভোগ দুখানি কাঁসার রেকাবে লইয়া অতিথিদ্বয়কে দিতে আসিতেছিল, বাপের গলার আওয়াজে তাহার হাত কাঁপিয়া একটা বাটির গরম চা খানিকটা চলকিয়া তাহার পায়ের উপর পড়িয়া গেল। সে সেইখানে একটু আড়ষ্ট ও গতিহারা হইয়া থাকিয়া তাহার পর সাহস সংগ্রহপূর্বক একটু উৎকণ্ঠিত দ্রুতপদে অগ্রসর হইতে গিয়াই শুনিতে পাইল, তাহার দাদা বিনম্রকণ্ঠে বলিতেছে, "আমি শুভেন্দু। কাকাবাবা আমাদের একবার এখানে দেখা ক'রে যেতে নামিয়ে দিয়ে গেলেন, বলেই গেছেন যখন আবার ফিরে যাবেন, এটি কাকাবাবুর ছেলে।"

নীলিমা নিজের গতি স্থির করিয়া দেখিল, সুশীল অগ্রসর হইয়া আসিয়া তাহার বাপের সেই ছেঁড়া চটিপরা ধূলা-ধূসরিত পাদুখানির ধূলা সযত্নে হাত দিয়া তুলিয়া লইল এবং সবিনয় নিবেদন করিতে লাগিল, "জ্যাঠা-মশাই। আমার নাম সুশীল। বাবা আমাদের মা বাপের কাছে ক'দিনের জন্য পাঠিয়ে দিলেন।"

"হাঃ, তাই বলো, তোমরা ভায়ের বাড়ী থেকে আসছো! বটেই আচ্ছা! ভুবন নিশ্চয় ভাল আছে? যার এত ধনদৌলৎ, সে ভাল না থেকে করবে কি! তাহার পর? তোমরা—বড়মানুষের ছেলেরা,—তোমরা এই গরীবের গরীবখানায় রাত কাটাবে কেমন ক'রে? পারবে ত? আর না পেরেই বা আজকের রাতে যাবে কোথায়? কোন গতিকে

চোখকান বুজে একটা রাত্তির বই তো নয়, চালিয়ে নিতেই হবে। কি বল হে—সুনীল না সুশীল বুঝি? কি নাম তোমার বল্লে?"

এই অপ্রচ্ছন্ন সত্য স্বীকারের পরিবর্ত্তে সুশীল নিতান্ত লজ্জাবিজড়িত স্মিতমুখে উত্তর করিল, "আজ্ঞে, আমার নাম সুশীল।"

স্বভাবসিদ্ধ ঔদাস্যব্যঞ্জক নীরসস্বরে অনুকূলচন্দ্র কহিলেন, "না সুনীলই হোক, আর সুশীলই হোক, ও একই কথা। আজকালকার দিনের ছেলে যত 'সু' হয়, সে আমার খুব জানাই আছে, তবে 'নীল' আর 'শীল' নিয়ে যতটুকু তফাৎ। তা হাঁ, বলছিলুম কি, একটা রাত্তির তোমাদের এই খানেই তা হ'লে চোখ-কান বুজে কাটাতেই হচ্ছে, তা হোক। কালকের ভোরের প্যাসেঞ্জারটায় তোমরা বেরুলে পরশু বেলা সাড়ে তিনটেয় তোমাদিগে হাবড়ায় ইষ্টিসনে নামিয়ে দেবে। কোন অসুবিধাই হবে না। সেইটেতেই তোমরা যেও। আমি যদি কখন বাড়ী যাই, তো ওইটেতেই যাই, ভাড়াও কতকটা সস্তা হয়।"

এই কথা বলিয়া যেন একটা খুব মস্ত বড় অর্থনৈতিক সমস্যার না হোক বিশেষ কোন জটিলতর সমস্যার সমাধান করিয়া দিয়াছেন, এমনই প্রসন্ন হইয়া উঠিয়া তিনি সজোরে হাসিয়া উঠিলেন, হাসিতে হাসিতে পুনশ্চ বলিলেন, "কিন্তু কলকেতার ছেলেদের শুনেছি বেলা ৮টার আগে ঘুম ভাঙ্গে না, সেইটে হলেই তো সব মাটি করবে। তা আমি আর আমার গিন্নী আমরা খুব ভোরেই উঠি, আমরা তোমাদের ঘুম ভাঙ্গিয়ে দেবো'খন। অত সকালে তো আর মুখে কিছু দিতে মন সরবে না, চট্ ক'রে বেরিয়ে পড়লে, অনায়াসে সাড়ে পাঁচটার প্যাসেঞ্জারটা ধ'রে ফেলতে পারবে। হাঃ, তাহার পর সুশীল! তোমাদের বাবার ব্যবসা বোধ করি খুবই ভালই চলছে? কতটি টাকা ক'রে মাস মাস জমাতে পারছেন বল তো? কি গো, কুমারী নাইটিঙ্গেল কি নিয়ে এলেন? অ্যাঁ! কি ও বাটিতে?

ভুবাটি ও কি আনা হলো ? আবাব বেকাবে অতখানি ক'রে হালুয়া এনেছিস কেন ? হাঃ ! তোর 'গুষ্টীব পিণ্ডি ! কল্‌কেতার ছেলে ওরা, ওবা না'ক ওই হালুয়ার তাল দুটো গিল্‌তে পারবে ? তোব মতন কি ওদেব রাক্ষুসে ক্ষিধে ! ওবা হাওয়া খেয়ে থাকে, ইলেক্‌ট্রিকের পাখার হাওয়া খায় !"

ইলেক্‌ট্রিকের পাখাব হাওয়া খাইয়া ক্ষুধামান্দ্য করে কি না, বলা যায় না, তবে এ বাড়ীতে নাকি উহার কোন পাঠই ছিল না ব'লয়াই না কি, ক্ষুধা এ দুই জন তরুণ পুরুষেরই অল্পবিস্তব পাইয়াছিল, কিন্তু গৃহস্বামীর মুখে নিজেদেব ঐ প্রকার অনৈসর্গিক আহার্য্যের ব্যবস্থা শুনিয়া শুভেন্দু ক্রুদ্ধ ও অপমা'নত হইয়া নীলিমাব দত্ত চায়েব বাটিটা মাত্র তুলিয়া লইয়া হাতেব ধাক্কা দিযা বেকাবখানা ঠেলিয়া গম্ভীব চাপাস্বরে বলিল, "নিয়ে যা—"

সুশীলও তখন হইতেই ঠিক উহাব অনুকরণ করিতে মনে মনে ইচ্ছুক হইয়া রহিল ও উৎসুক হইয়া উঠিল, কিন্তু কার্য্যকালে ঠিক ওই রকমটাই তাহার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিল না।

নীলিমা অনেকক্ষণ প্রতীক্ষা করিয়াও যখন দেখিল, তাহাব পিতৃকবল হইতে ইহাদের উদ্ধাবেব আশা সুদূরপরাহত, তখন সেই বহুলায়াসে সংগৃহীত চায়েব দুর্দ্দশা ফেনেব সহিত একীভূত হয় দেখিয়া অগত্যাই সে তাহাব পিতৃসান্নিধ্যকে আব সম্মান দিতে সাহস করিল না। ফলে সে গৃহেব কদন্নেব দায়ে প্রায় অর্দ্ধভুক্ত শুভেন্দুকে এবারও অভুক্ত থাকিতে হইল দেখিয়া তাহার সোদরা-স্নেহ আহত ও বিপর্য্যস্ত হইয়া উঠিয়া তাহাকে পীড়াদান করিল এবং কেন অধিকতর চেষ্টা দ্বারা এই সামান্য সংগ্রহটুকু একটু পূর্ব্বে করিয়া তুলিতে পারে নাই, ইহাব জন্য সে নিজেকে মনে মনে বারংবার ধিক্কার দিয়া অপর জনেব দিকে সমধিক সঙ্কুচিতপদে ও উদ্বেলিতবক্ষে অগ্রসর হইতে লাগিল।

দিবসান্তের সেই শেষ ধূসররশ্মিরেখায় সে মুখেব পীড়িত, তৃষিত,

আব

ব্যথিত দৃষ্টি সুশীলের সুপ্রচুর সহানুভূতিতে ভরা পরিপূর্ণ চিত্তকে অতি আগ্রহে আলোড়িত ও অভিভূত করিয়া তুলিল, সে কিছুক্ষণ সহানুভূতি পূর্ণ বিষণ্ণনেত্রে সেই বিব্রত বিপন্ন মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া হাত বাড়াইয়া রেকাবশুদ্ধ চায়ের আমন্ত্রণ গ্রহণ করিল এবং অনুকূলচন্দ্রের বিরক্তি-অপ্রচ্ছন্ন হিংসাকুটিল মুখের দিকে উৎফুল্ল চোখ তুলিয়া স্মিতহাস্যে কহিয়া উঠিল, "আচ্ছা, আপনি ব'সে দেখুন জ্যেঠামশাই, কল্‌কেতার ছেলেরা শুধু ইলেক্‌ট্রিক পাখার হাওয়াই খায় না, তাল তাল মোহনভোগও অনায়াসে খেয়ে ফেলতে পারে। শুভদা, তুমি যদি আর না উল্টে দাবী আনো, তা হ'লে হুকুম করে দাও, তোমার ভাগটাও এই সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে কল্‌কেতার ছেলেদের কলঙ্ক মোচন করে জ্যেঠামহাশাইএর কাছে প্রাইজ পেয়ে যাই।"—এই বলিয়া সুশীল হাসিয়া উঠিল এবং হাস্যোৎফুল্ল মুখ অকুণ্ঠিতভাবে তুলিয়া নীলিমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—"যদি আপত্তি না থাকে তো ও রেকাবখানাও আমায় নামিয়ে দাও, জ্যেঠামশাইএর এ রকম ভুল রেখে দিয়ে যাওয়া তো কোনমতেই চলবে না।"

নীলিমার সমস্ত মুখ রাঙ্গা হইয়া উঠিল, উহা আনন্দে কি সঙ্কোচে, তাহা সে ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিলেও তাহার মনে হইল, এতদিন পরে যেন তাহার জীবন এতটুকু একটু সার্থক হইতে পারিল, এক দিনের মতনও একটুকুখানি যেন কাজে লাগিল! এমন সুরে, এমন শ্রদ্ধায়, এমনভাবে আর কেহ, আর কখন আর কোন কাযের জন্যই যেন তাহাকে আহ্বান করে নাই। সে লজ্জিত, জড়িত ও আনন্দোচ্ছ্বাসিত হইয়া তাড়াতাড়ি সবটুকু খাবার তাহার পাতের উপর ফেলিয়া দিল, ঠিক সাম্‌না-সাম্‌নি পিতার ভ্রূকুটিকুটিল মুখের ছবি তীব্র ইঙ্গিতে কিছু বাঁচাইয়া দিবার কঠিন সঙ্কেত জানাইতেছিল, সে দিকে সে বারেকমাত্র চাহিয়াও দেখিল না।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

যন্ত্রের মধ্যে সুর ভরা থাকিলেও যন্ত্রীর হাতের স্পর্শ ব্যতীত সে যেমন নিজেকে প্রকাশ করিতে সমর্থ হয় না, আবার উপযুক্ত যন্ত্রীর হাতের এতটুকু একটুখানি পরশ-লাভে তার সেই নীরস কঠোর কঠোরতা এক নিমেষেই যেমন ঠেলিয়া দিয়া রসের স্রোতে সুরের ফোয়ারা উথলিয়া উঠিতে থাকে, তেমনই সে দিন সুশীলের সেই এতটুকু একটু মিষ্টহাসি, একটুখানি স্নিগ্ধ দৃষ্টি ও ওই কয়েকটি স্নিগ্ধ বাণীর অচিন স্পর্শেই নীলিমার বক্ষোনিলীন সুপ্তিশান্ত সুরের ধারা উথলিয়া উঠিল। তাহার প্রাণের তারে ওই স্পর্শটুকু যেন ঝঙ্কার দিয়া তারে তারে সুরবাহারের অসংখ্য সুর বাজাইয়া তুলিল। তাহার বুকের মরাগাঙ্গে জোয়ারের স্রোতে বন্যার বেগ বহাইয়া তুলিল। তাহার চির-অনাদৃত ভিখারিণীর সঙ্কোচশঙ্কিত মুদিত অন্তরে রাজরাণীর ঐশ্বর্য্যভাবের সমাবেশ করিয়া দিল। তাহার সহসা সে দিনেই প্রথম মনে পড়িল যে, তাহার বয়স এখন আর বালিকার বয়স নাই, তাহার অর্দ্ধপরিণত নবযৌবনোচ্ছ্বাসিত তনু দেহ আজ এই অর্দ্ধাবরণের ফাঁকে ফাঁকে তাহার চিত্তকে নিরতিশয় লজ্জাবিপন্নতায় বিব্রত করিয়া তুলিল, নিজের পরিধানের মলিন ও পুরাতন বস্ত্র আজ তাহার অন্তরকে দ্বিধা-ধিক্কারে ভরাইয়া তুলিল। নিজেদের চিরদিনের দৈন্যে ততোধিক কার্পণ্যে বিরস নীরস গৃহস্থালী তাহাকে আজ একান্ত পরিতপ্ত, আহত ও অসহিষ্ণু করিয়া ফেলিল। এই অপূর্ব্বদর্শন সুখসেবিত তরুণযুগলকে তাহাদের এই একান্ত কুশ্রীতায় ভরা, দুঃখদারিদ্র্য এবং হৃদয়হীন গৃহস্থালীর মধ্যে

কোথায় রাখিয়া কেমন করিয়া যে, সেবাপূজা করিয়া উঠিবে, সে কথা মনে করিয়া এই অসহায়া তরুণীটির বুকের মধ্যে যেন লজ্জামথিত রক্তের স্রোত কলকল্লোলে ছুটিয়া চলিতে লাগিল। উঃ, গরীবের মেয়ে হওয়ার এত বিড়ম্বনা! তাহার উপর সে গরীব যদি আবার কৃপণ, দুর্মম এবং হৃদয়হারা হয়।

স্বর্ণলতার মনের বেলায় যে এ বিপ্লবাঘাতের ঢেউ আঘাত করিয়া যায় নাই, তা নয়। কিন্তু ওই চির-অসহায়া নারীর পাঞ্জর, জমাট বুকের মধ্যে সকল আশাই যেন চিরসমাহিত হইয়া গিয়াছিল। সেখানে যে আঘাত পড়ে, তাহাতে আহতকে তো প্রত্যাঘাত করায় না, মাত্র অবরুদ্ধ বেদনার গুরুভাবে অবসন্ন মনটাকে মূর্চ্ছাতুর করিয়া ফেলে। তাই মনের মধ্যে সকল বাসনা-কামনাকেই সমাহিত করিয়া ফেলিয়া তিনি তাঁহার নিত্য প্রথামতই সেই মোটা আটার রুটি, মসুরির দাল এবং বিলাতী কুমড়ার ছক্কা রাঁধিতে রাঁধিতে এই খাদ্য পরিবেশন করিবার সময়কার নিজের ব্যথা ও ছেলের মুখের অপ্রসন্ন মন্তব্য মনে করিয়া লজ্জাপীড়িত হইতেছিলেন, আবার সঙ্গে সঙ্গে শুভেন্দুর সুখসেবিত সুন্দর মূর্ত্তি মনে পড়িয়া তাঁহার সকল দুঃখের উপর পরম সুখের শীতল প্রলেপ মাখাইয়া দিতে ছিল। চিরদুঃখের এত বড় সান্ত্বনা—আজ যাঁহার দানে—তাঁহার পায়ের তলায় মাথা সহস্রবারই লুটাইয়া পড়িতে চাহিতেছিল।

রান্নাঘরে আসিয়া ঢুকিল নীলিমা। অমনই স্বর্ণলতার কণ্ঠভেদ করিয়া একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস উত্থিত হইল। আজ তাঁহার পুত্রৈশ্বর্য্যের পাশাপাশি এই মেয়ের দুর্দ্দশাটা তাঁহার কাছেও যেন অত্যন্তই সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে! তাহার উপর শুভেন্দুর সমভিব্যাহারী সুশীলের স্নিগ্ধ সৌম্য শ্রীটুকু তাঁহার মুগ্ধ মনের উপর কি মায়াজালই যে বিস্তৃত

করিয়াছে, সে শুধু সেই জানে, যে অভাগা বাতুল গগনবিহারী জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর মর্ত্ত্য মানবের সহিত সংস্পর্শ প্রতীক্ষা করিয়া থাকে! স্বর্ণলতার বিমোহিত চিত্ত অন্তরের অত্যন্ত গোপন গুহায় সন্তর্পণে এমন একটা অসম্ভব অসঙ্গত বাসনাও উচ্চরিত হইয়া উঠিতেছিল যে, তাহার একটুখানি বহিঃপ্রকাশে সমস্ত মানবজগতে এমন একটা হাস্যতরঙ্গ প্রবাহিত হইয়া যাইবে, যাহার পর ওই চিরবিড়ম্বিত দুঃখসহিষ্ণু নারীবংসকল সহ্য সীমা ছাড়াইয়া কোথায় যে ছুটিয়া যাইবে, তার কোন হিসাব থাকিবে না। এবারও নীলিমার গৃহপ্রবেশে সেই পূর্ব্বতন দুরাকাঙ্ক্ষার চকিতোদয়ে তাই স্বর্ণলতার নি'স্তব্ধ বক্ষ হইতে অত বড় একটা দীর্ঘ্যশ্বাস বহির্গত হইয়া আসিল। আহা, সুশীলের হাতে যদি নীলিমাকে দেওয়া চলিত!

নীলিমা আসিয়া কাঠের 'কেঠো'য় কোটা কুটনাগুলার উপর বারেক অবজ্ঞাদৃষ্টি নিক্ষেপ করিল; উনানের উপর চাপানো ফুটন্ত দালের হাঁড়িটার দিকে তীব্র দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিল, তাহার পর মায়ের হাতে মাথামাথি জলঢালা আটাগুলার উপর চোখ পড়িতেই জ্বলিয়া বিরক্তি-কঠোর তীক্ষ্ণ কণ্ঠে কহিয়া উঠিল, "মা, আজও ঠিক তোমার সেই মান্ধাতাকালের বন্দোবস্ত! দাদাকে না হ'লে তোমরা নির্ঘাতই উপোস করিয়ে মারবে ঠিক দিয়ে রেখেছ! ও তো তোমার ওই পেটেন্ট-লেদারের তৈরি রুটি দাঁতে কাটতে পেরে উঠবে না!" বলিতে বলিতে এতক্ষণকার সকল অভিযোগের বেদনা এই উপায়হীনা জননীর উপরেই উদ্যত হইয়া উঠিয়া তাহাকে একেবারে উত্তেজনায় অসহিষ্ণু করিয়া তুলিল, বাপের কানে পৌঁছিতে পারার সকল সম্ভাবনার ভীতি তাহার মন হইতে মুছিয়া গিয়া তাহার কণ্ঠকে প্রায় সপ্তমে চড়াইয়া তুলিল। সে বলিতে লাগিল।—

"অদ্ভুত মানুষ তোমরা! এত দিন পরে ছেলে ঘরে ফিরলো, কোথায়

তাকে যত্নে আদরে ভরিয়ে দেবে, দুদিন ঘরে রাখবার জন্য চেষ্টা করবে, তা না, না খেতে দিয়ে, দুঃখ দিয়ে দূর দূর করে এক রকম তাড়িয়ে দিচ্চো? ধন্য তোমরা! কিন্তু তা'না ক'রে ওকে যদি হাতে রাখতে, ভবিষ্যতে তোমাদেরই ভাল হতো।—ও তো মানুষ হয়ে উঠেছে। দেখছো না কি, তোমাদের হতশ্রদ্ধায় কুকুরের মতন দোরদোর ঘুরে বেড়ান সে দাদা আর নেই!"

অসহায়া জননীর আর্ত্ত করুণ দুটি চোখের উপর চোখ পড়িতেই অতি সহসা সে নিজেকে সামলাইয়া লইল। আনায়বদ্ধ নিরুপায় জীব-জননীর ব্যথাকাতর মূক দৃষ্টির মতই তাহাতেও সেই একই আশাহীনতা সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল। নীলিমাকে সেই অভিযোগহীন বেদনা যেন কশা হইয়া বজ্রবলে আঘাত করিল। নিজের ধৈর্য্যচ্যুতির মূলে যত বড় অবি-... ...ই থাক, তাহার নিজের পক্ষ হইতেও মায়ের সম্বন্ধে যে তাহার চাইতে কম কিছু করা হয় নাই, তাহা মনে পড়িতে মন সমধিক আহত হইয়া মুখ চাপিয়া ধরিল। যাকে এ সব কথা বলা যে একেবারেই মিথ্যা এবং মার পক্ষ হইতে এ অবিবেচনার প্রতিকার হওয়া স্বর্গের সিঁড়ি হওয়ার মতই যে অসম্ভব, এ তো জলের মতই সহজসিদ্ধ জানা কথা। ক্ষণকাল অন্তর্গূঢ় অশক্ত কোপে স্তব্ধ হইয়া থাকিয়া নীলিমা সহসা কি ভাবিয়া দ্রুতপদে সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

গৃহস্বামীর রাত্রির খাওয়া চুকিয়া গিয়াছে। অনুকূলচন্দ্রের শয়নকাল ঠিক সন্ধ্যা ৮টা, ইহার ব্যতিক্রম কোন দিন হয় না, সৌভাগ্যক্রমে তাহা আজও হয় নাই। রান্নাঘরে একবার চৌকিদারী করিয়া আসিয়া তিনি হৃষ্টচিত্তে আহার করিয়া লইয়া শয়ন করিতে গেলেন, যাত্রাকালে স্ত্রী ও কন্যাকে ডাকিয়া বলিয়া গেলেন, "ওগো দেখ, তোমরাও আর অনর্থক রাত জেগে অসুখবিসুখ ক'রে পড়ো না, ওদের দু'খানা খাইয়ে দিয়ে লণ্ঠন নিবিয়ে সময়মতন শুয়ে পড়ো, ভোর না হ'তে আবার ওদে'ঘরে ইষ্টিশানে পৌঁছে আসতে হবে। অত ভোরে ত কিছু মুখে দিতে পারবে না. ও তখন ট্রেণে বসেই কিনে নিয়ে খাবে।"

সন্ধ্যার অপরিস্ফুট অন্ধকারের ছায়ায় দোতলার ছোট ছাতের আলিসার গায়ে হেলান দিয়া নীলিমা চুপ করিয়া বসিয়াছিল। আকাশভরা নক্ষত্র-গুলা প্রাণপণে জ্বলিয়াও এই নিরালোক বাড়ীটাকে এতটুকু উজ্জ্বল করিয়া তুলিতে পারে নাই, কিন্তু ওই অসংখ্য নক্ষত্রসমষ্টির মধ্যে একতমেরই মত অতি ক্ষীণ ক্ষুদ্রতম আলোকসম্পাতে আজ নীলিমার চিত্তটির অন্ধকারের পুঞ্জ ভেদ করিয়া স্মিতশুভ্র রজতালোকের একটি স্নিগ্ধধারা তাহার এই নিরালোক বিজন মনের উপরে অতি ধীরে ধীরে ছড়াইয়া পড়িতেছিল। আকাশে বাতাসে সম্মোহনশক্তির কোন উপাদানই কোথাও ছড়ান ছিল না, পারিপার্শ্বিক অবস্থাও একান্তই প্রতিকূল। তথাপি এ কি গোলাপী নেশার রঙীন আবেশে চোখের পাতা তাহার জড়াইয়া আসিতেছে, মনের তারে কোন অজানা সুরের একান্ত নবীনরাগিণী অন-

র্থক কেবলই এ কি ঝঙ্কৃত হইতে চায় ? মায়ের উপর অভিমান ও পিতার উদ্দেশ্যে অপরিসীম ক্রোধ লইয়া সে এখানে নিজেকে লুকাইয়া রাখিবার অতিথিদের ভোজনব্যাপারে নিরপেক্ষ রাখিবার উদ্দেশ্যেই আসিয়া বসিয়াছিল। কিন্তু একটুক্ষণের মধ্যেই কোথা হইতে কোন্ অজ্ঞাত চিন্তার অনাহূত আগমনে কোন্ সময়ে সে সকল অপ্রিয় প্রসঙ্গ পারিবারিক লজ্জায় লজ্জাকর হেয় আন্দোলন যে নিরুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল, তাহা তাহার জানাও ছিল না, সহসা অদূরবর্ত্তী শুভেন্দুর চাপা কণ্ঠের আহ্বানে সসংজ্ঞ হইয়া সে জানিতে পারিল, তাহার অন্তরের সকল বিদ্বেষবহ্নি সহসাই নিবিয়া গিয়াছে এবং সেই নির্ব্বাপিতশিখ অগ্নিজ্বালায় স্থানে সুশীতল অজস্র সুধাধারা ক্ষরিত হইয়া পড়িতেছে, তাহারই সুস্পর্শসুখে দাহ ত জুড়াইয়া গিয়াছেই, পরন্তু সেই অপরিমেয় অমৃতস্পর্শে সমস্ত মনপ্রাণই তাহার সুধাস্রোতে প্লাবিত হইতেছিল। পুলককম্পিত চরণে উঠিয়া আসিয়া শব্দানুসরণে সে ডাকিল, "দাদা !"

শুভেন্দু কাছে আসিল। রাগে দুঃখে সে গর্জ্জিতেছিল। নীলিমাকে দেখিতে পাইয়াই প্রায় কাঁদো কাঁদো মুখে অস্ফুট গর্জ্জনে বলিয়া উঠিল, "কি ঝকমারীর কাযই আমি করেছি, এই তোমাদের বাড়ী এসে। তা' আমার ত মোটেই আসবার ইচ্ছা ছিল না, তা'তে আবার ওই ছোঁড়াটাকে ঘাড়ে ক'রে। কাকাবাবুর ঐ যে কেমন একটা ছোটলোকী গোঁয়ারতুমি, যা' ধরবে তা' না করিয়ে ছাড়বে না। বল্লে কিনা মা—বাপকে একবার দেখে আসা উচিত ! আরে, বাপু, মা-বাপ কি আমার মা-বাপের মতন যে, তাদের দেখে আসবো ? তা হ'লে তোমার ঘাড়ে চেপে বসেছি কেন ? এখন ওই সত্ত অপমানের হাত থেকে কেমন ক'রে বাঁচা যায়, তাই ভেবে আমার ত মাথা ঘুরচে কি করি বল্ দেখি ?"

নীলিমার মুগ্ধ অন্তরের স্বপ্নবিভোর সুখস্রোত বাস্তবের কঠিন ও তপ্ত স্পর্শে আহত ও আলোড়িত হইয়া উঠিল। মুখ তাহার একটুখানি হইয়া শুকাইয়া গেল, কতকটা বুঝিয়া, কতকটা না বুঝিয়া সে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে?"

শুভেন্দু বিরক্তিতীক্ষ্ণকণ্ঠে কহিল "কি হয়েছে, জানিস্ নে না কি? ন্যাকামী করিস কেন? আমি না হয় উচ্ছন্নই গেলুম, একটা বাতের মতন ত থাকবার হুকুম হয়েছে, সেটা না হয় স্রেফ জল গিলেই কাটিয়ে দিয়ে যাচ্ছি, কিন্তু ওই যে একটা ভদ্রলোকের ছেলেকে ঝক্‌মারী ক'রে এনেছি, ওর পাতে ওই চোকরের রুটি আর মুসুরীর দাল ঢালতে তোদের না হয় 'হায়া' লজ্জা নেই, তোরা না হয় পারবি, আমি কেমন ক'রে দাঁড়িয়ে তাই দেখবো ব'লে দে দেখি? আরে ছ্যাঃ, এদের সন্নিধ্যে আবার মানুষে আসে? না কাউকে আনে ওদের হিন্দুস্থানী দরওয়ানগুলো রুটি ঐ রকমই পাকায় বটে; কিন্তু দালে তাদের ঘি পড়ে কত! আর সে প্যানপ্যানে মুসুর দালও নয়।"

ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া নীলিমার দিক হইতে কোন প্রকার সাড়া-শব্দটুকু পর্য্যন্ত না পাইয়া জ্বলন্ত হইয়া উঠিয়া শুভেন্দু গলা চড়াইয় কর্কশস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল, "গিন্নীঠাকৃরুণকেও আচ্ছা ক'রে জানিয়ে দিয়ে এসেছি, আর তুমি ঠাকৃরুণও জেনে রাখ, তোমাদের বাড়ীর ও ছাই-পিণ্ডি সুশীলের পাতে আমি দিতে দেবো না, তার চাইতে তাকে নিয়ে আমি এক্ষনি বিদায় হচ্ছি।"

এই বলিয়া রাগে গস গস করিতে করিতে শুভেন্দু চলিয়া যায়, নীলিমা হঠাৎ কি একটা ভাবিয়া লইয়া তাড়াতাড়ি তাহার পথরোধ করিয়া বলিল, "আচ্ছা, একটুখানি দেরি কর তুমি, এক্ষুণি আমি সব

জোগাড় ক'রে এনে লুচি টুচি ক'রে দিচ্ছি। কিন্তু তাতে দু ঘণ্টা অন্ততঃ দেরী হবে।"

শুভেন্দুও অকস্মাৎ ঠাণ্ডা হইয়া নরমস্বরে কহিল, "আহা, তা' যদি পারিস রে! কি বলবো তোকে? দেখ দেখি বাবার কি রকম অন্যায়, সাধ ক'রে কি আর দু'টি চক্ষে প'ড়ে ওকে দেখতে পারিনে! বারমাস ওদের খাচ্ছি, আর সে কি রাজভোগে খাওয়া, তোদের চৌদ্দ পুরুষেও কখন অমন খাওয়া খায়নি! তা একটা দিনের জন্য এসেছে, তা'কে এতটুকু একটু যত্ন ক'রে খেতে দিতে পারলে না লজ্জায় ম'রে যেতে ইচ্ছে করে যে!"

শুভেন্দু আপন মনে বকিয়া যাইতে লাগিল। নীলিমা আর সে সব কথা কানে না তুলিয়া নিজের কার্য্যে কৃতসঙ্কল্প হইয়া চলিয়া গেল। রান্নাঘরে রাঁধা আহার্য্য সামনে করিয়া স্বর্ণলতা হেঁটমুখে বসিয়া বোধ করি বা নীরবে অশ্রুপাতই করিতেছিলেন। মেয়ের পায়ের শব্দে চকিত চক্ষুতে চাহিয়া দেখিয়া ঈষৎ সঙ্কুচিত হইলেন, সে-ও যে তাঁহাকে ভৎর্সনা করিতেই আসিতেছে, এ বিষয়ে তাঁর মনে কোন দ্বিধাই ছিল না।

কিন্তু রূঢ় ও কঠিন সম্ভাষণের পরিবর্ত্তে মেয়ে ডাকিল, "মা।"

তাহার গলার অতি নম্র ও অত্যন্ত ব্যথিত স্বরে জননীর নিজের অন্তরের রাশি রাশি পুঞ্জীভূত অকথ্য বেদনাসিন্ধু উথলিত হইয়া উঠিতে গেল। অতিশয় মর্ম্মভেদী বিলাপপূর্ণ কণ্ঠে প্রত্যুত্তর দিলেন, "মা?"

"তুমি উনোন নিবিও না, মা! আমি ভাল ময়দা, ঘি, হাঁসের ডিম, আলু সব রামাকে দিয়ে আনিয়ে দিচ্ছি। সেই সব দিয়ে দাদাদের খাবার ক'রে দিতেই হবে, না হ'লে দাদা না খেয়ে এক্ষুনি চ'লে যাচ্ছে।"

স্বর্ণলতা তড়িৎস্পৃষ্টার মত চমকিয়া চাহিলেন; তাঁহার অবরুদ্ধ বক্ষ

ঠেলিয়া ক্ষুধিত প্রাণের আর্ত্ত স্বর ছুটিয়া বাহির হইল, "ও সব তুই কোথা পাবি মা? কোথা থেকে আন্‌বি ?"

নীলিমা সঙ্কল্পদৃঢ় স্থির স্বরে সংক্ষেপে শুধু উত্তর করিল, "সে আমি আনাচ্ছি কি না, দেখো না! আমি এক্ষুনি আস্‌চি।"

ঘণ্টা দুয়ের ভিতরেই আহার্য্য প্রস্তুত হইয়া গেলে প্রফুল্ল স্মিতমুখে নীলিমা আসিয়া দ্বারের নিকট দাঁড়াইল। ইতোমধ্যে একটা চিরপরিত্যক্ত ঘরকে ঝাঁটপাট দিয়া একখানা তক্তপোষের উপর ময়লা তোষক ফর্সা চাদরে ঢাকা দিয়া সে শুভেন্দুদের বসিবার স্থান করিয়া দিয়া গিয়াছিল; একটি বহুদিনের পোরসিলেনের বাতিদানীতে একটি বাতি কিনিয়া আনিয়া সে জ্বালিয়া দিয়াছিল। শুভেন্দু সেইখানে শুইয়া ক্ষুধার জ্বালায় জ্বলিতে জ্বলিতে মনে মনে নিজের পিতা হইতে আরম্ভ করিয়া সুশীলের পিতার পর্য্যন্ত মুণ্ডপাত করিতেছিল এবং বিলম্ব দেখিয়া নীলিমার কৃতকার্য্যতার উপরেও ভীষণ সন্দিহান হইয়া পড়িয়া উহাকে একান্তভাবে গালি পাড়িতেছিল। অবশ্য ইহাও মনে মনে। সুশীল কয়েকবার কথাবার্ত্তার চেষ্টা করিয়া বন্ধুর নিকট ধমক খাওয়ায় নিরুপায়ে চুপ করিয়া বসিয়াছিল। রান্নাঘরে স্বর্ণলতার নিকট উপস্থিত হইবার প্রবল লোভ হইতে থাকিলেও শুভেন্দুর মনের অত্যন্ত বিরক্ত অবস্থা দেখিয়া ভরসা করিয়া সে কথা সে প্রকাশ করিতে পারে নাই। অথচ শুভেন্দুর এই আগ্রহহীন মাতৃমিলনের সকল ব্যর্থতাই তাহার মাতৃহীন চিত্তকে বিস্ময়ে ব্যথায় যেন স্তম্ভিত করিয়া দিয়াছিল। সেই সঙ্গে ঐ দুঃখসহিষ্ণু দীন মূর্ত্তি অভাগী নারীর জটিল জীবনযাত্রার চিত্র তাহার গভীর সহানুভূতিপূর্ণ তরুণ চিত্তকে যেন মমতার মন্দাকিনী-ধারায় অভিষিক্ত করিতে লাগিল। সুশীলের অত্যন্ত আগ্রহ হইতে লাগিল, আহা, যদি সে ঐ বেদনাভারাতুর স্নেহবুভুক্ষিত

মাতৃহৃদয়কে নিজের ক্ষুধিত চিত্তের ভক্তিপ্রেমে ভরাইয়া তুলিতে পারিত!

নীলিমার হাতে পূর্ব্বে কতকগুলা কাঁচের চুড়ি থাকিত, এখন তাহাও ছিল না। মিশনের অনেক মেয়ে ও টীচারের অনুকরণে সে এখন শুধু হাতেই থাকে। বাজারের সব চেয়ে কম দামী বাজে চুড়ি ঘৃণা করিয়াই সে পরে না। নিজের আসার আগমনী জানাইবার কোন উপায় না থাকায় অগত্যাই সেইখানে থাকিয়া সে ডাকিল, 'দাদা!"

শুভেন্দুর বোধ করি একটুখানি তন্দ্রা আসিয়া থাকিবে. তাহার সাড়া না পাইয়া অগত্যা সুশীলের দিকে ফিরিয়া মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "মা জিজ্ঞেস করলেন, আপনাদের খাবার এইখানে আনা হবে?"

সুশীল এই প্রশ্নে একেবারে ত্রস্ত হইয়া উঠিল। আগ্রহ উত্তেজিত কণ্ঠে সে তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "সে কি, না না। এখানে কেন? এই আমরা তাঁ'র কাছেই যাচ্ছি—শুভদা! ও শুভদা! কি বিপদ! ঘুম দিচ্চো নাকি? চল চল, খেয়ে আসা যাক।"

শুভেন্দু ঘুম ভাঙ্গিয়া কাঁচাঘুম ভাঙ্গার বিরক্তিতে মুখ অন্ধকার করিয়া উঠিয়া বসিল এবং সামনেই নীলিমাকে দেখিতে পাইয়া বিরক্তি নীরসকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "হ্যালো! কি ব্যাপার বল ত? ছাই-পিণ্ডি কি দেবে, দিয়েই ফেল না কষ্ট ক'রে আশায় আশায় আর কতক্ষণ রাখবে? রাত-তো শেষ হয়ে এলো এদিকে।"

শুভেন্দুর নিজের বোনের প্রতি এই শুষ্ক সম্ভাষণে সুশীল যেন চোর হইয়া গেল। সে শুষ্ক মুখে উঠিয়া তাড়িতাড়ি শুভেন্দুর হাত ধরিয়া তাহাকে বলিল, "উনি তো আমাদের কখন্ থেকেই ডাকাডাকি করছেন, তোমারই যে ঘুম ভাঙ্গে না।"

আহারে বসিয়া শুভেন্দু আয়োজন দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল।

ঘুমাইয়া সে স্বপ্ন দেখে নাই ত? কলের ময়দার ধপধপে ফুল্‌কো লুচি, পটল আলু ভাজা, হাঁসের ডিমের কালিয়া, কিস্‌মিসের চাটনী, সন্দেশ রসগোল্লা একখানা রেকাবে কয়েক টুকরা বোম্বাই আম। শুভেন্দু বিস্মিত উল্লাসে উচ্চধ্বনি করিয়া উঠিল "হ্যালো! এ বাড়ীতে কি কর্ত্তা বদল হয়ে আমিই বাড়ীর মালিক হয়েছি নাকি? এ সব কোথা থেকে এলো? তোর খৃশ্চান স্কুলের টিচাররা কি তোকে আলাদীনের প্রদীপ দিয়েছে ভোর নাকি রে? বাঃ বাঃ খাসা মেয়ে তুই!"

স্বর্ণলতার প্রীতিপ্রসন্ন সজল চোখের স্নিগ্ধ দৃষ্টি গভীর স্নেহে নীলিমার আনত মুখের উপর নীরব আশীর্ব্বাদের কিরণ বর্ষণ করিয়া আসিল। সে যে আজ এই আনন্দমিলনের দিনকে ব্যর্থ হইতে না দিয়া মায়ের প্রাণকে এই একটি দিনের জন্যও সার্থকতার সুখে ভরিয়া তুলিতে সহায়তা করিয়াছে, তাহার মূল্য যে এই চিরদুঃখিনীর কাছে কত বড়, তা অন্তর্য্যামী ভিন্ন জানিবে কে? সুনীল সকল কথা না বুঝিলেও স্বর্ণলতার আনন্দস্মিত মুর্ত্তিখানি বিপুল আনন্দে পূর্ণ হইয়া নিরীক্ষণ করিল ও তাহার পর তাঁহারই দৃষ্টির অনুসরণে অদূরবর্ত্তিনী স্তব্ধস্থির পাষাণমূর্ত্তিটির মতই অচলা তরুণীর মুখের দিকে সস্নেহ দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিল। কেবল সেই আনন্দমিলনের সকলটুকু আনন্দের বাহিরে গভীর ভাবাক্রান্ত ও নিরানন্দ হইয়া রহিল নীলিমার অপরাধপীড়িত মন।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

স্বামীস্ত্রীর মধ্যে প্রেম সর্ব্বত্রই থাকে না; কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই অন্ততঃ তাহার একটা ভাণও থাকে, স্বর্ণলতাদের দাম্পত্য জীবনে আর যাই কিছু থাক না কেন ইহার ভিতরে মিথ্যার কোন আবরণই ছিল না। বিগত-প্রায় যৌবন সীমায় পৌছিয়া কোন অতীত স্মৃতি আকড়িয়া ধরিবার জন্য এই প্রৌঢ় দম্পতীর প্রাণের কোণেও বুঝি কখনও ব্যাকুলতা টুকু জাগে নাই। স্ত্রী শুধু ঘরকরণার যন্ত্রস্বরূপই ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছিল। সহসা আজ নিঝুম স্তব্ধ রজনীর ঠিক মধ্যযামে নিদ্রাভঙ্গ হইয়া অনেকক্ষণ বিনিদ্রাবস্থায় চিন্তার পরে কি যেন একটা সঙ্কল্প স্থির করিয়া লইয়া অনুকূলচন্দ্র শয্যাত্যাগ করিলেন। চিরদিনের পর অকস্মাৎ আজ গৃহিণীকে সচিবের পদ দিবার প্রয়োজন ঘটিয়াছিল। পাশের ঘরে স্বর্ণলতা নীলিমার সহিত গভীর নিদ্রামগ্না। অন্ধকারে আন্দাজে আন্দাজে ঘরের মধ্যে আসিয়া চাপাগলায় অনুকূল ডাকিলেন, "গিন্নি! বলি ওগো! একবার উঠে এস ত?"

ঘুমের ঘোরে ধড়মড়িয়া উঠিয়া বসিয়া অন্ধ সন্দেহে স্বর্ণলতা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে?"

"ওগো, আমি। বলি একবার এসোই না, আমার এই বুকটায় কেমন একটা ব্যাথা ধরলো, একটু হাত বুলিয়ে দাওসে' দেখি।"

স্বর্ণলতা মনে মনে ইষ্টদেবকে স্মরণ করিলেন, ভাগ্যে ঘণ্টা দুই পূর্ব্বে এই ব্যথাটা ধরে নাই!

নিজের বিছানায় ফিরিয়াই অনুকূলচন্দ্রের ব্যাথার সেবা করাইবার

ইচ্ছাটা সহসা বদলাইয়া গেল। তিনি তখন অত্যন্ত চাপা গলায় মৃদুস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "দেখ, তোমার ওই আইবড় কার্ত্তিক ধেড়ে মেয়েটাকে পার করবার একবার এমন সুযোগ আর কখনও এ জন্মে পাবে না। ভুবন রায়ের ছেলেটাকে যদি হাত ক'রে ওর গলায় মেয়েটাকে গছাতে পার, তা'রই জন্যে কাল থেকে লেগে পড় দেখি। যেমন ক'রে হোক, এ কায তোমার করতেই হবে।"

এই প্রস্তাব অকস্মাৎ এমন অপ্রত্যাশিতভাবে পাইয়া স্বর্ণলতা ভীষণভাবে চমকিয়া উঠিলেন ও তাঁহার মুখ দিয়া আচম্‌কা বাহির হইয়া গেল—"আমার কপালে এত সুখ কি হবার? সুশীল আমার জামাই হবেন!"

অনুকূল স্থিরসঙ্কল্পের স্বরে জবাব দিল, "কেন হবেন না? অতবড় ধিঙ্গি মেয়ে রয়েছে, ছেলেও খোকাটি নয়, দুটোকে খুব মেলা মেশা করতে দাও, মেমসাহেবের মতন, তা'র পর নিজেরাই বিয়ে করতে চাইবে। সাহেবদের ত ওই রকমই হয়ে থাকে। ওতে দোষই বা কি! রাজার দেখে না শিখে কার দেখে শিখিবে?"

স্বামীর-চিরজীবনের সকল যুক্তি নির্ব্বিচারে ও নির্ব্বিবাদে পালন করাই স্বর্ণলতার অভ্যাস, তাহাতে মন সায় দিক, আর না-ই দিক, প্রতিবাদ তিনি কখন কোন কার্য্যেরই করেন না। কিন্তু আজিকার এই পরামর্শটি তাঁহার বেশ মনঃপূত হইলেও তিনি ইহাকে নির্ব্বিচারে ও নির্ব্বিবাদে গ্রহণ করিতে পারিলেন না। আশাহতভাবে ক্ষীণ প্রতিবাদে উত্তর করিলেন, "সুশীলের বাপ রয়েছে, সে কি নিজের ইচ্ছায় বিয়ে করতে পারে? তার চেয়ে ভুবন বাবুকে বল্লে হয় না যে, যদিই তিনি দয়া ক'রে ওকে নেন, তাঁর দয়ার তো আর শেষ নেই যদিই—"

অনুকূল অসন্তোষের চুক্ চুক্ শব্দ করিয়া উঠিলেন, "ওগো, তোমার দয়ার সাগরকে সে কথা আমি বলতে ভুলে যাইনি। তিনি তাহার কাটান্ জবাব বহুকাল পূর্ব্বেই দিয়ে দিয়েছেন। কোন্ বড়লোকের মেয়ের সঙ্গে নাকি ছেলের ছোটবেলা থেকে বিয়ের কথা দিয়ে গরীবের মেয়েদের পথ তিনি বন্ধ রেখেছেন। ছোক্‌রা চালাক কি কম! দেখছো না, তোমার ছেলেটাকে কি রকম জেণ্টেলম্যান বানিয়ে ফেলেছে! তুমি কি মনে কর ওকে নিজের জামাই করবার মতলব ওর মনে নেই? তাই আমিও তা'র শোধ নেব ভেবেছি। ওর কাছে ছেলের বিয়ের টাকা তো আর চাইতে যেতে পারব না, আমার ছেলে তো ওরই হাতে। তাই যখন হাতে পেয়েছি, তখন ওর ছেলেকেও আমি ছাড়ছি নে। ওর ঘাড়ে নীলিকে গছাবো, তবে, আমার নাম অনুকূল চক্রবর্ত্তী। ছেলে নিজে যেচে ওকে বিয়ে যদি নেহাৎ নাই করে, তবে জবরদস্তিতে করবে, করতে হবে আলবৎ।"

স্বর্ণলতার বুকের ভিতর আশার ক্ষীণ শিখা নির্ব্বাপিত হইয়া গিয়া যেটুকু তীক্ষ্ণ ব্যথা মোচড় দিয়া উঠিয়াছিল, তাহাকেও আড়াল করিয়া সহসা এই কথায় জাগিয়া উঠিল--প্রচণ্ড একটা আতঙ্ক। সর্ব্বশরীর মনে শিহরিয়া উঠিয়া তিনি আর্ত্তস্বরে কহিয়া উঠিলেন, "অমন কথা বলো না। সুশীলের বাপের মতের বিরুদ্ধে সে কেন তোমার মেয়ে বিয়ে করতে যাবে? তুমিই বা তাকে কোন্ হিসাবে সে কথা বলবে? সে কায নেই—সে কায নেই আমাদের তেমন কপাল নয়।"

স্বর্ণলতা হতাশাক্ষুব্ধ ও ভয়ার্ত্ত কণ্ঠস্বরে চাপা দিয়া অনুকূলের ক্রুদ্ধ কণ্ঠ সপ্তমে বাজিয়া উঠিল, সেই শব্দে জানালার বাহিরে কার্ণিশে উপবিষ্ট একটা কালপেঁচা অকস্মাৎ ভয় পাইয়া চ্যাঁ চ্যাঁ করিতে করিতে চেঁচাইয়া উঠিয়া উড়িয়া গেল।—স্বর্ণলতার দুর্ব্বল বুক তাহাতে দুর্ দুর্ করিয়া উঠিল।

"কপাল আমি তৈরী কর্‌ব।—কপাল আবার কি? কপাল নিজের হাতে। তখন সুযোগ আমি নষ্ট হ'তে দেবো না। এ সুযোগ মানুষ দু'বার ক'রে পায় না। তুমি আমার সাহায্য না কর চুপটী ক'রে বসে থাক। কোন রকমে বাধা দিয়েছ কি মরেছ! সেটী ঠিক জেনে রেখে দিও। এর বিরুদ্ধ একটী কথা কইলে কি গলা কেটে ফেলবো!"

একটা ঘোর অমঙ্গলের আশঙ্কায় স্বর্ণলতার বাম অঙ্গ স্পন্দিত ও তাঁহার সর্ব্বশরীর স্বেদজলে অভিষিক্ত হইয়া গেল। শ্বাস-প্রশ্বাস তাঁহার জীর্ণ বক্ষের মধ্যে যেন চাপিয়া থাকিয়া বহিরাগমনে একান্ত অসম্মতি জ্ঞাপন করিতে লাগিল। তাহার পর কোন্ সময়ে মাথা ঘুরিয়া তিনি যে সশব্দে ঘরের মেজের উপর মুখ থুবড়াইয়া পড়িয়া গিয়া সংজ্ঞা হারাইলেন, তাহা তিনি জানিতেও পারিলেন না।

যখন তাঁহার চৈতন্যোদয় হইল, অবসন্ন দেহভার নিতান্তই হালছাড়া অবস্থায় পৌঁছিয়াছে। অন্তর্জ্ঞানের উদয় হইলেও তাহার বহিঃপ্রকাশ অতি ধীরে অত্যন্ত বিলম্বে একটু একটু করিয়া প্রকটিত হইতে লাগিল। মনে হইল, চিরসংযমের বাঁধভাঙ্গা এ অবসাদ আর কখনও সম্পূর্ণ ঘুচিয়া তাঁহার দেহ-মনকে পূর্ব্বাবস্থায় ফিরাইতে পারিবে না। এই জীবন্মৃত অবস্থাতেই তাঁহাকে হয়ত বা থাকিতে হইবে। রাত্রির শেষামে অকস্মাৎ নিদ্রাভঙ্গে ভীত-ত্রস্ত গৃহবাসী অনুকূলের উচ্চ চীৎকারে তাঁহার কক্ষে সমবেত হইয়া দেখিল, তিনি পাগলের মত বুক চাপড়াইতেছেন ও চেঁচাইতেছেন, "গিন্নি! ওগো গিন্নি! বলি গিন্নি! ওগো! সত্যি কি আমায় ফেলে তুমি চ'লে গেলে নাকি? হ্যাঁ গা, কি রকম পাষাণ তুমি! এমন করেই কি ভাসিয়ে যেতে হয়?"

নীলিমা মায়ের মুখের দিকে চাহিয়াই স্তব্ধ ও গতিহীন হইয়া রহিল,

এক পা-ও আর সে নড়িতে বা কাছে যাইতেও পারিল না। মা'কে এমন অবস্থায় সে ত আর কখন দেখে নাই!

শুভেন্দু এবং সুশীলও আসিয়াছিল। শুভেন্দু কর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া ব্যথিত চোখে মায়ের শাকবর্ণ মুখের ম্লানচ্ছবি দেখিতে লাগিল এবং বাপের কান্নাকে মনে মনে কষ্ট বিদ্রূপে তিরস্কার করিতে লাগিল। সুশীল শুধু এই সকরুণ দৃশ্যে নিজের আদ্রদৃষ্টি কোনমতে ফিরাইয়া এক ঘটি জল ও একখানা পাখা সংগ্রহ করিয়া আনিয়া মূর্চ্ছিতার শুশ্রূষায় মনোযোগী হইতে পারিল।

রোগিণীর চেতনা ফিরিয়া আসিলে অনুকূল হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া সুশীলকে জড়াইয়া ধরিলেন, "বাবা সুশীল! তোমার জন্যেই শুভেন্দুর গর্ভধারিণী এ যাত্রাটা রক্ষা পেয়ে গেলেন, ভাগ্যে তুমি এসেছিলে বাবা! না হ'লে আমার কি হ'ত?"

গতকল্য হইতে রুক্ষভাষী, শুষ্কচিত্ত কৃপণের প্রতি যতটাই বিতৃষ্ণা সুশীলের মনে জাগিয়াছিল, ঠিক সেই পরিমাণেই সহানুভূতি এবং শ্রদ্ধা তাহার স্থলাধিকার করিল। বাহিরটা তাহার যতই কঠোর দেখাক, অন্তরের মধ্যে যে প্রচ্ছন্ন ও প্রচণ্ড প্রেমের নির্ঝর লুকান আছে, ইহা স্থির করিতে তাহার বিলম্বমাত্রও হইল না এবং না জানিয়া অবিচার করার গ্লানিতে সে নিজের প্রতি বিশেষভাবেই বিরক্ত হইল।

মা'কে চোখ মেলিতে দেখিয়া নীলিমা কাছে গেল, স্বর্ণলতার বক্ষে গভীর অবসাদের সঙ্গে সঙ্গেই একটা তৃষিত ব্যাকুলতা ফুটিয়া উঠিল। রক্তরাগশূন্য পাংশু ওষ্ঠ কম্পিত করিয়া তিনি কি যেন বলিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কণ্ঠের মধ্যে সামান্য একটা অস্পষ্ট শব্দ ভিন্ন আর কিছুই বাহির হইল না। সুশীল তাড়াতাড়ি মুখে এক চামচ জল দিয়া ব্যগ্র হইয়া বলিল, "চুপ করুন, মা! কথা এখন কইবেন না।"

তাড়াতাড়িতে সে জ্যেঠাইমা'র পরিবর্ত্তে যে স্বর্ণলতাকে শুদ্ধ 'মা' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিল, তাহা তাহার নিজের কানে ধরা না পড়িলেও অনুকূল ও নীলিমা দু'জনকারই কানেই উহা ঠেকিয়াছিল এবং ওই একটি শব্দই দু'জনের মনে দুই প্রকার অর্থ বোধ করাইল। নীলিমা এ ঘনিষ্ঠতায় এত বড় বিপদেও যেন একটা কূল দেখিতে পাইল এবং তাহার গুণমুগ্ধ মোহিত মনে তখনই এই কথাটা জাগিল যে, ইহার আজই এখনই সুশীল তাহাদের ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে পারিবে না। অনুকূল মনে মনে বলিলেন, "নিজের মুখেই সম্বন্ধটা স্বীকার ক'রে নিলে বাছাধন, আর তুমি যাবে কোথায়? যাহোক, গিন্নি এ খেলাটা খেল্লে ভালই, এ বেশ ভালই হইল! হাঁ।

সে দিন ঘরের ছেলে এবং পরের ছেলে উভয়েরই যাওয়া বন্ধ হইয়া গেল। কেহ কাহাকেও অবশ্য থাকিতে আমন্ত্রণ করিল না, কিন্তু বাড়ীর এই আকস্মিক বিপদে যাইবার কথাই বা কহিবে কে? তবে খানিকটা বেলা বাড়িলে এবং স্বর্ণলতা অনেকখানি সুস্থ হইয়াছেন বিশ্বাসে নিজের চিন্তায় প্রত্যাবৃত্ত হইয়া শুভেন্দু সবিস্ময়ে ব্যাপারটা ধারণা করিতে গিয়া মনে মনে পরিতপ্ত হইয়া উঠিল। ট্রেণের সময় চলিয়া গিয়াছে মনে পড়িতেই ট্রেণ ফেলের কারণটা মনে পড়িল, মায়ের প্রতি মনটা বিষম বিরক্ত হইয়া উঠিল। মা কি অজ্ঞান হইবার আর দিন বা সময় পান নাই? এই ত এই সময় তাহারা চলিয়া গেলে পর অজ্ঞান হইয়া পড়িলেও চলিত! সুশীল তখনও স্বর্ণলতার মাথার কাছে বসিয়া তাঁহাকে বাতাস করিতেছে, নীলিমা নিতান্ত হতভম্বভাবে তাঁহার পায়ের কাছে বসিয়া আছে। মায়ের অর্দ্ধমুদিতচক্ষুর, শিরাসঙ্কুল পাণ্ডুমুখের ভাবহীনতা ও অতি মৃদু শ্বাসমাত্রে জীবিতচিহ্নযুক্ত শীর্ণ দেহ তাহার ভয়ার্ত্ত মনকে যেন নিরাশ্বাসে শেষ সীমায় পৌছিয়া দিতেছিল। প্রাণপণে চোখের জলকে

সে ঠেলিয়া রাখিলেও সমস্ত বুক জুড়িয়া তাহার একটা প্রবল ক্রন্দনের রোল উঠিয়া তাহার মনটাকে হাহাকারে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতেছিল। তা'র অন্তরের সেই অব্যক্ত আর্ত্তনাদ কেবলই বলিতেছিল, "মা আমা'র উঠিবেন না।" যে মানুষ জীবনে কখনও এক মুহূর্ত্ত শোয় নাই, তাহার এই যে নিশ্চিন্ত শয়ন, এ যে তাহার শেষ শোওয়া,—সে খবর তাহার জানিবার বাকি ছিল না। তাই বুক যেন তাহার ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল।

শুভেন্দু আসিয়া বিরক্তিবিবস মুখে ডাকিল, "নীলি! শুনে যা।"

নিতান্ত অনিচ্ছা সত্বেও নীলিমাকে উঠিতে হইল।

শুভেন্দু নীরসস্বরে কহিল, "আমাদের আজকে গতিটা কি রকম হবে? ট্রেণ তো ওদিকে ফেল হয়ে গেল, আবার গোটা চব্বিশটি ঘণ্টা এই গারদ-ঘ'র বাস করতে হবে, একটু চা টা কি দেবে, না আজও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠপ্রদর্শনেই সারবে?"

নীলিমা ভাইএর কথায় মাথার উপর বেদনা বোধ করিলেও নীরবে সটুকু সহিয়া লইয়া তার পর মুখ তুলিয়া বলিল, "জোগাড় ক'রে দিচ্ছি, তুমি মা'র কাছে একটু বসবে?"

শুভেন্দু ঠোঁট বাঁকাইয়া বলিল, "কি করবো ব'সে? আমাদের ডাক্তার সাহেব তো খুব লেগে পড়েছেন দেখতে পাচ্ছি! আমি বাপু ওসবের মধ্যে নেই। জানিওনি কিছু, আর পারিওনে। আচ্ছা, এখন চল দেখি, চা আর কাল রাত্তের সেই ডিমের কালিয়ার ডিম যদি কিছু বাকি প'ড়ে থাকে ত তাই-দুটো হাফ্‌বয়েল ক'রে দে, দুজনে কোন-গতিকে ব্রেকফাষ্টটা সেরে নিই।"

নীলিমার বিষাদবিষণ্ণ মুখ ক্ষণেকের জন্য ঘৃণার বিরাগে আরক্ত হইয়া উঠিল, তার পর সে ভাব দমন করিয়া লইয়া সে সনিশ্বাসে এই কথাই মনে মনে ভাবিল যে, মা-বাবার কাছ থেকে ওই বা কি স্নেহ-যত্ন করে

পেয়েছে, যাতে ক'রে ওদের পরে ওর মনে শ্রদ্ধা ভালবাসা জন্মাবে? আমি ত বুঝি মা'র কি দুর্দ্দশা, তবু সকল সময় আমারই মাথার ঠিক থাকে না। তাত ও বেচারীও দুঃখী কম নয়। স্নেহ না জানতে পারলে কি আর শ্রদ্ধা আসে?

অনুকূলচন্দ্র তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকিয়া স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিয়াই চোখে হাত চাপা দিলেন। কাঁদো কাঁদো গলায় কহিলেন, "গিন্নীর মনে কি শেষে এই ছিল! এমন করে শুয়ে পড়লেন! আহা, সুশীলকে যে একটু যত্ন আত্তি করবো, তারও আমার উপায়টি আর রইলো না। বাবা সুশীল! তুমি কিছু মনে করো না, বাবা! এ ত তোমারই নিজের ঘরদোর, তুমি নিজে দেখেশুনে নিয়ে কষ্ট ক'রে দুটো দিন থেকে যাও, আমি অকূলে একটু কূল পাই। এ বিপদে আমার মাথায় যেন বজ্রাঘাত পড়েছে!"

সুশীল প্রবল সহানুভূতিতে বিগলিত হইয়া গিয়া আগ্রহপ্রদীপ্ত মুখে তাড়াতাড়ি কহিয়া উঠিল, "কিছু ব্যস্ত হবেন না, জ্যাঠামশাই! আমি জ্যাঠাইমা না সারা অবধি যেতেই পারবো না, তা ছাড়া আমি বাবার কাছে হোমিওপ্যাথিক কিছু কিছু শিখেছি, আমার একটা বাক্সও ত আছে।"

"বটে, তুমি ডাক্তারী পড়েছো? তা হলে ত আর কথাই নেই। না হ'লে—এই এক্ষুণি মনে করছিলুম, যজ্ঞেশ্বর ডাক্তারকে একবারটি না হয় ডাকিয়েই আনাই। বলি, হঠাৎ এ রকমটাই বা হলো কেন? তা যখন তুমি ডাক্তার রয়েছ, তখন আর বাইরের পর ডাক্তার এসে বেশী কি করতে পারবে?"—

সুশীল উৎকণ্ঠিত ও ব্যগ্র হইয়া উঠিয়া তৎক্ষণাৎ কহিল, "আমিও আপনাকে বল্‌ব বল্‌ব মনে করেছিলুম যে, একজন ডাক্তার দেখানই ভাল। আমি তো তেমন কিছুই জানিনে? বই দেখে পড়া বই ত নয়,

চিকিৎসার আমি কি জানি একজন বিচক্ষণ ডাক্তারের দেখা খুবই দরকার। আমি তার অ্যাসিষ্টান্ট হ'তে পারব অবশ্য।"

অনুকূল বিস্ময়-প্রদীপ্ত মুখে দ্রুতস্বরে উত্তর করিলেন, "বিচক্ষণ ডাক্তার! তুমি কোন ডাক্তারকে কখন বিচক্ষণ হ'তে দেখেছ, সুশীল? ঐ যতক্ষণ শিক্ষানবীশ থাকে, ডাক্তার ততক্ষণই ভাল। পড়া ছেড়ে যেই প্র্যাকটিসনার হ'লেন, ভিজিট ক'রলেন, অমনি তাঁ'র মাথাটি খাওয়া হয়ে গেল! কিসে ডুটোর যায়গায় চারটে ভিজিট ক'রবেন, এই চিন্তাই তাঁ'র তখন একমাত্র জপমালা হয়ে বসল। রোগী মেয়ে কি পুরুষ, তাও তখন তাঁ'রা আর ভাল ক'রে দেখবার অবসর পান না। কতকগুলি জিনিষ কাঁচাতেই মিষ্টি থাকে, বাবা। ডাক্তার তা'র মধ্যে একটি।"

সুশীল যদিও ডাক্তারজাতীয় জীবদিগের সকলকেই ঠিক এই প্রকার "ভ্যাগাবান্ড" জাতীয় বলিয়া বিশ্বাস করিল না, তথাপি এ ক্ষেত্রে যে কারণেই হউক, তাহাকে শেষে ঐকামতাবলম্বন করিতে হইল। প্রতিবাদ বৃথা জানিয়া নীরব হইয়া রোগীর দিকে চাহিতেই দেখিতে পাইল, অসহায় ও আনায়বদ্ধ জীববিশেষের মতই ভাষাভরা মৌন চক্ষুতে স্বর্ণলতা তাহারই মুখের দিকে অনিমেষে চাহিয়া আছেন। সে দৃষ্টির সঞ্চলিত স্নেহসিন্ধু মুহূর্ত্তেই অনুভব করিয়া সুশীলের দুই চক্ষু অশ্রুতে পূর্ণ হইয়া উঠিল এবং দেখিতে দেখিতে তাহারই প্রতিক্রিয়ায় স্বর্ণলতার দু'চোখের কোণ গড়াইয়া দুইটি অশ্রুর ধারা বহিয়া গেল। সুশীল এ আশা নিরাশার নিশান অশ্রুস্রোতের মূলানুসন্ধান না পাইলেও সে অশ্রু তাহারই এই সেবাটুকু হইতেই সঞ্জাত, এই বিশ্বাসে মনে মনে দৃঢ় হইয়া এই বিচার করিল যে, যেমন করিয়াই হউক, ইঁহাকে সুস্থ না করিয়া সে এখান হইতে নড়িবে না, আহা বেচারী বড় দুঃখ, আর তারও তো মা নাই।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ

পৃথিবীকে অচলার মতই দেখাইলেও যেমন ভূগোলশাস্ত্রে তাহার বিপরীত প্রমাণ পাওয়া যায়, মানুষের জীবনস্রোতকেও এখন কখনও রুদ্ধগতি বোধ হইলেও বাস্তবিকই কালচক্র কোন স্থানে এবং কোন দিনই যে গতিহারা হইয়া থাকে না, সহসা অতর্কিতে সে তাহা একদা প্রমাণ করিয়া দেয়। স্বর্ণলতার দশমবর্ষীয় জীবন নদী চল্লিশের পরেও ঠিক একই বিধিতে বদ্ধ হইয়া চলিয়া আসিলেও সে দিনের ভোরে সেই যে সহসা স্রোতোহত হইয়া পড়িয়াছিল, তখন হইতে তাঁহার জীবন-নদীর মুখ ফিরিয়া দাঁড়াইল, পুরাতনে সে আর প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারিল না। সুশীল তাহার যথাসাধ্য, এমন কি, তাহারও চেয়ে অধিক করিয়াছিল। অর্থাৎ নিজে হালে পানি না পাইয়া গৃহস্বামীর অজ্ঞাতে যজ্ঞেশ্বর ডাক্তার, নন্দলাল কবিরাজ, এমন কি, ঠিক সম্মুখবর্ত্তী প্রতিবেশী সেই কেরামতুল্লার অনুরোধে হাকিম নসীরকেও ডাকিয়া আনিয়া রোগী দেখাইয়াছিল, কিন্তু সকল ফলই সমান হইল ;—অর্থাৎ সবই অফলা হইয়া গেল। চিকিৎসাশাস্ত্রের বিভিন্ন পথাবলম্বী তিন ব্যক্তির মধ্যে ঔষধ-নির্ব্বাচনে যতই কেন না অনৈক্য ঘটুক, রোগনির্ণয়ে কিন্তু সকলেই একতাবলম্বন করিয়াছিলেন। রোগ যে এপোপ্লেক্সি, তাহাতে সন্দেহ নাই। রোগীর জীবনে আপাততঃ ভয় নাই বটে, কিন্তু তাহাতে ভরসাও কম। যে কোন উত্তেজনায় প্রাণবিয়োগ হইতে পারে। বাক্‌শক্তি চিরদিনের মত একেবারে চলিয়া গিয়াছে, উহা আর ফিরিবে না।

যজ্ঞেশ্বর বাবু বলিলেন, "ইঁহার জীবনে যে এইরূপ ঘটনাই ঘটিবে, তাহা যে কেহ অনুমান করিতে পারিত। তবে এ অবস্থার চেয়ে ইঁহার মৃত্যু ঘটিলেই শুভ হইত এবং শীঘ্রই তাহা ঘটাও কিছু অসম্ভব নহে।"

ডাক্তার চলিয়া গেলে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক সুশীল ভাবিল, বাস্তবিকই ডাক্তারীতে মানুষের মনকে কতখানি কঠোর করে। আহা, বেচারী জ্যেঠাইমা! না, উঁহাকে ভাল করিতে হইবে। না হইলে নীলিমার কি হইবে?

সুশীল স্বর্ণলতার জীবন-মরণের মধ্যে যে নীলিমার জন্যই বিশেষ করিয়া চিন্তিত হইল, তাহার কারণ, এ কয় দিন সে, কি দিনে কি রাত্রিতে সদাসর্ব্বদাই নীলিমার সান্নিধ্যে থাকিয়া তাহাকে ভাল করিয়াই দেখিয়াছে। তাহার অবস্থা যে কতদূর শোচনীয়, তাহাও সে এই সুযোগে অন্তর দিয়া অনুভব করিয়াছে। এই মা ভিন্ন জগতে যে তাহার মুখ চাহিতে দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই, ইহা বুঝিয়াই এই দুর্দ্দশা পালিতা কিশোরীর প্রতি তাহার স্নেহ সহানুভূতির অবধি ছিল না। তাহার স্বর্ণলতাকে বাঁচাইবার ইচ্ছা ও চেষ্টা ইহার মুখ চাহিয়াই যেন শতগুণে বাদ্ধিত হইয়াছিল। তাই যজ্ঞেশ্বর বাবুর মন্তব্যে তাহার মনটা বিশেষ-ভাবেই বিমর্ষ হইয়া গেল। এমন সময় দ্বারের দিকে চাহিতেই দেখিল, নীলিমা আড়ষ্ট কাঠের মতন দাঁড়াইয়া আছে। সে সবই শুনিয়াছে বুঝিয়া সুশীলের মনে বড় দুঃখ হইল, কাছে আসিয়া স্নেহশীতল কণ্ঠে সে কহিল, "ও সব বাজে কথায় মন খারাপ করো না, আমি বলছি, জ্যেঠাইমা ভাল হবেন!"

দৈববাণীর মতই এই দৃঢ় উচ্চারিত আশ্বাসবাণী কয়টি নীলিমার ভয়ত্রস্ত দুঃখবিদারিত মনের উপর শীতল জলের ধারার মতই নিপতিত

হইয়া তাহাকে যেন এক মুহূর্ত্তে জুড়াইয়া ছিল এবং গভীরতম কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া উঠিয়া সে আত্মহারাবৎ সেই একমাত্র আশ্বাসদাতার দুই পায়ের উপর অকস্মাৎ আর্ত্তভাবে কাঁদিয়া লুটাইয়া পড়িল।

সুশীল এই আকস্মিক বন্যাপ্লাবনের জন্য আদৌ প্রস্তুত ছিল না। সে নীলিমার এই কার্য্যে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিল। সে যে কি বলিবে, কি করিবে, কি করিয়া উহাকে পায়ের উপর হইতে উঠাইবে, কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া খানিক ক্ষণ বিপন্নভাবে থাকিয়া উহাকে কাঁদিতে দিল, তাহার পর অনেকখানি ইতস্ততঃ করিয়া নতদেহে বাহু ধরিয়া নিজের অশ্রু-ধৌত পদতল হইতে উহাকে উঠাইবার চেষ্টা করিয়া বলিল, "স্থির হও, নীলিমা! অত কাতর হ'লে ত চলবে না, আমাদের ধৈর্য্যের উপরই যে জ্যেঠাইমা'র জীবন নির্ভর করছে, তা কি তুমি বুঝতে পারছো না?"

নীলিমা সেই আকর্ষণে সর্ব্বশরীরে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিয়া বসিল এবং যথাসাধ্য ক্রন্দনবেগ সংবরণ করিতে করিতে অস্ফুট ও অস্থির কণ্ঠে কহিল, "মা গেলে আমি যে এখানে একটি দিনও আর থাকতে পারবো না! মা গেলে এক মুহূর্ত্তও আর আমি এখানে থাকতে পারবো না। আমার তখন কি হ'বে?"

সুশীলের বুকের মধ্যে এই হতাশাকাতর কণ্ঠের কাতর প্রশ্ন গভীর বলে আহত হইল, "তখন আমায় কি হ'বে?" বাস্তবিক এ সংসারের যে বিধিব্যবস্থা সে এই কয় দিনেই জানিতে পারিয়াছে, তাহাতে মাতৃহীনা বালিকার পক্ষে এখানে পড়িয়া থাকা একান্তই আত্মাহুতি দেওয়া ইহা সে ভালইরূপেই বুঝে। এই রাত্রিদিন অকাতরে রোগীর সেবার সহিত সমস্ত সংসারের সমুদায় কার্য্যসাধন করিয়াও তাহাকে পিতার মুখের কঠোর কুৎসিত ভৎর্সনা ব্যতীত আর কিছু শুনিতে সুশীল ত

একদিনও শুনে নাই। মমতামথিত স্নেহেভরে সে অকস্মাৎ নিজের কোঁচার কাপড়ে তাহার অশ্রুপ্লাবিত মুখ মুছাইয়া দিয়া উৎসাহদীপ্ত প্রফুল্ল মুখে কহিয়া উঠিল, "ভয় কি নীলু! আমরা দু'জনে মিলে জেঠাইমা'কে বাঁচিয়া তুলবো। না বাঁচার কথা মনে করবো কেন? চেষ্টা করিলে কি না হয়?"

নীলিমার মধ্যে ভয়ের তাড়না কোথায় সরিয়া গেল, আর তাহার স্থানে এ কি প্রবল হইয়া উঠিল বুকভরা লজ্জা! এই স্পর্শ, এই কণ্ঠ, এই আদরের "নীলু" ডাক, এ কি নীলিমা আজ সুশীলের কাছে লাভ করিয়া বসিল? এ যে তাহার গোপন বাসনারও অতীত! এ যে তাহার সমস্ত স্বপ্নেরও অগোচর। এই তরুণ হাতের কোমল স্পর্শের অনুভূতি তাহার অশ্রু-আর্দ্র কপোলে আবির গুলিয়া দিল, তাহার কান্না-ধোয়া চোখের পাতা ইহারই আবেশে বিহ্বল হইয়া সহসা নামিয়া পড়িল, তাহার সুখশিথিল থরকম্পিত দেহলতা। এই আভ্যন্তরিক সুখোচ্ছ্বাসে যেন এলাইয়া শিথিল হইয়া আসিল। কণ্ঠে তাহার ভাষা হারাইয়া গেল, বক্ষের মধ্যে প্রবল কম্পোচ্ছ্বাস রুদ্ধ হইয়া রহিল।

তাহাকে নিরুত্তর দেখিয়া সুশীল আরও কিছু বলিতে গিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া সহসা বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া গেল। সে মুখের উপর এমন একটি সুখের উচ্ছ্বাস ও আবেগের তরঙ্গ অতর্কিতেই ফুটিয়া উঠিয়াছিল, অজ্ঞাতেই ছিল্লোলিত হইতেছিল যে, যত বড় আনাড়ীই হৌক, উহার আবির্ভাব যে কাহারও চোখে না পড়িয়া যায় না। সুশীল সবিস্ময়ে নীলিমার মুখ নিরীক্ষণ করিয়া বুঝিল, তাহার মনে এই মুহূর্ত্তে মা হারাইবার ভয়ের ভাবনা একেবারেই জাগ্রত নাই। কিন্তু এমন অকস্মাৎ সেটা যে কেমন করিয়া সরিয়া গেল, সেইটুকুতেই তাহাকে যেন ফাঁপরে ফেলিল। সে আরও কতকগুলি ভাল ভাল সান্ত্বনার কথা

শুনাইতে চাহিতেছিল, কিন্তু ঐ হর্ষমধুর ঈষদ্ভিন্ন অধরোষ্ঠ, অর্দ্ধমুক্তস্মিতদৃষ্টি ও আরক্তোজ্জ্বল গণ্ড এই শোকসংবাদের মধ্যে কেমন যেন একটা ব্যবধানের সৃষ্টি করিয়া তুলিল। কিন্তু না বুঝিলেও সুশীলেরও তরুণ কণ্ঠদেশ ব্যাপিয়া ইহারই অনুকরণে লজ্জার রক্তিমা দ্রুত ফুটিয়া উঠিল। নীলিমা তার কি ব্যবহারে লজ্জা পাইল? বিনতার মত ব্যবহার কি ইহার সহিত করা সঙ্গত নহে? কেন নয়?' না, হয় ত তাহার ভুল, নীলিমা ইহাতে নিশ্চয়ই কিছু মনে করে নাই।

সুশীল স্বর্ণলতাকে ঔষধ খাওয়াইবার জন্য মুখ ফিরাইতেই তাহার ঠিক সাম্‌নাসাম্‌নি হইয়া গেল।

অনুকূলের সহিত। অনুকূলের কুঞ্চিত শীর্ণ মুখে একটা বিজয়দৃপ্ত হিংস্র হাসি।

শুভেন্দু দুই দিন মা'র রোগ আরোগ্যের জন্য অপেক্ষা করিয়া যখন দেখিল, মা'র আর ভাল হইবার মত গতিক নহে এবং ডাক্তারের মুখে শুনিল যে, এ রোগ আর আরোগ্য হইবে না, তখন সে ভোরের ট্রেণ ধরিয়া কলিকাতা যাত্রা করিল। পড়াশুনার এত ব্যাঘাত জন্মান তাহার সঙ্গত বোধ হইল না। সুশীলও অবশ্য যাইবার জন্য অনুরুদ্ধ হইয়াছিল, কিন্তু সে সেই নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিল এবং অনুকূলও সনির্ব্বন্ধে তাহাকে থাকিবার জন্যই বিশেষ অনুরোধ করিলেন। নীলিমা উৎকণ্ঠিত ও উৎকর্ণ হইয়া দ্বারের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ছিল, সুশীলের মুখে "না, আমি এখন যাব না" এই কথাটি শুনিতে পাইয়াই তাহার হৃৎপিণ্ডটা বুকের মধ্যে উল্লাসে লাফাইয়া দোল খাইল।

সুশীল যাইবে না। ধনীসন্তান চিরসুখে পালিত সুশীল দরিদ্রের দৈন্যের অংশ গ্রহণ পূর্ব্বক শুধু তাহাদের প্রতি অনুকম্পাপরবশ হইয়াই তাহাদের সাহার্য্যার্থ রহিল, আর শুভেন্দু তার মা'র শেষটুকুর জন্যও

অপেক্ষা করিতে পারিল না। অন্তরের দুই তারে এই হর্ষ-বিষাদের দুই বিভিন্ন সুর ধ্বনিয়া উঠিতে থাকিলেও নীলিমার বক্ষে যে আনন্দের সুরটাই প্রবল হইয়া উঠিতেছিল, তাহা তাহার কাছে অজ্ঞাত রহিল না। সে মনে মনে বলিল, "তোমার এত দয়া না হ'লে কি আমার এমন ক'রে তোমার পায়ে লুটিয়ে পড়তো! উঃ! কি ভাল তুমি! কত মহৎ!"

অপরাহ্ণে সুশীল ও নীলিমা রোগীর দুই পাশে দুই জন বসিয়া ছিল। রোগী যথাপূর্ব নিদ্রাচ্ছন্নবৎ পড়িয়া আছেন। অনুকূল ঘরে ঢুকিলেন। তাঁহার হাতে এক কৌটা চা এবং একটা বড় মোড়কে বাঁধা কয়েকটা জিনিষ পত্র। ছেঁড়া ছাতাটা এক স্থানে ঠেস দিয়া রাখিয়া তিনি নীলিমাকে বলিলেন, "এই চা নে, মা দেখ, খুব ভাল ক'রে এক কাপ চা তৈরী ক'রে সুশীলকে দে' দাও। আহা, দিন রাত খেটে বাছার মুখটি শুকিয়ে গেছে।"

নীলিমা কিছু বিস্মিত, কিছু প্রীতভাবে পিতার হাত হইতে মোড়কগুলি গ্রহণ করিয়া নিঃশব্দে আজ্ঞা পালন করিতে গেল। তাহার মূল্যে সংগৃহীত চা-চিনি সবই আজ শেষ হইয়া গিয়াছিল, তাই ভাবিয়া তাহার মনে সুশীল থাকার আনন্দটাও যেন অঙ্গহীন হইয়া পড়িতেছিল। এ কয় দিন কত দুঃখেই না সে এ দুই জনের চা, জলখাবার ও লুচির ময়দা ঘি যোগাইয়াছে, তাহা সেই জানে। তাহার আর ত কোনই সম্বল নাই!

কাঠ-কুটায় উনান ধরাইয়া সেই আগুনে একটা ঘটিতে জল চড়াইয়া নীলিমা পাতর বাটিতে চা ভিজাইবার ব্যবস্থা করিতেছে, চটিজুতার শব্দে বুকের সঙ্গে হাত কাঁপিয়া পাতরবাটিটা পড়িয়া ভাঙ্গিয়া গেল; ঘরে ঢুকিয়া এই কাণ্ডটা চোখে পড়িতেই সুশীল হাসিয়া ফেলিয়া বলিল,—"বাঃ, বাঃ, বাঃ,—খুব কাযের লোক ত দেখছি! এ দিকে

জেঠামহাশই আমায় তাড়া দিয়ে দিয়ে তুলে দিলেন যে, চা নাকি প'ড়ে পড়ে ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। এখন দেখছি, চা জুড়িয়ে পাথরবাটি হয়ে গেছে উঃ, কি আশ্চর্য্য! তুমি ম্যাজিক করতে জান, নীল?"

নীলিমা তাড়াতাড়ি ভাঙ্গা বাটি লুকাইয়া ফেলিয়া পাত্রান্তরে চা ভিজাইতে দিল ও কোন মতে বক্ষের দ্রুত তাল সংহত রাখিয়া মৃদুস্বরে কহিল, "বসুন, এখনই আমি চা তৈরী ক'রে দিচ্ছি।"

সুশীল হাসিয়া উঠিয়া কহিল "বাঃ, 'বসুন বল্লে যে বড়? তা হলে ত বসাই হবে না দেখছি। ভদ্রলোকেরা কি আর রান্নাঘরে বসতে পারে? আমি তো বাইরের লোক, বৈঠকখানায় বসিগে' যাই।"

নীলিমার মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল, সে নত চোখে চা ঢালিতে ঢালিতে ক্ষীণভাবে হাসিয়া বলিল, "তা হলে কি বলবো?"

সুশীল পুনশ্চ হাসিয়া উঠিয়া উত্তর দিল, "বাঃ, আর যেন কোন কথাই বলবার মত নেই? কেন, 'বস বলতে পারো না কি? চিরদিনই আমি বুঝি তোমার কাছে বাইরের লোক হয়েই থাকবো? আমায় অত পর পর মনে কর কেন বল তো? কৈ, আমি তো করি না? করি কি? হাঁ, নীল! সত্যি ক'রে বলো? আমি কি কিছু'তেই তোমাদের পরের মতন করেছি? ও কি করছো? বাটিতে আর ধরেছে না, তবু ঢালতে হবে? কেন, ওটা আর একটা বাটিতে ঢেলে নেওয়া কি যায় না?

নীলিমা এ কথার অর্থ না বুঝিয়া সরলভাবে কহিল, "আচ্ছা, তাই দিচ্ছি, না হয় আপনি ওটা আগে খান, তা'র পর ঐতেই বাকিটা আবার ঢেলে দেবো।"

সুশীল গরম চায়ে ফুঁ দেওয়া বন্ধ করিয়া ত্বরিতস্বরে বলিয়া উঠিল, "বাঃ, আবার সেই 'খান' 'খান' বল্লে কিন্তু আর একটুও খাবো না, তা'

এই ব'লে দিচ্ছি দেখে নিও। বল 'খাও,' না হ'লে এই রইলো তোমার চা, আমি জ্যেঠাইমার কাছে চল্লুম ফিরে।"

নীলিমা লজ্জায় ও আনন্দে বিবশিত হইয়া উঠিয়া স্মিতমুখে মৃদু মৃদু কহিল, "আচ্ছা, আর বলবো না। খাও, - হয়েছে ত? যান, আপনি ভারী দুষ্টু।"

সুশীল কৌতুকে করতালি দিয়া উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল, "যান্ যান্— আপনিও বড় কম দুষ্টু নন। এবার থেকে এই শাস্তি! ও কি! আমায় আবার দিচ্ছেন যে, ওটা ত আমি চাই নি, ওটা তুমি খাবে, না আপনি খাবেন, - তোমার অভ্যাস নাই? না-ই থাকলো? বাঃ জাগা ত আর এর আগে কখন অভ্যাস ছিল না? লক্ষ্মীটি! সত্যি তুমি খেয়ে ফেল। তোমার খাওয়া বড্ড কম হয়। আমি দেখেছি, কাল রাত্তিরে তুমি কিছু খাওনি অথচ আজ সেই দুপুরবেলা ৪ বাসে খেলে। রাত্তিরে আবার কি করবে, সে তুমিই জানো।"

নীলিমার চোখে জল আর চাপা থাকে না, এমনই হইয়া উঠিল। এত করিয়া তাহার মত তুচ্ছকে যত্ন করা! তাহার ক্রিয়াকলাপ এমন করিয়া উল্টাইয়া দেওয়া, এও কি কখন সম্ভব? এই সুদর্শন, তরুণ, শিক্ষিত ধনী সন্তানের পক্ষেও সম্ভব? সহসা নীলিমার মনে হইল, এও ত হিন্দুর ঘরেই জন্মিয়াছে। মা-বাপ ত এদেরও হিন্দু! তবে এর মধ্যে বা এমন উদারতা কোথা হইতে আসিল?

নীলিমাকে নিরুত্তর ও চিন্তিত দেখিয়া সুশীল তড়াক করিয়া উঠিয়া পড়িল এবং চা-পাত্রের বাকি চা-টা একটা মাজ্জিত পাত্রে ঢালিয়া লইয়া মুহূর্তমধ্যে তাহার মুখের সামনে তুলিয়া ধরিল, "লক্ষ্মীটি! খেয়ে ফেল, না খেয়ে খেয়ে এত খাটলে তুমি মারা পড়বে যে! না, নীল! তা করলে হ'বে না, সে আমি শুনবো না। আমার কথা শোনো, খেয়ে ফেল।"

নীলিমার বক্ষ-শোণিত যেন কল-কল্লোলে সমুদ্রের তরঙ্গের মতই উত্তাল হইয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল। তাহার সর্ব্বশরীরে যেন সহস্র তড়িৎ-শিখা ছুটাছুটি করিয়া ফিরিতে লাগিল, হাত বাড়াইয়া সে চায়ের বাটিটা তুলিয়া ধরিয়া এক নিশ্বাসে তাহা নিঃশেষ করিতেই, তাহার মনে হইল, ইন্দ্রদেবতার হস্ত-পরিবেশিত স্বর্গীয় সুধাপাত্র সে যেন নিঃশেষ করিল। তাহার দেহ, প্রাণ, মন, আত্মা সবলই যেন সেই সুধাসারে প্লাবিত হইয়া সুধাস্রোতে ভলাইয়া সুধামাখা হইয়া গেল। তাহার চির-দিনের দুঃখ, দারিদ্র, অত্যাচার, অবিচার সমুদায় যেন আজ নিঃশেষ হইয়া গিয়া তাহাকে কোন অজ্ঞাত পুলকের আলোকের মহাসাম্রাজ্যে সম্রাজ্ঞীর আসনে অধিষ্ঠিতা করিয়া দিয়া গেল। তাহার পৃথিবী আর ধুলার ধরণী রহিল না, তাহার জীবনকে আর জীবন-সংগ্রাম মনে হইল না, তাহার অপরিতৃপ্ত বাসনারুদ্ধ কুনারী জীবনকে সুপরিতৃপ্ত কল্যাণপূর্ণ মহীয়সী মহিলার বরেণ্য জীবন বলিয়া সে আনন্দাপ্লুত গাদানুভব করিল।

সুশীল কিন্তু অত কথার কোন ধারই ধারিল না, সে নিজের ভাবে ভোর রহিয়াই হাস্যদীপ্ত উৎফুল্ল মুখে বলিতে লাগিল, "দেখ দেখি কেমন হলো! যাই বল বাপু, চা-টি শুধু নিজে খেয়ে কিন্তু সুখ হয় না, বেশ দুই তিন জনে বসে বসে গল্পে সল্পে 'সিপ' ক'রে ক'রে খাওয়া যা'বে তবে না! হাঁা, একটা কথা, জ্যেঠাইমা আজ বেশ ভাল আছেন। কেমন ক'রে জানলুম? বাঃ, আমি ডাক্তারী পড়ছি না? তা ছাড়া আরও শোনো, তুমি চ'লে এলে একটু পরেই জ্যাঠামশাই যখন আমায় চা খেতে আস্তে বল্লেন, জ্যেঠাইমা তখন যে কি ভয়ানক চম্‌কে উঠেছিলেন! একেবারে দু' চোখ ঠিক্‌রে চেয়ে আমায় যেন মিনতি করে কি বল্লেন! অবশ্য কি বল্‌তে চান, সেটা ঠিক বোঝা গেল না আমার ত মনে হলো, যেন, না যাই বল্‌ছেন,—কিন্তু জ্যেঠামশাই ঠিক তার উল্টোই

বল্লেন। যা হোক্, এই বুঝতে পারাগুলোও ত ভালবই লক্ষণ বল্‌তে হ'বে ?"

নীলিমা এই বর্ণনা শুনিয়া কিন্তু মনে মনে বিশেষভাবেই উৎকণ্ঠা চঞ্চল হইয়া উঠিল। তাহার বাপের এই আকস্মিক মুক্তহস্ততা সুশীলকে ঠেলিয়া চা পান করিতে পাঠান এবং সেই সঙ্গে সেই সংবাদে তাহার মায়ের অর্দ্ধ-মূর্চ্ছিত চিত্তে আকস্মিক উদ্বেগের সঞ্চার! এ সকলই কি কোন অর্থ-সঙ্গতিপূর্ণ ষড়যন্ত্র ? অথবা—আর কিছু না ভাবিয়াই সে ত্বরিতপদে উঠিয়া বলিল, "মার কাছে যাই। এতক্ষণ—"

বলিতে বলিতেই তাহার নজর পড়িয়া গেল উঠানের প্রান্তে প্রস্থা-নোদ্যত পিতৃ মূর্ত্তির উপরে। লজ্জায় ও অপমানে তাহার মুখ কালো হইয়া গেল। তাহার অন্তরে তখনই একটা রুক্ষ সন্দেহ জাগিয়া উঠিল। কিন্তু বাপের উপর বিদিষ্ট বিরাগে ইন্ধন চড়াইতে গিয়া সে অকস্মাৎ সবিস্ময়ে দেখিল যে, কোথা দিয়া সেই পর্ব্বতপ্রমাণ বিরক্তি ও অভিমানের বোঝা গলিয়া পড়িয়া সেখানে একটা কৃতজ্ঞতার স্ফটিকনির্ঝর প্রবাহিত হইতেছে। সুখাপ্লুত ও বেপমানা হইয়া সে মনে মনে পিতৃচরণোদ্দেশে সেই বোধ হয় এই প্রথমই আন্তরিক প্রণিপাত জানাইয়া অন্তর্য্যামীর কাছে আকুল অন্তরে প্রার্থনা করিল, "আমার কি এত বড় কপালজোর আছে, ঠাকুর ? যদি স্বর্গে মর্ত্ত্যে কোথাও কোন জাগ্রত দেবতা থাক, তবে আমি যেন ওঁকে পাই। আমার বাবার ইচ্ছাই যেন পূর্ণ হয়। আমি বুঝেছি, আমি বুঝেছি, তিনি যা চাইছেন, তা আমি বুঝেছি! কিন্তু আমার কি সেই ভাগ্য!"

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

প্রখর সূর্য্যতাপতপ্ত ধরণীবক্ষে সে দিন প্রথম বারিপাত হইয়াছিল। তাহাতে ধরণীর ধূলি ধূসরিত মলিন অঙ্গ মার্জ্জিত ও পরিশুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। ধূলি-মলিন আকাশের ম্লানিমা অপসৃত হইয়া সুপ্রসন্ন ও সমুজ্জ্বল নীলিমায় দিগ্বলয়ের সমুদায়টুকুই নয়নরঞ্জন শোভা ধারণ করিয়াছিল। বসন্তের শ্যামলতা এত দিন পরে স্থূলতর ধূলিজাল ভেদ করিয়া আজই প্রথম লোক-লোচনে আত্মপ্রকাশ করিতে অবসর পাইয়াছে। মনে হইতেছিল, বরবর্ণিনী প্রকৃতি সতী এত দিন পরে তাঁহার ধূসর ওড়না-খানি অঙ্গ হইতে খুলিয়া ফেলিয়া যেন নীল আঙ্গিয়া ও হরিৎ বসনে বরবপু সুসজ্জিত করিয়াছেন।

অনভ্যস্ত পরিশ্রমে ও দারুণ গ্রীষ্মে সুশীলের একটু স্বাস্থ্যভঙ্গ ঘটিয়া-ছিল। দুই দিন জ্বর লুকাইবার পর আজ তিন দিনের দিন তাহার জ্বরটা একটু বেশীই হইয়াছিল। অনুকূল জানিতে পারিয়া তাড়াতাড়ি নীলিমাকে দিয়া বিছানা করাইলেন, মাথার দিব্য দিয়া সুশীলকে শয়ন করাইয়া নীলিমাকে আদেশ দিলেন, ওর মাথায় বসে বসে বাতাস দে।"—নিজেই তাড়াতাড়ি ডাক্তার ডাকিতে বাহির হইয়া গেলেন। সুশীলের কোন ওজরআপত্তিই সেখানে টিকিল না। ইহা দেখিয়া নীলিমার সন্ত্র-শঙ্কিত চিত্ত উৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

সুশীল বিমর্ষমুখে পাশ ফিরিয়া শুইয়া ছিল, বারকতক পাখার বাতাস কপালে ঠেকিতেই উদ্ধত স্বরে বলিয়া উঠিল "খবরদার! বলছি, তুমি জ্যেঠাইমার কাছে যাও,—কথা শুনছো না কেন?"

নীলীমা স্মিতমুখে উত্তর করিল, "কজনের কথা শুনবো বল?" বলিয়া সে নিঃশব্দে হাসিতে লাগিল, কিন্তু হাতের কাজ বন্ধ করিল না।

সুশীল দ্বিগুণ চটিয়া তাহার হাতের পাখাখানা ধরিয়া ফেলিয়া গম্ভীর মুখে বলিল, "ন্যায়ের পক্ষেই জয় থাকা সঙ্গত! আমার তো কিছুই হয়নি সত্যি সত্যি তুমি আসল ফেলে নকল নিয়ে বসলে চলবে কেন? না না; লক্ষ্মীটি যাও।"

নীলিমার আজকাল সাহস বাড়িয়াছিল। নিজের মনের দুরাকাঙ্ক্ষায় পিতৃদত্ত ইন্ধনের বলে সে এখন নিজেকে যথেষ্ট বলীয়ান্ বলিয়াই মনে করিতেছিল তাই সে জোর করিয়া পাখাখানা চাপিয়া ধরিয়া হাস্যোচ্ছাসিত মুখ সুশীলের সম্মুখে অসঙ্কোচে উন্নত করিয়া দীপ্তমুখে কহিল, "নাও দেখি কেড়ে কেমন পারো, কক্ষনো পারবে না।"

"পারবো না! দেখ তবে,"—সুশীল নিজের সমস্ত শক্তি দিয়া এমন টান মারিল যে, পাখাটা তো কত দূরে ছিটকাইয়া পড়িল, নীলিমাও সেই সঙ্গে সঙ্গে তাল সামলাইতে না পারিয়া সশব্দে ধরাশায়ী হইল।

"ছি ছি! কি করলুম!" বলিতে বলিতে সুশীল এক লম্ফে খাট হইতে নামিয়া নীলিমাকে টানিয়া তুলিল। নীলিমার একটা হাতে একটু বিশেষভাবেই চোট লাগিয়াছিল। সে তাহা স্বীকার না করিলেও সুশীল সেই আহত স্থানের সংবাদ জানিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার শুশ্রূষায় যত্নবান্ হইল। দুই একবার মৃদু আপত্তি করিয়া নীলিমা অগত্যাই থামিয়া গেল। ডাক্তার যখন আসিলেন, তখন রোগীর জ্বর বড় একটা ছিল না, কিন্তু তাঁহাকে নীলিমার বাহাতে "বাড়" বাঁধিতে হইল। সুশীল গভীর অপরাধিভাবে দুঃখে লজ্জায় ম্রিয়মাণ হইয়া রহিল। ঐ ভাঙ্গা হাতে কেমন করিয়াই বা নীলিমা রান্নাবান্না করিবে ভাবিয়া তাহার বুক ভাঙ্গিয়া পড়িবার মত হইল। অবশেষে সে থাকিতে না

পারিয়া অনুকূলকে গিয়া বলিল,—"নীলিমা তো রাঁধতে পারবে না, একটা বামুন খুঁজে আনলে হয় না ?"

অনুকূল তৎক্ষণাৎ কহিলেন, "বিলক্ষণ! তুমি আবার কোথায় খুঁজতে যাবে ? আমি এখনই আনছি।"

এই কথাটা স্বর্ণলতার ঘরের মধ্যেই হইল। স্বর্ণলতার ডাগর চোখের দৃষ্টি ইহাতে ভয়ার্ত্তের মত দেখাইলেও সে দিকে কিন্তু কেহই দৃষ্টিদানও করিল না। তাহার দরখাস্ত এত শীঘ্র মঞ্জুর হইল দেখিয়া সুশীলের আর খুসীর সীমা রহিল না। মনে মনে সে বলিল, "জ্যেঠা-মশাই মানুষ ত নেহাৎ মন্দ নন। সকলকার পরে'ই তো যথেষ্ট যত্ন আছে!"

নীলিমার হাত সারিতে দিন পাঁচেক লাগিল। ইতোমধ্যে স্বর্ণলতার অবস্থা অনেকখানি উন্নত হইলেও তাঁহার বাক্‌শক্তি যে আর কখন ফিরিয়া আসিবে না, তাহা জানিতে পারা গিয়াছে। সুশীলের এখানে আসার পর তিনি সপ্তাহ কাল অতিবাহিত হইয়া গিয়াছিল। আজ সকালে সুশীলের পিসীমা পত্র লিখিয়াছেন, তাহাতে তাহাকে বাড়ী ফিরিবার জন্য আদেশ ছিল। ভুবন বাবুর শরীর তেমন সুস্থ নহে, এ দিকে বিনতার বিবাহের কথাবার্ত্তাও চলিতেছে, তরু স্বামীর কর্ম্মস্থান হইতে ছেলেমেয়ে সঙ্গে বাপের বাড়ী আসিয়াছে। এই সব নানা কারণে সুশীলের শীঘ্র শীঘ্র বাড়ী ফিরা অনিবার্য্য হইয়াছে।

সে যেন আর অনর্থক বিলম্ব না করে। পত্র পাঠান্তে এক দিকে বাড়ীর জন্য, দিদির জন্য, পিতার জন্য উদ্বেগ এবং অপর দিকে স্বর্ণলতার এবং নীলিমার জন্য উৎকণ্ঠা, দুই দিক্ হইতে দুইটা তরঙ্গ আসিয়া যেন সুশীলের মনকে তরঙ্গিত করিতে লাগিল। তাহার মনের উপর যেন একটা অশান্তির মেঘ আচ্ছন্ন করিয়া ধরিল।

অনুকূলের কাছে পত্রের উল্লেখ করিবামাত্র তিনি যেন একেবারেই আকাশ হইতে পড়িলেন, বলিলেন, "সে কি কখন হয়? গিন্নীর এ রকম অবস্থা, মেয়েটা কোন্ দিকে কি করবে? আরও কিছুদিন থেকে যাও।"

থাকিবার উপায় নাই শুনিয়া তিনি তখন যেন একটু বিশেষ চিন্তিত ভাবেই কহিলেন, "তা হ'লে আগামী কালকেই একটু হলুদ দিয়ে আগামী পরশু দিনেই,—কি কালই না হয় শুভকার্য্যটা সম্পন্ন ক'রেই দিই?"

সুশীল বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া বক্তার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, তার বাক্যের অর্থ বোধ করিতে পারিল না। তাহা দেখিয়া অনুকূল পুনশ্চ সুস্পষ্ট স্বরেই কহিলেন, "নীলিকে তোমার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে একসঙ্গেই আমায় ত তোমার বাপের কাছে পাঠাতে হ'বে! তা'র পর এই আধমরা স্ত্রী নিয়ে আমার যা দশা হয় তা' নাহয় হোক, সে আমি বুঝবো—কিন্তু বিয়ের দেরি ত তাবলে আর কোনমতেই করা চলে না।"

সুশীল তখন কোনমতে ভাষা খুঁজিয়া লইয়া সাশ্চর্য্যে কহিয়া উঠিল, "বিয়ের কথা আপনি কি বলছেন? কাল পরশু বিয়ে আপনি দেবেন বলছেন, এর মানে কি? আমি কিছুই বুঝতে পারছি নে' যে!"

অনুকূল শান্ত ও সংযত স্বরে উত্তর দিলেন, "নীলিকে তুমি যে পছন্দ করেছ, তা আমি জানি; সেও তোমার জন্যে যে ছটফটিয়ে মরছে, তাও আমার সব জানা আছে। বিয়ে তোমাদের তো দিতেই ত হবে।—তা' ছাড়া আর এর উপায় কি?"

এই অদ্ভুত প্রস্তাব শুনিয়া সুশীল যেন কেমন বিমূঢ় হইয়া গেল। ক্ষণকাল সে নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে বাক্যহারা হইয়া থাকিবার পর সেই অশেষ বিস্ময়ের তরঙ্গ তাহার বক্ষে ঈষৎ সংহত হইয়া আসিয়া কণ্ঠমধ্য হইতে একটা শিথিল স্খলিত ধ্বনি উত্থিত হইয়া আসিল—"তা হ'লে আমার বাবার মত আপনি জিজ্ঞাসা করে তাঁরই সঙ্গে এ বিষয়ে কথা কো'ন।"

অনুকূল একটি ডাবা হুকায় তামাকু টানিতেছিলেন; একরাশি ধোঁয়া মুখে জমিয়াছিল, সেগুলাকে বাহির হইতে দিয়া তাহার পর কহিলেন, "ওহে! তা' কি আর আমি না করেছি? তিনি কোন্ জমীদারের মেয়েকে নাকি কবে বাগ্‌দত্ত হয়েছেন, তাই আর গরীবের মেয়েকে বউ করতে রাজী ন'ন।"

সুশীলের সহসা যেন একটা ঘুমের ঘোরের স্বপ্ন টুটিয়া গেল, চটকা-ভাঙ্গা হইয়া উঠিয়া সে এক মুহূর্ত্তের মধ্যেই যেন বর্ত্তমানের বাহিরে দূর অতীত দিনের মধ্যে ফিরিয়া চলিয়া গেল। সেখানে তাহার মনের সিংহাসনে অতি উজ্জ্বল ভাস্বর মূর্ত্তিতে আলোকময়ী বালিকা-প্রতিমার সমুজ্জ্বল মূর্ত্তিখানি তেমনই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে,—সে দেখিতে পাইল। সেই চাবুক খাওয়ার দিনের কথা মনে পড়িল,—তাহার পর আরও কত দিন দুই জনের চাক্ষুষ হইয়াছে। দেশের বাড়ীর নিমন্ত্রণে, কলিকাতার চিড়িয়াখানায়, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে, একজিবিসনে, বায়স্কোপে, তাহাদের কলিকাতার বাসায় নিমন্ত্রিতা সুলেখা তাহার মা-বাপের সঙ্গে কতবারই যে আনাগোনা করিয়াছে। সে সব কি ভুলিবার? ভুবন বাবুর সেই প্রাণভরা 'মা। মা!' ডাক। সে যে তিনি কতই প্রাণের মধ্য দিয়া ডাকেন, সুশীল অপ্রবীণ হইলেও তাহা বুঝিতে পারে। সুলেখার মুখের সেই সুলোহিত রক্তোচ্ছ্বাস, সেই সলজ্জ মন্দ হাস্য, সে'ও যে চির-অবিস্মৃত স্মৃতির মতই বুকের মধ্যে আলো হইয়া আছে। নীলিমার সঙ্গে থাকিয়া কয় দিন সে তাহার কথা ভাবিবার অবসর না পাইলেও তাহার সে ভাস্বর ছবি এতটুকুও ত ম্লান হয় নাই! বিশেষ তাহার পিতার মনোনীতা বাগ্‌দত্তা সে। মনে মনে নীলিমার জন্য সুশীলের একটা ব্যথা বোধ হইল, এত দিন এ ভাবে সে একটি মুহূর্ত্তের জন্যও তাহার কথা ভাবিয়া দেখে নাই, কিন্তু কথাটা যখন উঠিয়াই

পড়িয়াছে, তখন তাহার বারেকের জন্য মনে হইয়া গেল, তা হইলে কিন্তু মন্দ হইত না! চিরদুঃখিনী নীলিমা হয় ত ইহাতে সুখী হইত। প্রকাশ্যে কুণ্ঠিত মৃদুবাক্যে সে কহিল, "বাবা যখন অমত করেছেন, তখন আর আমার ত কোনই হাত নেই জ্যেঠামশাই!"

অনুকূলের তাম্রকূবর্ণে অনুরঞ্জিত ওষ্ঠাধরে একটা তীক্ষ্ণ হিংস্রহাসি ফুটিয়া উঠিল। তিনি পূর্ব্বের সেই শান্তসংযত ভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক কঠিন কণ্ঠে কহিলেন, "তোমার বাবা না হয় অমত করতে পারেন, কিন্তু তুমি কেমন ক'রে পারবে? ভদ্রসন্তান হয়ে একটা ভাল লোকের মেয়ের মাথা খেয়ে তাকে পরিত্যাগ ক'রে যাবে, এ কি কখন ধর্ম্মে সইবে? না এ ন্যায়ের রাজ্যে আমরাই তা সহ্য ক'রে নিতে পারবো?"

সুশীলের সর্ব্বশরীরের মধ্যে অকস্মাৎ যেন জ্বলন্ত তরল ধাতুর প্রবাহ বহিয়া গেল, কর্ণে তাহার যেন কোথা হইতে কে একসঙ্গে সহস্র কামান দাগিয়া দিল। সে ভয়ার্ত্ত ব্যাকুল কণ্ঠে আর্ত্তনাদের মত অস্ফুট চীৎকার করিয়া উঠিল—"এ কি বলছেন! আমায়? আমি?—আমি আমাকে, এ সব কথা আপনি কি আমায় বলছেন?"

এই বারংবার "আমি" ও "আমায়" শব্দ দিয়া কি ঘোর বিস্ময়, কি নিরতিশয় অভিমান, কি তীব্র উগ্র ব্যথিত ভর্ৎসনা ও অকথ্য ভীতি সে প্রকাশ করিতে গেল, তাহা বুঝাইবার নহে। সমস্ত প্রকৃতি যেন সেই অকথ্য অভিযোগের অপরিসীম লজ্জায় মুহ্যমান ও বিস্ময়াতঙ্কে সুশীলেরই সহিত সমানভাবে বজ্রস্তম্ভিত হইয়া রহিল। সুশীলের বক্ষের মধ্যে রুদ্ধ শ্বাস যেন জগতের সমুদয় বায়ুস্তরকেই সেই মুহূর্ত্তে চিররুদ্ধ অনুভব করিয়া মহাভারে স্তব্ধ হইয়া পড়িল। তাহার অন্তরের রাশি রাশি লজ্জায় তাহার সম্মুখের সমুজ্জ্বল ও খর সূর্য্যকিরণ যেন একেবারে আচ্ছাদিত ও মসীবর্ণ ধারণ করিল। কিন্তু প্রকৃতি যে লজ্জায় মুখ ঢাকা দিলেন,

মানুষ যে তাহা নিজের হাতেই দান করিয়াছে। তাহার পাষাণ চিত্ত ইহাতে বিন্দুমাত্রও বিচলিত হইল না। এবার উগ্র ও রুদ্র মূর্ত্তি ধারণ করিয়া শ্লেষের স্বরে অনুকূল উত্তর করিলেন—

"হ্যাঁ তুমি! তুমি! তুমিই! তুমি আমার সতের বছরের আইবুড় মেয়েকে কোলে জড়িয়ে নিজের কোঁচার কাপড়ে তার গাল মুছাওনি? তুমি আমার সতের বছরের আইবুড় মেয়ের সঙ্গে এক বাটির চায়ে দু'জনে মিলে একসঙ্গে বসে চুমুক দাও নি? তোমায় সে তা'র মা-বাপকে লুকিয়ে বাপের টাকা চুরি ক'রে মাঝরাত্রে গরম লুচি ভেজে চপ্চুপ্ রেঁধে বেড়ে খাওয়ায় না? তোমার শোবার ঘরের খাট থেকে প'ড়ে গিয়ে তার হাত ভেঙ্গে যায়নি কি? আমি ও সবের "আই-উইট-নেস," আদালতে হলপ ক'রে সাক্ষী দেবো, আমার মেয়ে নিজের মুখে এ সব - আরও অনেক কথাই স্বীকার করবে। তখন তুমি করবে কি? আর তোমার বাপের মুখখানিই বা তখন কতটুকু হয়ে যাবে? সে কথাটা ভেবে দেখ, আমি অমনি ছাড়বো, তা মনেও ভেবো না।"

যদি সুশীলের ভাল করিয়া কিছু মনে করিবার অবস্থা থাকিত, তবে সে হয় ত ধরণীকেই শুধু দ্বিধা হইবার জন্য সকাতরে অনুরোধ করিত; কিন্তু তা'ও তাহার নাকি ছিল না. তাই সে শুধু অতলজলে অদ্ধমগ্ন অভাগা ব্যক্তির মতই উদ্ধ স্বরে উচ্চারণ করিল—"ভগবান্!"

অনুকূল শ্লেষপূর্ণ কঠোর কণ্ঠে সঙ্গে সঙ্গেই কহিয়া উঠিলেন, "কি করবে তোমার ভগবান্? তোমার হয়ে হাকিমের কাছে সাক্ষী দেবে কি? কিন্তু আমি তা নিজে দেবো,—কেননা, এই চোখেই সব দেখেছি যে! আর আমার মেয়েও দেবে। মনে করো না সে তোমার দিক নেবে। সে তোমায় পাবার জন্যে যে মরছে, সে কি আর আমি বুঝিনি মনে কর? তুমি চলে গেলে সে বুকে ব্যথা পায়, বুকপেতে দিতে চায়

তা ও বুঝি।—তার চেয়ে বিয়েটা ভালয় ভালয় ক'রে না ও। বাপ দু'দিন না হয় একটুখানি বিরক্তই হ'বে, তার পর একমাত্র ছেলে তুমি, বউও তার খুব কুৎসিত হ'বে না, সব ভুলে যাবেখন।"

সুশীলের চক্ষুর অন্ধকাররাশি ও বক্ষের অনিশ্বসিত রুদ্ধ বায়ুপ্রবাহ জমাট বাঁধিয়া তাহার ভিতরে বাহিরে যেন একটা প্রলয়ঝটিকার সৃষ্টি করিতেছিল। তাহার বক্ষের শোণিততরঙ্গ তুফানের বেগে গভীর কলকল নাদ করিয়া উঠিতে লাগিল। অশ্রুর নির্ঝর ঠেলিয়া কোনমতে বাষ্পরুদ্ধ স্বরে সে উত্তর করিল—"আমি নীলিমার সঙ্গে বোনের চেয়ে ভিন্ন ভাবে কোন ব্যবহারই করিনি—" তাহার পর আর কোন কিছুই সে বলিতে পারিল না, ইহার চেয়ে বেশী কথা বলিতে তাহার আত্ম-মর্য্যাদা, অভিমান এবং মনের অবস্থা কেহই তাহাকে সাহায্য করিল না। আর বলিবার মত তাহার ছিলই বা কি?

অনুকূলের চোখ দুইটা অস্বাভাবিক উল্লাসে বাঘের চোখের মতই উজ্জ্বল দেখাইল। তিনি আবার বেশ সহজ স্থির কণ্ঠেই কথা কহিলেন; বলিলেন, "কোলে ক'রে চুমু খাওয়া অত বড় পরের মেয়েকে—তা'র পর ডাক্তার যে নীলির হাতে 'বাড়' বেঁধেছিল, সে নীলিকে কোথায় দেখতে পেয়েছিল, সে কথাও তো বলতে বাধা? তা' এ সবগুলোকে আদালতে দাঁড়িয়ে কি বোনের সঙ্গে সমান ব্যবহার প্রমাণ করতে পারবে, সুশীল?".

সুশীল আতঙ্কে ভরা স্তব্ধ মুখে নিঃশব্দে বারেক তাহার আততায়ীর প্রশান্ত মুখের দিকে চাহিয়া দেখিয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিল এবং দুই জানুর মধ্যে সেই ঢাকা মুখ সে লুকাইল। অসংবরণীয় বিপুল ক্রন্দনের বেগকে সে আর কোনমতেই যেন ঠেলিয়া রাখিতে পারিতেছিল না। এ কি অকথ্য কলঙ্কের ডালি নিরপরাধে তাহার মাথায় চাপিয়া বসিল? ইহার

বিপুল লজ্জা, নিদারুণ ভয় ও অপমান তাহার তরুণ কিশোর প্রাণে আর যেন সে সহিতে পারিতেছিল না।

সুশীলের কান্না আসিল। কিন্তু না, না, না। কাঁদিবে সে কাহার কাছে? পাষাণ পাষাণ পাষাণ! একটা নির্ম্মম রক্তলোলুপ রাক্ষসের মত, অথবা মনুষ্যচর্ম্মাবৃত প্রস্তরস্তূপের মত এই অমানুষের কৃপা ভিক্ষা করিয়া সে ইহার পায়ে ধরিয়া কাঁদিবে? কখন না—কখন না; তাহার অপেক্ষা নীলিমাকে বিবাহ—সেও বরং সহস্রবার শ্রেয়।

ইহা ভাবিতে গিয়াও ঘৃণায় সুশীলের সর্ব্বশরীর মন যেন গুটাইয়া এতটুকু ছোট্ট হইয়া গেল। নীলিমার উপরও মনটা তাহার একেবারেই বিতৃষ্ণ হইয়া উঠিল। এই পিশাচের মেয়ে, সেও কিছু কম পিশাচিনী নয়! তবে আগাগোড়াই হয়ত তাহা'ক লইয়া ইহারা একটা মস্ত বড় ঘৃণিত চক্রান্ত গড়িয়া তুলিয়াছে। নীলিমা নিশ্চয়ই ইহার মধ্যবর্ত্তিনী। সে নিশ্চয়ই সমস্ত জানে এবং স্বেচ্ছায় ইহার প্রধান ভূমিকা লইয়াছে। তাহার অহেতুক জড়িমা, অকস্মাৎ লালিমা, অনাবশ্যক লজ্জাভিনয় এ সকলেরই আজ এই মুহূর্ত্তে সুশীল যেন একটা মূল দেখিতে পাইল। এ সকলই অভিনযোৎকর্ষ। তাহাকে ফাঁদে ফেলিবার প্রচেষ্টা! সে যখন ভগিনীর মত স্নেহভরে তাহার সহিত অসঙ্কোচে মেলামেশা করিয়াছে, এই পিশাচের দল তখন তাহার সেই সরল বিশ্বস্ততার এই এত বড় একটা নির্ম্মম প্রতিদানকল্পনায় নিষ্ঠুর চক্র গঠন করিতেছিল। তবে কি স্বর্ণলতার ঐ রোগের মধ্যেও কোন হীন কৌশল, হেয় অভিনয়—

সুশীল নিজের চিন্তার আঘাতে নিজেই আহত হইয়া মাথা তুলিল। সে নিজের মনকে পীড়ন করিয়া বলিল, নানা তুমি "এত ছোট, এত নীচ হয়োনা! জ্যেঠাইমা বেচারী নিশ্চয়ই এর মধ্যে নাই"—তাহার সর্ব্ব-শরীর শিহরিয়া তুলিয়া সহসাই মনের মধ্যে সেই সে দিনের ব্যাকুল

দৃষ্টি জাগিয়া উঠিল। সেই যে দিন বড় আদরে গৃহস্বামী—এই জটিল ষড়যন্ত্রের সৃষ্টিকর্ত্তা নিজে যাচিয়া ঠেলিয়া মেয়ের কাছে তাহাকে চা খাইতে পাঠাইতেছিলেন! সে দৃষ্টি যে একান্ত মিনতিভরা নিষেধদৃষ্টি সে দিনও এ সংশয় তাহার মনে জাগিয়াছিল। আজ তাহা নিঃসন্দেহ হইয়া গেল। জ্যেঠাইমা'র স্বাভাবিক বুদ্ধি অথবা এ চক্রান্তের কোন আভাস তাঁহার অর্দ্ধচেতনার মধ্যে জাগ্রত হইয়াই যেন তাহাকে সে দিন সাবধান করিয়া দিতে চাহিতেছিল। মূঢ় সে, মূঢ় সে, তখনও কেন সে কথা সে বুঝিতে পারিল না?

শিকারী যেমন সানন্দ আগ্রহে শিকারকরা পাখীর মৃত্যুযন্ত্রণা নিরীক্ষণ করে, তেমনই করিয়াই প্রসন্ন মুখে অনুকূল আরক্তমুখ সুশীলের যন্ত্রণার্ত্ত মূর্ত্তির প্রতি স্থিরচোখে চাহিয়া চাহিয়া মনে মনে বলিলেন, "ওষুধ ঠিক ধ'রে গেছে!" প্রকাশ্যে মনের প্রফুল্লভাব দমনে রাখিয়া পরম গম্ভীর মুখে তিনি কহিয়া গেলেন,—"বেশ ক'রে ভেবে দেখ, সুশীল! হয় কালই তোমায় নীলিকে বিয়ে করতে হয়, না হয় কালই আমায় ফৌজ-দারীতে তোমার নামে নালিশ দায়ের ক'রে দিতে হয়। এর আর তৃতীয় পন্থা নেই। ও মেয়ে আর কেউ তো বিয়ে করবে না! আর না জেনে করলেও তাতে মেয়ের পক্ষে অন্যপূর্ব্বা দোষ হ'বে। বিয়ে কর; সব ঢাকা প'ড়ে যাবে। বিয়ে না কর, খবরের কাগজে শুদ্ধ এই কেলেঙ্কারী ব্যাপারে নামটা উঠে যা'বে। আমার তাতে কোনই লজ্জা নেই। আমরা গরীব মানুষ, বড় লোকের অত্যাচার আমাদের উপর কি রকম ভাবে পড়ে, সেটা দশেধর্ম্মে দেখতে পেলে তা'তে আমাদেরই সমূহ লাভ। ধরো, তোমাদের চেষ্টায় আদালত জোর ক'রে তোমার সঙ্গে ওর বিয়ে যদি নাও দেয়, অন্য কোন দেশভক্ত ছেলে ওকে "ম্যারাল ক্যারেজ' দেখাবার জন্যে সেইখানে দাঁড়িয়েই হয়ত তখন বিয়ে ক'রে

নেবে ; কিন্তু তোমার ত অন্ততঃ পাঁচটি বছর ঘানি টানাটি বন্ধ করাতে কারু বাপেরও সাধ্য হবে না। সেইটি ত তোমার বাকী থাকবেই !—আচ্ছা, তুমি এখন বেশ ক'রে চিন্তা কর, আমিও ততক্ষণ সবাইকে খবরটা জানিয়ে আর পুরুতের নাপিতের, টোপর মালা আর আভ্যুদিক জিনিষের ব্যবস্থা পত্র ক'রে আসি। পরশু দিন তখন তোমাদের ট্রেণে চাপিয়ে তোমার বাপকে 'তার' ক'রে দিলেই হবে।—আর না হয় তো একেবারে গিয়েই দাঁড়ান ভাল। ছেলে বউএর মুখ দেখলেই সব ভুলে যাবেন 'খন।'

এই বলিয়া বারেক সুশীলের যথাপূর্ব্ব করবৃত লুক্কায়িত মুখের উদ্দেশ্যে একটা ক্রুর কটাক্ষ নিক্ষেপণ করিয়া মুখ টিপিয়া হাসিতে হাসিতে অনুকূল প্রস্থান করিলেন। আর সুশীল তেমনই কর্ত্তব্যবিমূঢ় ব্যথাহত, আর্ত্ত—সেই স্থানে ঠিক সেই একই অবস্থায় বসিয়া রহিল।

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ।

শুষ্ক, জবা, পুষ্পঝরা, শীর্ণ শাখায় নব বসন্তের নবীনাগমে নবপত্র মুকুলে যে নূতনতর শোভাসম্পদের সমাবেশ করে, কোকিলের কুহুতে পাপিয়ার প্রিয়ানুসন্ধানে, শ্যামা-দোয়েল-বুলবুলের আনন্দগীতির মধ্য দিয়া যে উৎসব সমারোহ চলিতে থাকে, তরুণ জীবনে যখন নববসন্তের সমাগম হয়, তখন সেখানেও ঠিক তাহারই অনুবর্ত্তন চলে। নীলিমার শান্তশীর্ণ হৃদয়-কাননেও এই বসন্তাগম ঘটিয়াছিল। তাহার অনাদৃত জীবন যৌবন এত দিন পরে সহসা আত্মফাল্গুনসমাগম লাভ করিয়া সার্থক ও সত্য হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার অন্তরের সুপ্ত কামনারাশি জাগ্রত হইয়া উঠিয়া প্রেমের মুকুলকে মুঞ্জরিত করিয়া তুলিয়াছিল। তাহার সেই বসন্তপুষ্পাভরণা জীবনোদ্যান ভরিয়া আশারূপী কোকিলের পঞ্চম স্বর, কল্পনারূপিণী বাণীর বীণার ঝঙ্কার, নব নব বাসনার পুলক-সঙ্গীতে পাপিয়া-দোয়েলের মধুর কণ্ঠ ধ্বনিত হইতেছিল, আর শীতল স্নিগ্ধ নির্ঝর ধারার মত অপ্রতিহতগতিতে ছুটিয়া চলিয়াছিল প্রেম। ইহার মধ্যে নীলিমা কতখানিই না তাহার মনের মন্দির সাজাইয়া তুলিয়াছিল। পিতার ইচ্ছার পরিচয় পাইয়া, সুশীলের নিকট অপর্য্যাপ্ত আদর যত্ন লাভ করিয়া নিজেকে সে উচ্চাকাঙ্ক্ষার চরমে উন্নীত করিয়াছিল। তাই সকল কর্ম্মের মধ্যে আজকাল তাহার আগ্রহ, আনন্দ ও উন্মাদনার অন্ত ছিল না। প্রভাতোদয় হইতে দিবসান্তকালাবধি তাহার যেমন হস্তপদের বিশ্রাম ছিল না, মনের ভিতরেও তেমনই তরতর বেগে কল্পনা ও আনন্দের স্রোত সমান গতিতে বহিয়া চলিয়াছিল। এ বাড়ীর চির-

নিয়মিত কদন্ন সে কোন দিনই সুশীলের পাতে পরিবেশন করিতে পারে নাই, অনেক রাত্রিতে ইচ্ছাবিলম্বে পিতার শয়নের পর গরম লুচি, বিবিধ ব্যঞ্জন সযত্নে রন্ধন করিয়া সে কি পরিতৃপ্ত সুখেই যে তাহা সুশীলের সম্মুখে নিবেদন করিয়া দিত সে আনন্দ তাহার জানাইবার স্থান কোথায়? এই সকল সংগ্রহ কত দুঃখেই যে তাহাকে করিতে হয়, সুশীল যদি তাহার বিন্দুবিসর্গও জানিত ত কখনই সে ইহার কণিকামাত্র গ্রহণ করিত না। কিন্তু সে যে তাহার এই গোপন দুঃখ জানে না, তাহার জন্যই সে শুধু নিজেকে যে এত বড় দুঃসাহসের কার্য্যে ঠেলিয়া দিতে পারিয়াছে, এইটুকুই যে তাহার সকল কষ্টের একমাত্র সান্ত্বনা, পরম পুরস্কার! সুশীল চিরসুখাভ্যস্ত, এ সংসারের সকল নিয়মের সহিত তাহার কোন পরিচয়ই নাই, সে স্বপ্নেও জানে না, তাহাকে ঐটুকু স্বাচ্ছন্দ্য দান করিতে নীলিমা কত বড় ত্যাগ স্বীকার এই দিনের পর দিন ধরিয়া করিয়া চলিয়াছিল। তাই সে অবলীলাক্রমেই সেগুলি সহজভাবে গ্রহণ করিতেছিল, কিন্তু নীলিমার আত্মা পর্য্যন্ত যেন এই দানের মোহে ও ত্যাগের সুখে বিভোর হইয়া উঠিয়াছিল।

কখন কখন বড় সঙ্কটে পড়িয়াই এক একবার সে এমনও ভাবিয়াছে যে, ইহার চেয়ে স্পষ্ট করিয়াই উঁহাকে গিয়া বলি, আমায় কিছু টাকা দাও ত, খরচের জন্য কিছু হাতে নাই। আবার দারুণ লজ্জায় তাহার কৌমারচিত্ত সঙ্কুচিত হইয়া গিয়াছে। মনে মনে নিশ্বাস ফেলিয়া সে কল্পনা করিয়াছে, সেদিন তাহার কত দিন পরে আসিবে, সে দিন ঐ কথাগুলি নিঃসঙ্কোচ অধিকারে সে তাঁহাকে বলিতে পারিবে? এমন কি, সুশীলের খোলা সুট-কেশটা তাহার অসাক্ষাতে গুছাইয়া রাখিতে রাখিতে তাহার প্রত্যেক বস্তুটিকেই সে যেন নিতান্ত নিজস্ব বলিয়াই মনে করিয়া সযত্নে সন্নিবেশিত করিয়াছে।

তাহার জুতা ছু'পাটি ধূলা ঝাড়িয়া কতদিন সেই ধূলা সে মাথায় মাখিয়া পুলককণ্টকিতশরীরে মানসনেত্রে ধ্যান করিয়াছে—সুশীলের সেই গৌর সুন্দর সুগঠিত সুকোমল পা দুখানি। সে দিন কবে আসিবে, সে দিন সেই দুইটি পা'কে সে সযত্নে বুকে তুলিয়া লইয়া সেবা করিতে পারিবে !

সেদিন অনুকূল বাড়ী ফিরিলে যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছিল, নীলিমা তাহার কোন সংবাদই জানিত না। সে রান্নাঘরে তখন বাটা ছানার সন্দেশ ও নিমকি প্রস্তুত করিতে একান্তমনে নিযুক্ত ছিল। কখনও এ সকল কার্য্য স্বহস্তে না করিলেও প্রবল ইচ্ছা ও বুদ্ধির সহায়তায় সে আজকাল অনেক বস্তুরই প্রস্তুতপ্রণালী আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছিল। তৈয়ারি খাবার একখানি পরিমার্জ্জিত রেকাবে সাজাইয়া একবার তৃপ্তনেত্রে সেগুলি পর্য্যবেক্ষণ পূর্ব্বক একটা সুখের নিশ্বাস গ্রহণ করিয়া সে প্রফুল্ল স্মিত মুখে সুশীলের সন্ধানে চলিল।

বেলা তখন অবসানের পথে ঢলিয়া পড়িয়াছে। সুবর্ণোজ্জ্বল আলোকের বন্যায় ধরিত্রী স্নাত হইতেছিলেন, আকাশের অঙ্গেও সে আলোর লহরী ইন্দ্রভবন বা স্বপ্ন লোক রচনা করিয়া দিতেছিল। দিকে দিকে কোকিলের আনন্দকূজন শ্রুত হইতেছে। জনবিরল বাড়ীটার কোথাও কোন সাড়া নাই। নীলিমা নিজ অন্তরের পুলকোচ্ছ্বাসে পূর্ণ হইয়া মৃদুমৃদু গাহিয়া উঠিল—

"অন্তর মম বিকসিত কর, অন্তরতর হে !"

সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া সামনের দালানের একটুখানি মাত্র দূরে দেওয়ালের গায়ে পিঠ রাখিয়া কে একজন রহিয়াছে! কে একজন? না, কে এক জন হইবে কেন—সুশীলই ত দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া মুহ্যমান হইয়া পড়িয়া আছে।

এই ভাঙ্গা বাড়ীটার সমস্ত ছাত প্রাচীর একসঙ্গে ভাঙ্গিয়া পড়িতে দেখিলে সে যত না স্তম্ভিত হইত, এই অভূতপূর্ব্ব দৃশ্যের দ্রষ্টা হইয়া নীলিমার পুলকচঞ্চল চিত্ত তদপেক্ষাও বিস্ময়রসে ডুবিয়া গেল। তাহার হাস্যোদ্ভাসিত মুখ মুহূর্ত্তে কালিমাময় হইয়া উঠিল। ক্ষণকাল অবাক বদ্ধ দৃষ্টিতে দাঁড়াইয়া থাকিয়া তাহার পর সে সন্দেহ-শিথিল শ্লথ চরণে ধীরে ধীরে সুশীলের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। আর সেই সঙ্গেই তাহার বিকসিত হৃৎপদ্ম মুদিত হইয়া আসিয়া তাহার বোধ হইল, অকস্মাৎ যেন একটা প্রলয়ের অন্ধকার মাথা তুলিয়াছে।

অত্যন্ত নিকটবর্ত্তী হইয়াও যখন সে সুশীলের দিক হইতে কোনই সাড়াশব্দ পাইল না, তখন কি যেন একটা হইয়া গিয়াছে, সে বিষয়ে বিনা বিচারেই এবার তাহার মনের মধ্যে স্থিরসিদ্ধান্ত হইয়া গেল, কিন্তু সেটা যে কি কোথা হইতে ঘটিল, এরহস্য তাহার কাছে একান্ত জটিল ও অভেদ্য বোধ হইলেও সে বিক্ষুব্ধ চিত্তে ও শঙ্কিত মুখে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিল। এই ঘৃণাভরা ক্রুদ্ধ দৃষ্টি একটি ক্ষণের মধ্যেই যেন তাহাদের দু'জনকার এই মাসেক কালের সকল ঘনিষ্ঠতা, সকল পরিচয়কেই আড়াল করিয়া দিয়া পাষাণ প্রাচীরের মত উদ্যত হইয়া উঠিয়া তাহাদের মাঝখানে অর্দ্ধহস্তপরিমিত জমীটুকুকে চাপিয়া রহিল। তাহার অদৃশ্য অটল অভেদ্য দেহ নীলিমার গতি ও বাক্য একসঙ্গেই রোধ করিয়া দিল।

দুই জনের কেহই কোন কথা কহিল না। বহুক্ষণাবধি সুশীল তাহার আরক্ত ও কঠিন দৃষ্টি বাহিরের শূন্যপথে সংন্যস্ত রাখিয়া অবশেষে আর একবার অন্য তাহা অকারণ স্তব্ধ, অজানা ভয়ে আড়ষ্ট নীলিমার মৌন নত মুখে স্থির করিয়া ধরিল। সার্চ্চলাইট যেমন করিয়া নদীর তলদেশাবধি ভেদ করিতে চায়, তেমনি করিয়া সেই তীক্ষ্ণ রুক্ষ দৃষ্টি যেন এই পাষাণে পরিবর্ত্তিতা মূর্ত্তিরূপিনী নারী অন্তরদেশ পর্য্যন্ত উলটিয়া

দেখিতে চাহিল। তাহার পর কি ভাবিয়া অনুসন্ধানে বিরত হইয়া সে মুখ ফিরাইয়া ও তাহার পূর্ব সকল চিত্ত যেন নূতন করিয়া আর একবার ইহার উপর গভীরতর ঘৃণার তরঙ্গে প্লাবিত হইয়া গেল। তাহার বাপের উপরকার সকল বিদ্বেষ, সকল বিরক্তি, সমস্ত ক্রোধই যেন পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়া ইহারই উপরে নিপতিত হইল। সুশীলের জ্বালা-ভরা নিরতিশয় অপমান পীড়িত চিত্ত নীরব কোপে জ্বলিয়া জ্বলিয়া নিজের মধ্যে স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া লইল যে, এই ঘৃণিত ষড়যন্ত্রে নীলিমা নিঃসংশয়ই জড়িত আছে। উহার মুখে যে অপরাধের কালি মাখান। আর উহার ব্যবহার কি লজ্জাহীন ও কাপট্যপূর্ণ! এই অপরাধিনী বিশ্বাস-হন্ত্রীর অস্পষ্ট বাতাস, তাহার নিশ্বাসের মৃদু শব্দ, তাহার স্তব্ধ স্থির পাষাণমূর্ত্তি অসহনীয় বোধ করিয়া সুশীল তৎক্ষণাৎ নিঃশব্দে উঠিয়া নীরবে প্রস্থান করিল। আর সঙ্গে সঙ্গেই নীলিমার চোখের সাম্নে সারা বিশ্বটা ভূমিকম্পে দুলিয়া উঠিল, তাহার বোধ হইল, তাহার পদ-তলের অবলম্বন কোথায় সরিয়া টলিয়া পড়িয়া যাইতেছে।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

কি হইল? কেন হইল? কিসের জন্য হইল? ইহার কিছুই যদি খুঁজিয়া না পাইয়াও কাহাকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হয়, তবে কার্য্যের চাইতেও কারণটার জন্যই সে যেন সমধিক ব্যাকুলচিত্ত হইয়া পড়ে।—কি করিলাম যে আমায় তুমি অমন করিয়া গেলে? এই প্রশ্নটাই নীলিমার মনে সব চেয়ে প্রবল স্বরে বাজিয়া উঠিতেছিল বলিয়াই সেই প্রশ্নটাকে বাহিরে পাঠান আজ তাহার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন হইয়া দাঁড়াইল। কিছু যে একটা ঘটিয়াছে, সেটা যে সামান্য কিছুও নয়—বড় অসামান্য বড় অসাধারণ কোন কিছু এবং সেটা যে নীলিমারই সর্ব্বনাশের আয়োজন, সেই কথাটাই শুধু এই আকস্মিক ব্যাপারের, এই অনুদ্‌ঘাটিত গভীর রহস্যের তলদেশ হইতে সহজেই ভাসিয়া উঠিতেছিল। আর সবই ইহাই প্রচ্ছন্ন। সেই আসন্ন সন্ধ্যার আলোছায়াভরা সন্ধিক্ষণে নীলিমার শত উদ্দীপনাভরা, সহস্র কল্পনালোকে সমুজ্জ্বল, পরিপূর্ণ চিত্ত একেবারে অতলের অন্ধকারে আছাড় খাইয়া পড়িয়া আর্ত্ত উর্দ্ধস্বরে চীৎকার করিয়া বলিল, "আমার সব গেল! ওরে আমার সব গেল রে!"

যাহার থাকে, তাহারই যায়, যাহার কিছু ছিল না, তাহার কোথা হইতে কি যাইবে? এই যে সাধারণ একটা হিসাব পড়িয়া আছে, কি আশ্চর্য্য, নীলিমার মন একবারের জন্যও ত সে দিক ঘেঁসিয়া গেল না! তাহার ছিল কি, তাহার গেল কি? তাহার কোন হিসাবই সে করিল না, শুধু তাহার বেদনায় তীক্ষ্ণ শরে বিদ্ধ প্রাণ হু-হু করিয়া জ্বলিতে জ্বলিতে দারুণ জ্বালার সহিত অনুভব করিতে লাগিল যে, তাহার সব

গেল। সব গেল! সব গেল! সে যে কতখানি পাইয়া বলিয়াছিল এই হারানোর সমস্তই সেটুকু যেন ভাল করিয়াই অনুভব করিতে পারিল।

অপরাহ্ন সায়াহ্নে ও সন্ধ্যা রাত্রিতে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। জনবিরল পল্লী প্রায় নিঃসাড হইয়া আসিয়াছিল মধ্যে মধ্যে পাদচারী পথিকের গমনাগমন পথচারী কুকুরের সতর্ক চীৎকারে অনুসূচিত হইতেছিল মাত্র। অদূরে আম্রকাননে শৃগালের দল কোলাহল করিয়া উঠিতেই কুকুরগুলা তারস্বরে ডাকিয়া উঠিয়া উহাদিগকে নীরব করিয়া দিল। বাড়ী নিস্তব্ধ—ঘোর নিস্তব্ধ। ইহার কোথাও সাড়াশব্দ নাই, আলো নাই। ইহার মধ্যে জীবিত জীবের নিবাস কল্পনা করাই কঠিন, নিবিড় অন্ধকারে সাবধানন্যস্ত পদক্ষেপ সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিয়া আসিল। আর একটু হইলেই আগন্তুক সেই একই স্থানে একই ভাবে অবস্থিত অসাড় অস্পন্দ নীলিমার ঘাড়ের উপড়েই পড়িয়া যাইত; কিন্তু ক্ষীণ নক্ষত্রালোকে অস্পষ্টভাবে দেখিতে পাইয়া সে গতি রুদ্ধ করিয়া দিল এবং একটুখানি ঝুঁকিয়া পড়িয়া চিনিতে পারিয়া বলিয়া উঠিল, "জেগে "নীলি? জেগে আছিস? আচ্ছা, একটা আলো জেলে আন্ দেখি চট্ ক'রে।"

কোন্ অন্ধকারে গুহাগহ্বরাশ্রিত পলাতক মনটাকে টানিয়া আনিয়া নীলিমা যখন পিত্রাদেশ পালনার্থ উঠিয়া দাঁড়াইল, তাহার নিজের উপর দিয়া এই কয় ঘণ্টার মধ্যেই যে কত বড় একটা বিপ্লব ঘটিয়া গিয়াছে, তাহা সে তখনই যেন ভাল করিয়া অনুভব করিতে পারিল। কি দুর্ব্বল, কি অবসন্ন, কি অপরিসীম অবসাদগ্রস্তই তাহার সমস্ত শরীর-মন ইতোমধ্যে হইয়া পড়িয়াছে!

প্রদীপ হাতে ফিরিয়া আসিয়া সে যাহা দেখিল, তাহাতে হাঁতের

প্রদীপ ত তাহার পড়িয়া গেলই, নিজেও যেন সে সেই সঙ্গে সঙ্গে পতনোন্মুখী হইল। হয় ত মূর্চ্ছিতই সে হইত, যদি না সেই মুহূর্ত্তে বাপের কঠোর ভর্ৎসনার আঘাত তাহার অবসাদে অবসন্ন চিত্তকে ব্লিষ্টারপ্রয়োগের মতই চেতাইয়া তুলিত। অনুকূল মেয়ের কাণ্ডে একান্ত বিরক্ত ও অসহিষ্ণু হইয়া উঠিয়া চাপা তর্জ্জনে গালি দিয়া উঠিলেন —

"দিন দিন কচি খুকী হচ্ছিস্ নাকি? ভাঙ্গলি পিদীমটে? বড়-লোকের ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিচ্চি ব'লে সেই আহ্লাদে কি মাথারও ঠিক নেই না কি? যা শীগ্‌গির যা, একটা লণ্ঠন জ্বেলে নিয়ে এসে এই টোপর, চেলি, কলা, পান, হলুদ, বাতাসা সব ভাল ক'রে তুলে পেড়ে রেখে দে। আর খাবার দাবার যদি কিছু তোমার গুষ্ঠির পিণ্ডি থাকে তাই নিয়ে এস। কাল আবার উপোস করে মরতে হবে ত তোমার চোদ্দপুরুষের পিণ্ডি চট্‌কাতে! যাও না, উদাসিনী রাজকন্যের মতন অবাক্ হয়ে দেখছো কি আমার মুণ্ড? টোপর কখন চোখে দেখ নি, না আমাকেই কখন চেনো না?"

নীলিমা এ আদেশও পালন করিল। কেমন করিয়া যে করিল, সে কথা সে নিজেও বুঝিল না। কাপ্তেনের হুকুমে অকূল সমুদ্রের ভীষণ ঝটিকার সময়েও যে অভ্যাসে ভীত নাবিকরা হাল ছাড়ে না সেনাপতির আদেশে গোলাবৃষ্টির মধ্য দিয়াও সৈন্যদল য অভ্যাসে অগ্রসর হয়, শুধু সেই চিরাভ্যস্ত বাধ্যতার ফলেই নীলিমাও নিজের শরীর-মনের সেই প্রবল কম্পন ও অচলতার মধ্য দিয়া এই সকল কার্য্য সমাধা করিয়া রান্নাঘরে গেল। রান্না আজ কিছুই হয় নাই। সেই সুশীলের জন্য সযত্নে প্রস্তুত রেকাবে ভরা খাবারগুলি মাত্র অযত্নে পড়িয়া আছে। নির্ব্বিচারে তাহাই আনিয়া সে বাপের সামনে ধরিয়া দিল। তাহার মায়ের ঘরে দাঁড়াইয়া তখন তাহার বাপ হাত-মুখ নাড়িয়া তাঁহাকে

কোন কথা বুঝাইতেছিলেন। লণ্ঠনের আলোতে নীলিমা দেখিল, স্বর্ণলতার মুখের চেহারায় অকথ্য ভয়ের ও অস্বাভাবিক লজ্জার ছায়া দেদীপ্যমান। তিনি প্রহারভীত বালকের মতই ভয়ার্ত্ত চক্ষুতে স্বামীর দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া আছেন। তখন নীলিমার মনে পড়িল, আজ মধ্যাহ্নের পর হইতে এই মা যে তাহার বাঁচিয়া আছেন, সে কথাও তাহার মনে ছিল না।

অনুকূল মেয়ের দিকে লক্ষ্য মাত্র না করিয়া আপন মনের উৎসাহেই বলিয়া যাইতে লাগিলেন—"ছোঁড়াটা কি কম বজ্জাত! কিছুতেই রাজী করতে পারিনে। শেষকালে নালিশের ভয় দেখিয়ে তবে না তার মুখ-খানা বন্ধ করি। বলেছি, যদি আমার মেয়েকে বিয়ে না করে, তা'হলে বাপবেটীতে মিলে তা'র নামে ফৌজদারী করবো। সমস্ত পৃথিবী জানবে, ভুবন রায়ের ছেলে সুশীল রায় কি জঘন্য চরিত্রের মন্দ লোক। তখন কোথায় থাকবে তোমার পিতৃভক্তি আর কোথায় থাকবে বড়-লোকের মেয়ে সুলেখা!—এখন কোন গতিকে কালকের দিনটায় দু'হাত এক করে চাবটে মন্তর পড়িয়ে দিতে পারলেই সকল পাপের শান্তি হয়ে যায়। আজই দিতুম—তা যদি বে-আইনী হয়েছে ব'লে বিয়েটা 'ক্যানসেল' করিয়ে নেয়, সেই ভয়েই শুধু আমার ভরসা হলো না।"

নীলিমার সমস্ত শরীরের রক্ত হিমশিলায় জমাট বাঁধিয়া গেল। তাহার চলন্ত হৃৎপিণ্ড দম-ফুরানো ঘড়ির মত সহসা থমকিয়া থামিয়া পড়িল। তার চারি দিকের বায়ুস্তর অকস্মাৎ কঠিন পদার্থেরই মত ভারী হইয়া উঠিল। অসাড় হাত হইতে খাদ্যভরা রেকাবখানা কোন্ সময় যে ঝন্ ঝন্ করিয়া পড়িয়া খাবারগুলা কক্ষভূমির ইতস্ততঃ ছড়াছড়ি হইয়া গিয়াছিল, তাহা সে জানিতে পারে নাই; সে খবরটা জানিতে পারিল পিতৃমুখের কঠোর তিরস্কারে:—

"বলি আহ্লাদের চোটে কি আমার ঘরকন্নার কিছু আর রেখে যাবে না? বলি তুমিই না হয় বড়মানুষের বউ হচ্চো, আমায় কি তা বলে রাজা করে দেবে যে, আমার সর্ব্বস্ব ভেঙ্গে ছড়িয়ে লোকসান করে দিয়ে যাচ্ছো?—বলি ব্যাপারখানা কি বল্‌তে পার?"

বাপের খাবারগুলা কুড়াইয়া দিয়া কোন রকমে নীলিমা সেখান হইতে পলাইয়া আসিল। নিজের ঘরে খিল দিয়া অন্ধকারে শয্যাহীন তক্তাখানায় গিয়া বসিতেই চারিদিক হইতে একসঙ্গে একত্র বাঁধভাঙ্গা জলরাশির মত বিবিধ ও বিভিন্ন চিন্তাস্রোত তাহার বুকের মধ্যে বিচিত্র তালে তরঙ্গিত হইতে লাগিল। প্রথমতঃ ঘোর বিস্ময়ের স্থলাধিকার করিল—অপরিমেয় আনন্দ। এই গাঢ় সূচিভেদ্য অন্ধকারের আশ্রয়ে যখন মায়ের আর্ত্ত চক্ষু ও বাপের চাতুরীভরা বাক্য দর্শন-শ্রবণের অতীত হইয়া গেল, তখন শুধু একান্ত হইয়া জাগিয়া উঠিল, এতদিনের সংশয়-সঙ্কীর্ণ ক্ষীণ কল্পনার পূর্ণ পরিণতির সার্থকতা ও সুখ। সর্ব্বদেহে মনে আহ্লাদে কণ্টকিত হইয়া নীলিমা মনে মনে সুশীলের তরুণ রূপ ধ্যান করিল। কি সুন্দর সুঠাম দেহ! কি ঔদার্য্যব্যঞ্জক গভীর দৃষ্টি! আর কি সুমিষ্ট হাস্যরঞ্জিত সেই গোলাপী অধর! সে হাসির সুধা যে নীলিমার চিত্তচকোর কি দুরন্ত ক্ষুধায় মনে মনে গ্রাস করিয়া লইয়াছে! তাহার মুদিত হৃদয়কোরক সেই হাস্যরশ্মিবিভাসিত হইয়াই আজ এই সহস্র দলে বিকসিত হইয়া তীব্র লোভাকুল দৃষ্টিতে সেই গগনব্যবধান দীপ্ত সূর্য্যের পানে গোপন আকাঙ্ক্ষায় শুধু চাহিয়া ছিল। উঃ, কি আনন্দ! কি আনন্দ! কি আনন্দ রে!—আজ সেই তার মরুমরীচিকা সত্য হইতে, স্বপ্ন সফল হইতে চলিল! কি আনন্দ! নীলিমার জীবনে আজ অপ্রত্যাশিত কল্পনাতীত এ কি বিপুল আনন্দ রে! এ কি অসীম সুখ!

স্বর্গরাজ্য বাস্তবিকই কি মর্ত্ত্যমানবীর উপভোগে ধরণীর এক প্রান্তে নামিয়া আসিল না কি?

নীলিমা আনন্দোদ্বেলিত বক্ষে মনে মনে অনুভব করিতে লাগিল, সুশীলের সুকোমল, তপ্ত, স্নিগ্ধ স্পর্শ, তাহার সেই প্রণয়গভীর দৃষ্টি, সেই স্নেহ-সুশীতল দৃষ্টি সে নিজের পিপাসিত দেহ-মনে মর্ম্মে মর্ম্মে উপভোগ করিয়া লইল। নিজেকে তাহার ঘরের নবোঢ়া বধূ, গৃহলক্ষ্মী, সন্তান-জননী—সকল ভাবেই এক একবার ভাবিয়া লইল। জীবনে এ কি সার্থকতা! স্বপ্নে এ কি সুবিপুল সুখ! এ কি অযাচিত করুণা, হে দয়াময়!

ঈশ্বরের নাম লইতে গিয়া নীলিমার মনে পড়িয়া গেল, যীশুকে। এই মাসাবধি কাল স্কুলে যাওয়া বন্ধ রাখিতে হইয়াছে এবং সেই জন্য এ নামও সে লয় নাই। সত্য কথা বলিতে গেলে বলিতে হয়, সুশীলের ভিন্ন কোন দেব-মানবেরই স্মৃতি এই প্রায় একটি মাস ধরিয়াই তাহার মনের ভিতর প্রবেশাধিকারই পায় নাই। তাই আজ এমন সময়ে আনন্দ-সাগর যখন কূলপ্লাবী হইয়াছে, সেই সময় এই স্মৃতি স্মৃতিপথে উদিত হইয়া তাহার ভরাচিত্তে সামান্য একটা দোল খাওয়াইয়া দিল। যীশু? —না, না, আর ও নাম নয়!—ও নাম, ও স্মৃতি এ জীবনের অতীত হইয়া যাউক্! ভ্রমেও আর কখন যেন উহা তাহার মুখে উচ্চারিত না হয়। সে চকিত হইয়া উঠিল—আঃ কি ভাগ্যেই সে রক্ষা পাইয়া গিয়াছে! ভাগ্যে মিস্ হর্ণের কথায় সে ব্যাপ্টাইজ হইয়া বইসে নাই, হইলে কি আজ সে সুশীলকে পাইত? সুশীলের মুখে সে গল্প শুনিয়াছে, তাহার পিসিমা নিত্য শিবপূজা করেন, তাহার পিতা দুই বেলা সন্ধ্যাচ্চর্না করিয়া থাকেন; সে দেখিয়াছে, সুশীলও প্রাতে গায়ত্রী জপ করে। সে মনে মনে স্থির করিল, সরোজিনী-পিসিমার নিকটে সেও শিবপূজাবিধি শিখিয়া লইবে,

ভুবন বাবুর আহ্নিকের স্থান সে সযত্নে সাজাইয়া দিবে। কোন্ দেবতার ইঁহারা উপাসক, তাহা জানিয়া লইয়া সে-ও অপরিসীম ভক্তিভরে তাঁহাকেই উপাস্য করিবে। কে বলে, হিন্দুর ধর্ম্মে মুক্তি নাই; তাহাদের জীবনে উদারতা নাই, ত্যাগ নাই—সংযম নাই? যে বলে সে দেখুক—সুশীলকে। তাহার ত্যাগ—তাহার—তাহার—

নীলিমাব হর্ষোদ্দীপ্ত আনন্দ-স্ফীত মুখ সহসাই সেই ঘনান্ধকারে তাহারই মত কালিমাখা হইয়া গেল। তাহার মানসনেত্রে তন্মুহূর্ত্তেই অপরাহ্লালোকে দৃষ্ট সুশীলের সেই ভৎর্সনা-কঠোর ঘৃণাপূর্ণ দৃষ্টি প্রত্যক্ষ করিল। সে দৃষ্টির অগ্নি-কষা নীলিমার চিত্তে দগ্ধ ক্ষত সৃষ্টি করিয়া যে ভিতরে ভিতরে অনির্ব্বাণ হইয়াই রহিয়াছিল, সঙ্গে সঙ্গে ইহাও তখনই তখনই প্রমাণ হইয়া গেল। কেন যে সুশীল অস্পৃশ্য জাতির স্পর্শের মতই তাহার হাতের ছোঁয়া হইতে নিজেকে বাঁচাইয়া লইয়া তীব্র বিরাগে তাহার সান্নিধ্য পরিত্যাগ করিয়াছিল, এইবার সেই জটিল রহস্যের জাল আপনা আপনিই মুক্ত হইয়া গেল। উঃ, কোথায় স্বর্গ, কোথায় নন্দন? কোথায় আনন্দলোক? জ্বালা—জ্বালা! চারিদিক ব্যাপিয়া এ যে শুধু রাশি রাশি অগ্নিদাহ! অফুরন্ত আগুনের দাহকরী জ্বালা! সুশীল ত স্বেচ্ছায় তাহাকে গ্রহণ করিতেছে না।

নীলিমা দুই হাতে বুক চাপিয়া ধরিয়া লুটাইতে লাগিল। সেই দৃষ্টি! সেই ঘৃণা! সেই অকথ্য-ঘৃণা! তাহার বিনিময়ে এই সুখাকাঙ্ক্ষা? সুখ—কোথায় সুখ? পাগল—সে পাগল! যাঁ'র চোখে ওই বিদ্বেষের লেখা—যাঁ'র মনে ঐ ঘৃণার অবহেলা, তাহাকে চক্রান্তে জড়াইয়া আত্মসাৎ করিলেই সে কি তাহার আপন হইবে? অসম্ভব! নীলিমার আশা যে অসম্ভব আশা! নীলিমার পিতার দুরভিসন্ধি অপেক্ষাও অসঙ্গত অকার্য্য! জোর করিয়া তিনি তাহাকে

উহার গলায় ঝুলাইয়া দিবেন, কিন্তু সে ভার তাহার সহিবে কি ?—

সারারাত্রি ধরিয়াই সেই স্তব্ধ নিঝুম নিরালায় নিরালোকে একাকিনী বসিয়া সে ভাবিল। প্রখর ঝিল্লীরব ভিন্ন তাহার সেই অমীমাংসিত চিন্তার দ্বিতীয় কোন সাক্ষ্য রহিল না। তাহার প্রাণের ব্যাকুল নিবেদনে কোথাও হইতে কোন সাড়া আসিল না। অন্তরের সংশয়দ্বন্দ্বের কোনই সমাধান হইল না। একবার তাহার মন দারুণ বিদ্রোহভরে এই দুরন্ত লোভকে দূরীভূত করিয়া দিয়া বলে, কি হইবে অমন হীনমূল্যে হেয় হইয়া দস্যুর মত লুটিয়া লইয়া ? তেমন করিয়া কাড়িয়া লুটিয়া কেহ কি চিরদিন কাহাকেও আপন করিয়া রাখিতে পারে ? আবার মন বলে, দু'দিন দু'দিনই সই ! দু'দিনের স্মৃতিকেও ত চিরদিনের সম্বল করিয়া রাখিতে পারিবে ? স্বর্গ যখন মর্ত্তালোকের দ্বারে আসিয়াছে, তখন কেনই বা তাহাতে না প্রবেশ করিবে ?

সহসা পূর্ব্বদিকের জানালা দিয়া পীতাভ আলোর রেখা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। তন্দ্রাভঙ্গবৎ নীলিমা সবেগে উঠিয়া পড়িয়া ঘন শ্বাসে আত্মগতই বলিয়া উঠিল, "না না, সে আমার, কাজ নেই, সে সুখ আমি চাইনে, দুঃখই আমার থাক !"

দ্বার খুলিয়া সুশীলের দ্বারে আসিয়া সে মৃদু মৃদু করাঘাত করিল। তখনও ভোরের আলো ভাল করিয়া ফুটিতে পারে নাই পূর্ব্বাকাশের প্রান্তটি মাত্র গোলাপের অর্দ্ধস্ফুট মুকুলদলের মতই আধখোলা হইয়াছে। নিদাঘতপ্ত নিশার তাপদাহ প্রশমিত করিয়া মিষ্ট শীতল বায়ু সবেমাত্র বহিতে আরম্ভ করিয়াছে। সশঙ্কনেত্রে চারি দিকে চাহিয়া নীলিমা পুনশ্চ সেই রুদ্ধ দ্বারে অধীর করাঘাত করিল। দ্বারের ফুটায় মুখ রাখিয়া যতটুকু সম্ভব স্বর ঈষদুচ্চ করিয়াই বলিল,

"যদি চলে যেতে চাও এখনই ট্রেণ ছাড়বে। আর দেরি করো না।"

ঘর নিঃসাড়া, কোথাও কোন শব্দমাত্র নাই। তবে ত সুশীল নিদ্রা যাইতেছে! সে ত তবে মনের এই অবস্থাতেও নিশ্চিন্তে ঘুমাইতে পারিয়াছে? তবে বৃথা কেন নীলিমার এ সঙ্কোচ? না না বৃথাই এ সন্দেহ! সুশীল তাহাকে ভালবাসে,—নিশ্চয়ই সে তাহাকে ভালবাসে এবং তাহার হইতে তাহাব এমন কিছুই আপত্তি নাই। কিন্তু তাই কি? নাঃ এত আর ভাবা যায় না, যদিই থাকে, তবে তা থাকুক, এ লোভ নীলিমা কিছুতেই দমন করিতে পারিবে না। না না নিজের এ সর্ব্বনাশ কেনই বা সে করিতে যাইতেছিল? এত বড় নির্ব্বোধ সে!

অষ্টবিংশ পরিচ্ছেদ

তরুলতা স্বামীর কর্ম্মস্থান হইতে পিত্রালয়ে আসিয়াছিল দুইটি উদ্দেশ্য লইয়া। প্রথম, বাপ-ভাইয়ের সঙ্গে দেখাশুনা, দ্বিতীয়তঃ, তাহার ছোট দেবর শশিকান্তর সহিত বিনতার বিবাহসম্বন্ধ পাকা করা। এ বিবাহের কথা অনেক দিন ধরিয়াই চলিতেছে, শুধু ছেলের ডাক্তারীর ফাইনাল পরীক্ষার জন্যই এতদিন বিবাহ আটকাইয়া ছিল। এইবার পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হইয়া শশিকান্ত মেডিকেল কলেজ হাঁসপাতালে হাউস সার্জ্জনের পদ পাইয়াছে, বিলাতে গিয়া আরও কোন একটা বিষয় অধ্যয়ন করিবারও তার ইচ্ছা আছে। সেই জন্যই তাড়াতাড়ি বিবাহটা হইয়া যায়, পাত্রপক্ষের এই রকমই আগ্রহ। বিবাহের পর সে বিলাত যাইবে।

ভুবন বাবু সব কথা শুনিয়া বলিলেন, "বেশ ত, তাই হোক্। বিপ্রদাসও সুলেখার বিয়ের জন্য ব্যস্ত হচ্চেন, দু'জনকারই এক মাসে হয়ে যাক্ না!"

খবর শুনিয়া বাড়ীর ও পাড়ার লোক আনন্দ প্রকাশ করিল, কেবল করিল না বিনতা এবং শুভেন্দু।

বিনতা প্রথম আকারে ইঙ্গিতে, পরিশেষে স্পষ্টাক্ষরেই পিসীমা'কে গিয়া জানাইল যে, দিদির দেবরকে সে বিবাহ করিতে পারিবে না, কোন মতেই না।

পিসীমা কারণ জিজ্ঞাসা করিলে ঠোঁট উল্টাইয়া বিনতা জবাব দিল— "আহা, যে ভূতের মতন মূর্ত্তি! অন্ধকার রাত্রে দেখলে খোক্কসের বাচ্চা

ব'লে ভয় করবে না ? বেহায়াই বল, আর যা-ই কর, আমি বাবু স্পষ্ট কথার মানুষ, ওকে বিয়ে করা আমার কর্ম্ম নয়।"

পিসীমা প্রথমতঃ মেয়েকে উপদেশ ও ভৎর্সনায়, অবশেষে তোষামোদে তুষ্ট করিতে চেষ্টা করিলেন এবং সে সকলে অকৃতকার্য্য হইয়া তরুকে সব কথা জানাইলেন। তরু আসিয়া বোনকে বিস্তর সাধ্যসাধনা করিল; পরে বিরক্ত হইয়া বলিল—"কেন বাবু, ছোট ঠাকুরপোর চেহারা এমনই কি মন্দ না কি ? রংটাই তাব যা একটু শামলা।"

বিনতা খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিল—"বা রে বা ! ওই তোমার 'একটু শামলা' !—তা তুমি আর তা ছাড়া কি-ই বা বল্‌বে ? তোমার বাড়ীতে যে বার মাস অমাবস্যা লেগেই আছে ! যা হোক্, তা ব'লে তোমার শাশুড়ীর কিন্তু বাবু ওই ছেলের শশিকান্ত নাম না রেখে মসীকান্ত নাম রাখাই উচিত ছিল।—যাকে বলে কাণা পুতের নাম পদ্মলোচন, এ ঠিক তাই !"

তরু এ বিদ্রূপে রাগ করিয়া মুখ ঘুরাইয়া জবাব দিল,—"হ্যাঁ রে হ্যাঁ ! আমার ঐ অমাবস্যাই ভাল, তোর মনে না ধরে, কোথায় তোর পূর্ণিমার চাঁদ আছে, তুই সন্ধান ক'রে নি'গে যা !"

বিনতা কিছুমাত্র লজ্জা বোধ করিল না ;—অসঙ্কোচেই সে হাসিয়া কহিল—"সন্ধান তো করাই রয়েছে ! ঘরেই তো আমাদের চির পূর্ণিমা হয়ে রয়েছে, তাও কি তোমরা দেখতে পাও না ?"

বিস্ময়োত্তেজিত মুখে সংশয়ের সহিত তরু জিজ্ঞাসা করিল—"ঘরে আছে ? কে ? না না,—শুভেন্দু নয় ত ?"

বিনতা দীপ্তস্মিত মুখে উত্তর দিল—"হলেই বা তাতে দোষ কি ?"

বোনের মুখের এই সুস্পষ্ট উত্তর শুনিয়া তরুলতার মুখ ম্লান হইয়া গেল। তাহার এই স্বাধীন পতিনির্ব্বাচনটাকে সে বেশ সুনির্ব্বাচন

বলিয়া কিছুতেই মনে করিতে পারিল না, এবং ইহার বিরুদ্ধে সে দুই দিন ধরিয়া তাহার সহিত সমানেই তর্ক চালাইয়া চলিল। তারপর যথাসাধ্য চেষ্টাতেও অবশেষে বিনতার পণ ভাঙ্গিবার যখন কোনই সম্ভাবনা দেখা গেল না, তখন অগত্যাই খবরটা তাহার ভুবন বাবুকে দিতে হইল। সংবাদ শুনিয়া ভুবন বাবুরও মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। আকাশ-পাতাল অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া তিনিও পুনঃ পুনঃ গভীর দীর্ঘ-নিশ্বাস মোচন করিলেন। তাঁহার সে দিনকার ডায়েরীর পাতায় এই কথাগুলি লিখিত ছিল—"সরোজের মুখে, তাহার পর তরুর মুখেও খবর পেলেম, বিনতা না কি শশীকে বিয়ে না ক'রে শুভেন্দুকে বিয়ে করতে চায়! ওরা না কি অনেক বুঝিয়েছিল, কিছুতেই তা'র মত বদলায়নি। সকলই ভাগ্য! শশীর মত সুপাত্রকে তুচ্ছ ক'রে ঝোঁকের মাথায় শুধু রূপে মুগ্ধ হয়ে শুভেন্দুকে বিয়ে করা বিনতার নিতান্তই ছেলেমানুষী কায হচ্ছে। কিন্তু আমিও ত আর তা বলে এ সম্বন্ধে তাকে বিশেষ জোর করতেও পারি নে। পারি কি? মেয়ে বড় হয়েছে, তা'র স্বাধীন মতামত জন্মেছে।—অন্য দেশের শাস্ত্রে তো বটেই, হিন্দুশাস্ত্রমতেও এ বয়সে মেয়েকে অনূঢ়া রাখলে সে মেয়ের স্বয়ং-পতি-নির্ব্বাচনের অধিকার জন্মে থাকে।—এ ক্ষেত্রে সে আমাদের পছন্দকে যদি ঠেলে ফেলে নিজেই পছন্দ ক'রে থাকে, সে ক্ষেত্রে আমার আপত্তি করা তো চলে না। হয় ত তা'তে তা'র মানসিক শান্তি চিরদিনের মতই নষ্ট হয়ে যেতে পারে। বিশেষতঃ মনে মনে এক জনকে সে যখন পতিত্বে বরণই করেছে, তখন কোন সুযোগের খাতিরেই আর অপর জনের স্ত্রী হওয়া তা'র পক্ষে সঙ্গতও তো হবে না!—অথচ এ কি ভুল নির্ব্বাচনই সে করলে! চারু, চারু! আজ যে তুমি নাই! তুমি থাকলে কি আমায় এ সমস্যা থেকে রক্ষা করতে পারতে না? তবে কি এই জন্যই মেয়েদের বিবাহকে

কৈশোরের সীমাবদ্ধ রাখার নিয়মসৃষ্টি আমাদের সমাজে হয়েছিল? আমাদের এই জাতিভেদের শ্রেণীভেদের সমাজে অপরাপর সমাজের মত স্বাধীন নির্ব্বাচনের পথ ত মুক্ত নয়! তবু আমার সৌভাগ্য বলতে হবে যে, নিতান্তই অ-কুলীন হলেও শুভেন্দু জাত্যংশে হীন নয়।"

তরু আর একবার বোনকে ভয়মৈত্রী প্রদর্শনে বশীভূতা করিবার চেষ্টা করিল. বলিল—"রূপটাই কি সব? ছোট ঠাকুরপোর মত বিদ্যা-বুদ্ধি, মান-মর্য্যাদা, পয়সা সে সব কি শুভুর কিছু আছে? ওর কি দেখে তুই ভুল্‌লি? শুধু আলতাগোলা রং, শুকপাখীর মতন নাক, চোখ দুটো পটল চেরা আর পাতলা রাঙ্গা ঠোঁট? এ পৃথিবীতে এই কি সমস্ত?"

বিনতা ভ্রূকুটী করিয়া মুখ ফিরাইয়া লইল; তাহার পর উথলিত ক্রোধকে ঈষদ্দমন করিয়া লইয়া সবিরক্ত হাস্যে উত্তর দিল—"বলেইছি ত রূপের তর্কে তোমার অধিকার আমি কোন দিনই স্বীকার কর্‌ব না! তোমার পক্ষে কটার চাইতে কালো চামড়াই ভাল লাগা সম্ভব এবং হয় ত বা সঙ্গতও হ'তে পারে, তাই ব'লে সবাইকেই বা তা' মান্‌তে হবে কেন? তার পর, তোমার ছোট্ ঠাকুরপোর চাইতে উনি বিদ্যেয় কম হ'তে পারেন; বুদ্ধিতে যে কম, তাও হয় ত আমি মনে করিনে। এত অল্প সময়ে এমন আত্মোন্নতিসাধন কর্‌তে ক'জন লোকে পেরেছে? ব্যারিষ্টারী পড়তে বিলাত যদি যান, নিশ্চয়ই সেখান থেকে পাশ করেই ফিরবেন এবং তখন হয় ত এমনও হ'তে পারে যে, তোমার ছোট ঠাকুরপো ওঁর চেয়ে ঢের নীচেই দাঁড়িয়ে থাকবেন। লোকটা যে একটা 'জিনিয়াস্', তাতে কোনই সংশয় নেই।"

তরু মনে মনে বলিল—"জিনিয়াই'ও হ'তে পারেন!" প্রকাশ্যে পুনশ্চ অন্য পথ ধরিল; বলিল—"বেশ ত, ছোট ঠাকুরপো ছাড়া কি আর

দ্বিতীয় পাত্র ভূ-ভারতে নেই? সুন্দর ছেলে শুভুর চাইতেও অনেক অনেক পাওয়া যায়,—যাদের চাল-চুলা আছে, নাম-খ্যাতি আছে, বিদ্যাও আছে। বাবাকে বলি, তাই তিনি খুঁজে দেখুন না। বিশেষ শুভুদের ঘর যে বড্ড ছোট! শ্রোত্রিয়ের ঘর! ওদের মেয়ে আনা গেলেও, ওদের ঘরে আমাদের ঘরের মেয়ে তো একেবারেই দেওয়া যায় না।”

বিনতা বিরক্তি-বিবস কঠিন স্বরে কহিয়া উঠিল—“ঘর-দোরের অত খবর আমি জানি টানি নে। ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মেছে,—সেই ঢের। আর তা’না হ’লেও আমি কিছু আর কাকে বিয়ে করতুম না,—আর এখনও তা কারুর কোন কথাতেই করবো ও না। এই আমার প্রতিজ্ঞা।”

ভুবন বাবুর সে দিনের ডায়েরীর পাতায় লিখিত হইল—“নাঃ, সকল চেষ্টাই বৃথা হইল। বিনতার পণ অটল। হয় ত এই ভাল!—একজনকে মনে স্থান দিয়া বাহিরে অন্যের হওয়া কোন দিক দিয়া দেখিলেই আমারও সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না—উপায় নাই! এ বিবাহ আমায় দিতেই হইবে। শুভুকে বলিলাম,—সে-ও সব কথাই জানে দেখিলাম। উহারা দুই জনে অনেক দিন হইতেই না কি বিবাহের জন্য বাগদত্ত আছে বলিল। আমিই অন্ধ ও অবিবেচক। মেয়ে বড় করিয়া রাখিয়া তাহাকে অন্য বাড়ীর ছেলের সঙ্গে অবাধে মিশিতে দিয়া অন্যায় করিয়াছি।—শুভেন্দুকে প্রথমাবধি হোষ্টেলে রাখাই আমার সঙ্গত ছিল। যাক্, ‘নির্ব্বাণদীপে কিমু তৈলদানম্’—এখন আর বৃথা অনুতাপে যাহা হাতের বাহির হইয়া গিয়াছে, তাহা ফিরিবে না!—বিবাহের দিন স্থির করিতে তর্করত্ন মহাশয়কে অনুরোধ করিয়া পত্র দিলাম। সুশীলের বিবাহটাও এই সঙ্গেই হইয়া যাউক। বিনতার বিবাহে সম্ভবতঃ একটু গোলযোগ হইবে। জ্যেঠাইমা আজ বাঁচিয়া থাকিলে তাঁহার ক্ষোভের সীমা থাকিত না!—বিবাহটা যত শীঘ্র সম্ভব দিতে হইবে

এবং—এখানেই দিব। বিপ্রদাস আবার কোন গোল করিবেন না ত?—চারু!—তুমি থাকিলে হয় ত এ সব হইত না। মা যা' পারে বাপ হয় ত মেয়ের সম্বন্ধে ঠিক তেমনটি পারে না। কিন্তু ছেলেকে মায়ের চেয়ে বাপেই হয় ত ভাল রকম শিক্ষা দিতে পারে। সুশীলের বিষয়ে আমার কোন ত্রুটি হইয়াছে মনে হয় না। ভগবান এও আমার মনে কম সান্ত্বনা দেন নাই।"

পরদিনের ডায়েরীতে লিখিত হইল—"অনুকূলকে খবর দেওয়া শুভেন্দুর আদৌ ইচ্ছা নহে। সে বলে, 'বাপ আসিয়া হয় ত কোন বিভ্রাট ঘটাইবেন। ভদ্রসমাজে হয় ত আপনাদেরও তাহাতে অপমান হইতে হইবে।' সে বলে, 'বাপের ত আমার উপর টান কতই! সুশীলকে জিদ্ করিয়া রাখিলেন, আমায় প্রথম দিন হইতেই বিদায় দিতে ব্যস্ত।'—আমার মনে হয়, বাপের চেয়ে ছেলেরই এ সম্বন্ধে দোষ বেশী। এই তো সুশীল সেখানে এক মাস হইতে যায় রহিয়াছে! মা যে মৃত্যুশয্যায় তাহাতে দৃক্‌পাতও নাই। চারুশশি! এ কি হইল? মনের মধ্যে এত অশ্রদ্ধা ও অবিশ্বাস লইয়া তাহারই হাতে আমায় কন্যাদান করিতে হইবে? বীণাকে কি নিজেই আবার একবার ভাল করিয়া বুঝাইব? না, না, সেই বা কেমন করিয়া হয়? ত'াকে কি বলিব? সে যে নিজে বলিতেছে, সে শুভেন্দুকে বিবাহ করিবে বলিয়া তাহার কাছে পণে বদ্ধ, তার কি আর বদল হয়?—হয় কি তা,?

"সরোজ বলে, 'কেন হইবে না? কত বর তো ছাদ্‌নাতলা হইতেও ফিরিয়া যায়, আবার অন্য বরে বাপ মেয়ে সম্প্রদান করিয়া থাকে।' এটা তার বুঝিবার ভুল। সে কথা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র! সে বিবাহের দাতা যে মেয়ের বাপ। মেয়ে নিজে ত নহে। মেয়ে যাহাকে আত্মসমর্পণে প্রতিশ্রুত, ভালমন্দ নির্ব্বিচারে তাহাকেই তাহার নেওয়া সঙ্গত।

না হইলে যে সাবিত্রীর আদর্শ হিন্দুনারীর ভিতরে খর্ব্ব হইয়া যাইবে! মেয়ে বড় করিলে নিজের মতকে ছোট করিতেই হইবে। নহিলে তাহা অত্যাচাররূপে গণনীয় হইবে। নারীত্বের—সতীত্বের অমর্য্যাদা ঘটিবে। হয় ত ইহার ফল ভালই। হয় ত সাবিত্রীর মতই আমার বীণা মা শুভেন্দু-চরিত্রের সকল অশুভকে জয় করিয়া লইতে সমর্থা হইবেন। চারু! চারু! তুমি স্বর্গ হ'তে উহাদের আশীর্ব্বাদ করিও। সতী তুমি, তোমার আশীর্ব্বাদে তাদের ভাল হইবে।

"বড় তাড়াতাড়ি হইয়া গেল! বিবাহের দিন এ মাসে ঐ একটি ভিন্ন আর একটিও নাই।—তা হোক, যা হইবার, তা হইয়া যাউক। সুশীলকে আজ একটা 'তার' দিতে বলি।--এ' কি সুশীলের নাম ধরিয়া ডাকে কে? সরোজ না? হাঁ, তাই ত।—আমার সুশীল! আমার জীবনের আশাজ্যোতিঃ! আমার সকল দুঃখের শীতল সান্ত্বনা! আমার বংশের প্রদীপ! আমার চারুশশির ধন! এসেছ তুমি? এই একটি মাস তোমায় ছেড়ে দীর্ঘতম যুগান্তর ব'লে যেন মনে হচ্ছিল। কৈ, দেখি সে কেমন আছে? বুকে নিয়ে এই আর্ত্ত বুকটা একটুখানি জুড়িয়ে আসি। বীণা যে মনের মধ্যে আমার বড্ডই আঘাত দিয়েছে'। ওকে দেখে হয় ত একটু ভুলতেও পারবো। আঃ, সুশীল! এলি তুই!"

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

রাত্রির অন্ধকারে যাহা অসম্ভব ও আশাহীন বলিয়া প্রতীত হইতে থাকে, দিবালোকের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাহার অখণ্ডনীয়ত্বের আস্থা খণ্ডিত হইয়া তাহাকে সম্ভাবনীয়রূপে প্রতীয়মান হয়। সুশীলের যে সাহস ও শক্তি গতকল্যকার অপ্রত্যাশিত মিথ্যা অপবাদের আঘাতে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, আজ দিবসাধিপের অভ্যুদয়সূচনার সহিত আবার তাহার কিছু অংশ যেন তার বিক্ষুব্ধ ও বিক্ষিপ্ত হৃদয়প্রান্তে জাগিয়া উঠিল। নিদারুণ বাক্যশেলে বিদ্ধ তাহার আহত শোণিতাক্ত চিত্ত যেন সারা রাত্রির প্রলয়ান্ধকারের পর এতক্ষণে এই তরুণ ঊষার অভ্যুদয়ে তাহার কনকদীপ্তিতে আশারুণ রাগে আবার অনুরঞ্জিত হইয়া উঠিল। সে মনে মনে দৃঢ় এবং স্থির চিত্তে প্রতিজ্ঞা করিল, এত বড় অন্যায়ের মূল্যে সে কোনক্রমেই ইহাদের হস্তে আত্মবিক্রয় করিবে না। ইহাতে ভবিষ্যতে যাহা ঘটিবার, তাহাই ঘটুক। এই চিন্তার পর তাহার শ্রান্ত ও অবসন্ন শরীর ঘুমে আচ্ছন্ন হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল। কতক্ষণ যে ঘুমাইয়াছিল, তাহা মনে নাই, যখন সে ঘুম ভাঙ্গিল, তখন বেলা যথেষ্ট বাড়িয়া গিয়াছে। পিছন দিককার খোলা জানালা দিয়া তপ্ত হাওয়া এবং গ্রীষ্মের প্রখর রৌদ্র উভয়ই অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে গৃহে প্রবেশলাভ করিতেছে। জানালার বাহিরে ভাঙ্গা কার্ণিসের উপরে কয়েকটি কাক বসিয়া সাবধান-সূচক তীব্র স্বরে হয় ত বা তাহার এই অকাল নিদ্রার জন্য তাহাকেই তিরস্কার করিতেছিল! ঘুম ভাঙ্গিতেই আবার সকল কথাই তখন সুশীলের মনে পড়িয়া গেল। মনে পড়িতেই নিজের এই অবিমৃষ্যকারিতার জন্য

মনে মনে সে অত্যন্ত চঞ্চল ও উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। ট্রেণের সময় অতীত হইয়া গিয়াছে। কি আশ্চর্য্য, এমন বিপদ মাথায় লইয়াও মানুষের চক্ষুতে ঘুমও তো আইসে? সে তখন উঠিয়া পড়িয়া তাড়াতাড়ি একটা জামা টানিয়া গায়ে দিল ও সুটকেস খুলিয়া মনিব্যাগটা ও ঘড়িটা পকেটের মধ্যে ফেলিয়া দ্বার খুলিয়া দ্রুত বাহির হইয়া পড়িল।

"এস, এস, বর! এতক্ষণে তোমার ঘুম ভাঙ্গলো? এ দিকে আভ্যুদিক করতে ব'সে পুরুত মশাই ছটফট করতে লেগেছেন যে।"—এই সুসংবাদ প্রদান পূর্ব্বক পুরোহিত ঠাকুরের দিদি ঠাকুরাণী চারটি সধবা মেয়ে সঙ্গে লইয়া সুশীলকে চারিদিক হইতে বেড়িয়া ধরিলেন। হাতে তাঁহাদের খানিকটা করিয়া বাটা হলুদ।

দিদি কহিলেন, "ওলো বউ! মেয়েটার পাতাচাপা কপাল লো! কেমন মদনমোহন বরটী জুটেছে দেখ!"

পুরোহিতগৃহিণী অর্দ্ধাবগুণ্ঠন একটুখানি সরাইয়া অনিমেষে মুগ্ধ চোখে সুশীলের নিষ্প্রভ প্রভাতচন্দ্রের মতই দীপ্তিশূন্য মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া পুলকিত স্বরে উত্তর করিলেন, "আহা, বেঁচে থেকে ভোগ করুক গো! স্বর্ণ ঠাকুরঝি আমাদের বড় দুঃখী গো! আর নীলি মেয়েটারও কখন কোন সুখ হয় নি। মা মঙ্গলচণ্ডী যদি কৃপা ক'রে দিয়েইছেন, তা' পাকা মাথায় সিঁদুর প'রে দুটিতে একটি হয়ে যেন সুখে থেকে ভোগ করে।"

পাড়ার চণ্ডীদাসীর এই আশীর্ব্বাদের ঘটা শুনিয়া তা' সহ্য হইল না। সে তাহার পার্শ্ববর্ত্তিনীর কানের কাছে চুপি চুপি বলিয়া উঠিল, "জুটবে না কেন লো? ঘরে এনে পুষে রেখে—এখন দায়ে পড়েই না বিয়ে করছে! অমন বর জোটানর প্রবৃত্তি থাকলে আমাদেরও ঢের জুটতে পারতো! পোড়া কপাল!—পোড়া কপাল!"

কথাটা সুশীলের কানে গিয়া আবার তাহাকে কর্ত্তব্যবিমূঢ় করিয়া ফেলিল এবং সেই অবসরের ফাঁকে ফাঁকে নারীর দল তাহার ললাটে হলুদ লেপিয়া দিয়া একসঙ্গে হুলু ও শঙ্খধ্বনি করিয়া উঠিল। তখন সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া রোষক্ষুব্ধ সুশীল সকোপে কহিয়া উঠিল, "এ কি করছেন আপনারা ?"

মহিলামণ্ডলী উচ্চ হাস্তে ও তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গবিদ্রূপে তাহাকে বিব্রত করিয়া একটা সুমিষ্ট কোলাহলের সৃষ্টি করিয়া তুলিল। সুশীল বিস্তর আপত্তি করিয়াও ভদ্রতার সীমায় পা রাখিয়া তাহাদের হস্তমুক্তির কোন উপায় মাত্র না দেখিয়া শেষে নিরুপায়ে মন্ত্রনিরুদ্ধবীর্য্য সর্প-শিশুর মতই ফুলিতে লাগিল। নারীর নিকট পুরুষেব পৌরুষকে যে পবিহার করা ভিন্ন উপায় নাই !—সে আব করিবে কি ?

বরপক্ষের আভ্যুদিক করিতে বসিয়া পুরোহিত মহাশয় আগাগোড়াই না হয় তাঁহাদের তিন কুলের জীবিত মৃত ব্যক্তিবর্গকে নির্ব্বিচারে যথা-নামগোত্র দিয়াই সারিয়া লইলেন ; কিন্তু যেখানে যেখানে অধিবাসার্থ বরকে প্রয়োজন, সেই সেই স্থলে উপস্থিত হইয়াই তাঁহাকে ফাঁপরে পড়িয়া যাইতে হইল। 'বর সেই গাত্রহরিদ্রা সমাধা হইবার পর কন্যা-কর্ত্তাকে ডাকিয়া তাঁহাব সহিত কি কথাবার্ত্তা কহিবার পর হইতেই স্বর্ণলতার ঘরে আশ্রয় লইয়াছে, পুনঃ পুনঃ আহ্বানেও সে সেখান হইতে নড়ে নাই। প্রথমে ইহাকে উহাকে দিয়া, পরিশেষে অনুকূলচন্দ্র নিজে গিয়া তাহার হাত ধরিয়া পর্য্যন্ত টানাটানি করিয়াছেন, উঠাইতে পারেন নাই। তাহার কারণ শুধু সুশীলেরই উঠিতে আপত্তি মাত্র নহে ; স্বর্ণলতা দুই দুর্ব্বল বাহু দিয়া তাহাকে নিজের কাছে এমন করিয়া আগলাইয়া ধরিয়াছিলেন, ও যে কেহ তাহাকে ডাকিতে আসিতেছিল, এমন জলন্ত আগুনে ভরা ভৎ‍র্সনাপূর্ণ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া তাহাকে আরও

নিবিড় করিয়া চাপিয়া ধরিতেছিলেন যে, এমন কি, ইচ্ছা থাকিলেও সে ইঁহার হাত ছাড়াইয়া উঠিতে পারিত না।

অনুকূল রাগে আগুন হইয়া মুমূর্ষু স্ত্রীকে কুৎসিত ভাষায় গালি দিল, তাঁহার হাত জোর করিয়া ছাড়াইতে গেল,—কিন্তু শাবক-অপহরণকারীর প্রতি ব্যাঘ্রী যেমন করিয়া চাপিয়া শাবককে প্রাণপণ বলে বক্ষে চাপিয়া ধরে, তেমনই করিয়া যেন তাঁহার মৃত্যুবলে বলীয়ান চিত্ত অসীম শক্তি সংগ্রহ করিয়া সুশীলকে সজোরে চাপিয়া ধরিল। ইহা দেখিয়া সুশীল বলিল, "আপনার কি রক্তমাংসের দেহও নয়? মানুষটাকে মেরে ফেলবেন না কি?"

অনুকূল অস্পষ্ট তর্জ্জনে উভয়ের সম্বন্ধেই অনেক অকথা কুকথা কহিতে কহিতে ফিরিয়া গিয়া পুরোহিতকে বলিলেন, "মরুক গে, নেও, তবে অমনই অমনই সেরে নেও। মাগীর আজ মরণরোগে ধরেচে, জোর করতে গেলে পাছে ম'রে গিয়ে সব পণ্ড করে বসে, তাই শুধু পারলুম না—না হ'লে আজ একটা এস্পার ওস্পার হয়ে যেত। দাঁড়াও না, গোত্রটা একবার বদলে যাক। তখন এর শোধ তুলবো কি না, দুজনকার ওপোরেই!"

পুরোহিত হতভম্ববৎ হাঁ করিয়া থাকিয়া আপত্তির স্বরে বলিলেন, "তা কেমন ক'রে হবে? বর না এলে কখন এ সকল কার্য্য হয়ে থাকে? তাঁকে একবার ত আসতেই হবে, যেমন করেই হোক—"

অনুকূল ভীষণভাবে চটিয়া উঠিয়া মুখ খিঁচাইয়া বলিয়া উঠিলেন, "আরে নেও! নেও!—হয় না ত কি হয়? কুলীনদের ঘরে যে খাটের মড়া ধ'রে মেয়েদের বিয়ে দিত। তারা কি উঠে ব'সে অধিবাস করতে আসতো না কি? এ'ও না হয় তেমনই করেই হয়ে যাক না।—ভারী' তুমি পণ্ডিতী করতে এসেছ আমার কাছে! আমার জানা আছে সব।"

অগত্যা সেই রকম করিয়াই সকল কর্ম্ম সমাধা হইল। কেবল অধিবাসের ফোঁটা এবং সুতায় বাঁধা দূর্ব্বা সুশীলকে সেইখানে বসিয়াই অনিচ্ছাসহ পরিতে হইল। স্বর্ণলতা সেই চিহ্নগুলি অতি করুণদৃষ্টিতে চাহিয়া চাহিয়া দেখিলেন। তাঁহার চোখ দিয়া কয়েকফোঁটা জল পড়িল। কিন্তু সে অশ্রুতে যেন আনন্দাশ্রুরও একটু মিশ্রণ আছে বলিয়া সন্দেহ জন্মে; অথচ ইহার সহিত বিরক্তিরও প্রাচুর্য্য ছিল না তা' নয়।

বেলা তখন পড়িয়া আসিয়াছে। বাহিরে সবশুদ্ধ জন পনের লোক মিলিয়া বিবাহ-বাড়ীটাকে একটু সরগরম করিয়াছে; আর বাড়ীর ভিতরে সেই পাঁচ জন এয়ো, আর বিনা নিমন্ত্রণে অনাহূত ভাবেই আসিয়াছিল নীলিমার স্কুলের সঙ্গিনী সাবিত্রী। এই কয়টী মাত্র নর-নারীর সমাগম। বিবাহে "দীয়তাং ভুজ্যতাং" প্রভৃতির কোন জঞ্জালই নাই। বাজারের কিছু মিষ্টান্ন ও চিঁড়ে-দইয়ের সামান্য রকম আয়োজন করা আছে। যাহাদের নিতান্তই পেটের জ্বালা, তাহারাই এ বাড়ীতে ঐ সকল খাইবে।

লাল কস্তাপেড়ে সাড়ী পরা, আললাট হরিদ্রারঞ্জিত, বাম হস্তে হলুদরঙ্গা সূতায় দূর্ব্বার রাশি বাঁধা আর দুই হাতে দুইগাছি রাঙ্গা শাঁখা এই মাত্র সাজে সাজিয়া বিয়ের কনে এতক্ষণে মাঙ্গলিক কার্য্যাবসরে সকল লজ্জা পরিত্যাগ পূর্ব্বক জোর করিয়া নিজের অশান্ত হৃদয়কে ও অবাধ্য চরণকে শাসনের পাশে বাঁধিয়া লইয়া মা'কে খাওয়াইতে ঘরে ঢুকিল। গত রাত্রি হইতে মায়ের যে তা'র খাওয়া হয় নাই, সে কথা সে একেবারে না ভুলিয়া গেলেও নিজের চিন্তা, অবসরহীনতা এবং সকলের উপর সুশীলের সেখানে উপস্থিতি এই সকলে মিলিয়া আর খাবার লইয়া আসা ঘটিয়া উঠে নাই। এখন নিজেকে কঠিন করিয়া লইয়া এক হস্তে দুধের বাটি, অপর হস্তে সামান্য ফলমূল ও মিষ্টান্ন সংগ্রহ করিয়া কিঞ্চিৎ শ্লথচরণে সে আসিয়া মাতৃমন্দিরে দেখা দিল।

তাহার মা দুটি শুষ্ক লতাবৎ শীর্ণ হাতে তখনও সুশীলের হাত দুখানি ধরিয়া ব্যাকুল মর্ম্মভেদী দৃষ্টিতে তাহার আতপতপ্ত কচি কিসলয়ের মত নরম মুখখানির পানে পলকহীন চক্ষুতে চাহিয়া আছেন। নীলিমাও চকিত কটাক্ষে চাহিয়া দেখিল, সুশীলের মূর্ত্তি যেন এই একটি রাত্রিদিনের মধ্যেই আগাগোড়া বদলাইয়া গিয়াছে। তাহার মুখের সেই শিশুসুলভ সরলতা, কমনীয়তা, সকরুণ স্নেহে ভরা সেই উদার দৃষ্টি সে সব আজ কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গিয়া উহাকে যেন রুক্ষ, শুষ্ক ও কঠোর করিয়া তুলিয়াছিল। সে সুশীল যেন এ সুশীলই নয়। সেই সদা সহাস্য মুখ আজ কি দীপ্তিশূন্য! সেই আনন্দ-চপল সুশীল আজ তাহার এই বিবাহ-দিবসে কি অসীম ব্যথাকাতর চিত্তে স্তব্ধ মলিন বিমর্ষ মুখে নীরবে বসিয়া আছে! নীলিমার বুকের মধ্যে অবরুদ্ধ বেদনা টনটন করিয়া উঠিল।

আজ প্রথম প্রভাতের ব্যর্থ চেষ্টার পর এই অপ্রত্যাশিত বিবাহ-ব্যাপারের সকল অনুষ্ঠানপর্ব্ব যতই অগ্রসর হইয়া সমাপ্তির দিকে অগ্রসর হইতেছিল, নীলিমার দ্বিধাগ্রস্ত মনের সংশয়-মেঘ ততই যেন ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া তাহার আশেপাশে আশা ও আনন্দের চন্দ্রালোক অন্ধকারাচ্ছন্ন পথ প্রদীপ্ত করিয়া ছড়াইয়া পড়িতেছিল। গ্রীষ্মের গুমোট কাটিয়া যেন নৈশ শীতল বায়ুপ্রবাহ ধীরে ধীরে তাহার চিন্তাতপ্ত অন্তরকে স্নিগ্ধ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। তাহার কুণ্ঠিত চিত্ত এই বলিয়া আত্মসান্ত্বনা গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল যে, সুশীলের যেমন প্রকৃতি, তাহাতে সে কখনই নিরপরাধে তাহার প্রতি একান্ত অবিচার করিতে পারিবে না। এই দুই দিনের বিরাগ এক দিন অন্তর্হিত হইবেই। কিন্তু এখন দুই জনের চোখে চোখে বারেকের মিলন ফুটিতেই সুশীলের দৃষ্টি হইতে এমনই গভীর ঘৃণা ও বিদ্বেষের কঠোর জ্বালা ঠিকরিয়া পড়িল যে, সেই দৃষ্টি-বাণাহত হইয়া নীলিমার বুক যেন খান খান হইয়া ভাঙ্গিয়া গেল।

সুশীল যখন স্বর্ণলতার হাত হইতে নিজের হাত টানিয়া লইয়া একটু দূরে সরিয়া গেল এবং নীলিমা মা'কে দুধটুকু খাওয়াইতে বসিল, তখন সর্ব্বপ্রথম সুশীলের মনে পড়িল, সন্ধ্যার আর অধিকক্ষণ বিলম্ব নাই। আর একবার শেষ চেষ্টা করিয়া দেখিবার জন্য সে তখন শরীবমনে একটু খানি বল সংগ্রহ করিয়া লইয়া উঠিয়া গেল। কিন্তু অনুকূলের কাছাকাছি হইতেই তাহার বুকটা যেন বিশ মণ ভাবে ভারী হইয়া আসিল, কণ্ঠের কাছে অশ্রুনির্ঝর যেন তার পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিল, কোন কথা না বলিয়াই সে তাই তাড়াতাড়ি তার পাশ কাটাইয়া চলিয়া আসিল। সে তখন আশ্চর্য্য হইয়া ভাবিল যে এই লোকটার বাড়ীতে কেমন করিয়াই সে এতদিন বাস করিতে পরিয়াছিল?

অনুকূল মনে মনে হাসিয়া আত্মগতই বলিলেন, "বাবাজীবন এইবার একটু একটু ক'রে বাগে আস্‌চেন! কেমন দাওয়াইটা খাইয়েছি,—হবে না?"

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

সারা দিনের গুমোটের পর অপরাহ্ণে খুব মেঘ উঠিল। ঘোলাটে আকাশে, স্তব্ধ গাছপালায় দেখিতে দেখিতে কালবৈশাখীর চিহ্ন প্রকটিত হইয়া উঠিতে লাগিল এবং সন্ধ্যার পরেই মেঘের সেই ধোঁয়ার বর্ণ নিকষ কালো পাথরের পর্ব্বতশ্রেণীর মতই চিক্কণ কালো রূপে রূপান্তরিত হইয়া দাঁড়াইল।—সন্ধ্যার পরেই শুক্লপক্ষের জ্যোৎস্নাকে আড়াল করিয়া কেবল অন্ধকারের রাশি জাগিয়া উঠিল। বড় বড় গাছগুলা সেই অন্ধকারে অসংখ্য প্রেতমূর্ত্তির মতই স্তব্ধ হইয়া রহিল। কোথাও বাদুড়ের ঝটাপট, কোথাও আসন্ন বিপদ্‌ভীত নীড়াশ্রয়ী পাখীর করুণ কিচিমিচি ভিন্ন আর কোন সাড়াশব্দই রহিলনা। সমস্ত পৃথিবী যেন কোন আসন্ন বিপদের ভয়ে সেই অসীম অন্ধকার রাশির মধ্যে আত্মগোপন করিল।

সুশীল তাহার জন্য নির্দ্দিষ্ট সেই ঘরটার মধ্যে শ্রান্ত শরীরে প্রবেশ করিল। ঘরের মধ্যে নিবিড় অন্ধকার! দুই হাতে চোখ মুছিয়া সে বাহিরের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। বাহিরেও অন্ধকার সূচিভেদ্য, কালো মেঘে আকাশের সহিত ধরণীও ঢাকা পড়িয়া গিয়াছেন। মেঘের বুক চিরিয়া বিদ্যুতের সহস্র লোল শিখা আকাশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত উন্মত্ত ভঙ্গীতে নাচিয়া বেড়াইতেছিল। মেঘের গর্জ্জনে, ঝড়ের হুঙ্কারে নৈশপ্রকৃতির বক্ষে যেন একটা প্রলয়কাণ্ডের সূচনা চলিয়াছিল। সুশীলের নিজের বক্ষেও বোধ করি এর চেয়ে কিছু কম বিপ্লব-সংঘাত বাধে নাই! বাতাস যেমন রুদ্র তাণ্ডবে সংহার মূর্ত্তিতে সাজিয়া

উঠিয়াছিল, তাহার মনের মধ্যেও তেমনিই ঝড়ের হাওয়া তাহার আগ্রহ ও সংশয়কে লইয়া ঐ রকমই তীব্র ইচ্ছারূপে চারি পাশের অসহায় গাছপালাদের মতই আছড়াপাছড়ি করাইতেছিল। মন বলিতেছিল, এমন অসহায় শিশুর মত অত্যাচারীর অন্যায়ের পাশে নিজেকে বাঁধিতে দিতেছ? আর তা, চিরদিনেরই মত? ধিক্ তোমার ভীরুতায়! আবার অন্য দিক হইতে সংশয় বিপুল বলে সংগ্রাম করিতেছিল। তা'র, যুক্তি—দুর্নাম! কলঙ্ক! সে যে কোন কিছু দিলেই ঢাকা পড়িবে না! না; উদ্ধার নাই—তাহার উদ্ধারের কোন উপায়ই নাই!

গুরু গুরু গুরু গুরু রবে মেঘ ডাকিয়া উঠিল। সেই সঙ্গে ঝন্ ঝন্ ঝন্ ঝন্ শব্দে জীর্ণ বাড়ীর জীর্ণতর দ্বারজানালাগুলা কাঁপিয়া উঠিল। সুশীলের বক্ষও তাহাতে কম্পিত হইল। বাতাসে ঘরের পিছনে আমগাছের পাতা সর্ সর্ ঝর্ ঝর্ করিয়া গুমরিয়া গুমরিয়া উঠিতেছিল, ঝড় তাহার বিশাল দেহ ধরিয়া টানাটানি করিতে করিতে অট্টহাসি হাসিয়া বলিতেছিল,—সন্ সন্ শোন্ শোন্ শোন্ শোন্!—তাহার পর আবার মুহুর্ম্মুহুঃ মেঘগর্জ্জন শ্রুত হইয়া বৃষ্টির চড় চড় চড় চড় শব্দ আরম্ভ হইল। এই বিবিধ এবং বিচিত্র ঐক্যতানিক শব্দলহরী মিলিয়া সুশীলের পিষ্ট ও ক্লিষ্ট অন্তরটাকে যেন আর্ত্ত করিয়া তুলিল। তাহার মনে পড়িল, আজ তাহার বিবাহ! এই সবই তাহার বিবাহ বাদ্য! ঐ আকাশের মেঘ তাহার বিবাহ সভার চন্দ্রাতপ, ঐ মেঘের গর্জ্জন ব্যাণ্ডের বাজনা! ঐ ঝড়ের হুঙ্কার বরযাত্রীর কলরোল!—ঐ গাছপালার সন্‌সনানি তাহার বিবাহের ব্যাগপাইপ!—আর ঐ জলের ধারা দিয়া বুঝি তাহাকে বিদ্যুতের রোস্‌নীতে বরণ করিতে আরম্ভ করিল?—এই সঙ্গে তাহার মনে পড়িল, শত শত সুখ এবং ঐশ্বর্য্যে সমাকীর্ণ তাহার নিজ গৃহ! সেই ইন্দ্রালয়ের অধিপতি সে, আজ তাহার এই বিবাহসজ্জা? তাহার বিবাহের

এই সমারোহ? সুশীলের বুক চিরিয়া, চোখ ফাটিয়া অশ্রুপ্রবাহ যেন উদ্বেল হইয়া উঠিতে লাগিল। সেই আর্দ্র অন্ধকারে নির্ব্বান্ধব সংসারের ঘাতপ্রতিঘাতে একান্ত অনভ্যস্ত, সহায়হীন, কলঙ্কভীত, আর্ত্ত বালক মর্ম্মন্তুদ ব্যাকুলতায় অধীর হইয়া উঠিল। তাহার চোখের জলের বাঁধ ভাঙ্গিয়া উৎস ছুটিতে লাগিল। সেই অশ্রুবাষ্পমধ্যে দুইখানি উজ্জ্বল মুখ নিমেষে নিমেষে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল এবং সে অনিমেষে বদ্ধ ব্যাকুল নেত্রে সেই মুখ দুইখানার দিকে চাহিয়া তাহাদের যন্ত্রণার্ত্ত বুকের মধ্যে যেন সবলে চাপিয়া ধরিতে গেল। তাহার মনে হইতে লাগিল, এ সংসারের আর যেখানে যাহা হোক, শুধু এই দুটি মুখ—এই একান্ত প্রিয়—প্রিয়তম—প্রাণতম এই দুই জনই শুধু তাহার জীবন হইতে দূরে—বহু—বহুদূরে অপসৃত হইয়া যাইতেছে। সে যেন কোন প্রকারেই আর এই কালরাত্রির অবসানের পর ইহাদের দুই জনের কাছে তাহার এ জীবনের মধ্যে কোন দিনেই পৌঁছিতে পারিবে না! সে দুই জন তাহার পিতা এবং সুলেখা!—সুশীল সজলকাতর মৃদু স্বরে আত্মগতই উচ্চারণ করিল, "সুলেখা!—সুলেখা!"—

ঝড়ের প্রচণ্ড একটা দম্‌কা হাওয়া হাহা শব্দে সারা বিশ্বে প্রলয়কাণ্ড বাধাইয়া এই অন্ধকার ঘরের মধ্যেও ছুটিয়া আসিয়াছিল, তাহার সহিত ধূলার রাশি মিশ্রিত ছিল। সুশীলের অশ্রুসিক্ত চক্ষুতে সেই ধূলিবৃষ্টি ক্ষণেকের জন্য একটা বেদনার সৃষ্টি করাতে তাহার ব্যথাবিকল চিত্ত মুহূর্ত্তেকের জন্য বাহিরের দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইল। সেই সময়ে সহসা বিদ্যুৎস্ফুরণ হইবামাত্র তাহার চোখে পড়িল শুধু ঝড়ই নহে, তাহারই সহিত তেমনই চঞ্চল, তেমনই বিস্রস্ত কেশবাস, তেমনই উদ্বেগাকুল মূর্ত্তি লইয়া আরও কেহ সে গৃহে প্রবেশ করিয়াছিল।—বিদ্যুতের সেই ক্ষণস্থায়ী ক্ষণিকালোকেই সুশীল চিনিল, সে নীলিমা।

নীলিমা ত্বরিত দ্রুতপদে সুশীলের নিকটবর্ত্তী হইল, বায়ুর হুঙ্কার ভেদ করিয়াও তাহার ঘনশ্বাস স্পষ্টতর হইয়া শুনা যাইতেছিল। সে একটুও দ্বিধা বা বিলম্বমাত্র না করিয়া এক নিশ্বাসে বলিয়া উঠিল, "তুমি কি এখান থেকে পালিয়ে যেতে চাও ?"

সুশীল চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, প্রাণে তাহার যেন নিবন্ত আশার আলো একটি ক্ষুদ্র দীপশলাকার সাজেই জ্বলিয়া উঠিল। কে এ কথা বলিতেছে, তাহাব কোন বিচারই সে না করিয়া, বন্দীর কাছে কারাগৃহ-ত্যাগের প্রস্তাবেব মতই তৎক্ষণাৎ উগ্র ব্যাকুলতায় অধীর হইয়া উঠিয়া উত্তর করিল, "যাবার কি কোন উপায় আছে ?"

নীলিমার মনের মধ্যের শেষ ক্ষীণ আশারশ্মিটুকু এক ফুৎকারেই নিমেষেব মধ্যে নির্ব্বাপিত ও অন্তর তাহার বাহিরের মতই গাঢ় তমসাবৃত হইয়া গেল। কিন্তু তখনই সেই প্রচণ্ড বেদনাব নিদারুণ কষ্ট সংবরণ কবিয়া লইয়া রুদ্ধপ্রায় স্বরে সে উত্তবে কহিল,—"আছে, খিড়কিব দিকে এখন তো কেউ কোথাও নেই, লগ্নেব এখনও তিন ঘণ্টা দেরীও আছে, সম্ভবতঃ ইহার মধ্যে তোমাব খোঁজ খবর কেউ করবেও না। এই বেলা এই পথে চ'লে গিয়ে ৯টার গাড়ীতে পশ্চিমের দিকের টিকিট নিয়ে,—তার পর কোথাও নেমে অনায়াসেই আবার বাড়ী ফিরে যেতে পারবে।"

সুশীলের সমস্ত শরীর-মন যেন এই পরামর্শটুকু পাইবামাত্র আগুন-ঠেকা তুবড়ীর মতন্ মুহূর্ত্তে উৎসাহ-প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। সে লাফাইয়া উঠিয়া আসিয়া নীলিমার কাছে দাঁড়াইল।

"তবে—তা হলে এক্ষণই আমি চল্লেম।"

বলিয়াই ঈষৎ ভগ্নোৎসাহে সন্দিগ্ধ স্বরে থামিয়া থামিয়া কহিল, "কিন্তু,—"

নীলিমা ব্যগ্র হইয়া কহিয়া উঠিল—"আর কিন্তু দেরী কর্‌লে হবে না। কে কখন্ কোথা থেকে এসে পড়তে পারে।"

সুশীল নিজের বিপন্নাবস্থা বুঝিয়া জোর করিয়া লজ্জা সংবরণ পূর্ব্বক এক নিশ্বাসেই উচ্চারণ করিয়া গেল—"কিন্তু আমি চ'লে গেলে যদি তোমার বাবা আমার নামে নালিশ করেন?—যদি—যদি—"

নীলিমা কোনরূপ সঙ্কোচমাত্র না করিযাই সহজ স্বরে কহিল—"তুমি ত জানো,—তুমি নির্দ্দোষ।"

সুশীল আর্ত্তভাবে রুদ্ধ নিশ্বাস টানিযা লইল—"সে ত আর আমি আদালতে দাঁড়িয়ে প্রমাণ কর্‌তে পার্‌বো না!—আর এ সকল কুৎসিত জিনিষ একবার বাইরে বেরিয়ে গেলে—উঃ! না, না, তা'র চেয়ে মৃত্যু ভাল! নাঃ,—আমার বাঁচবার উপায় নেই।"

এ পরিতাপে নীলিমার বুকে বজ্রসূচি বিদ্ধ হইল। সে ক্ষণকাল নিঃশব্দে সেই কঠিন আঘাত-ব্যথা উপভোগ করিয়া তাহার পর আপনাকে দৃঢ় বলে দমন পূর্ব্বক পূর্ব্ববৎই স্থির স্বরে উত্তর করিল—"সে ভাবনার তোমার কোন মূলই নেই। আমি যদি অস্বীকার করি, আমার বাবা তোমার কোন ক্ষতিই কর্‌তে পারেন না। সব যখন আমার উপরই নির্ভর ক'রছে, তখন অনর্থক এ বৃথা চিন্তায় তুমি কেন সময় নষ্ট কর্‌তে লাগ্‌লে?"

ইহা শুনিয়া এইবার সুশীলের চলচ্চিত্ততা প্রশমিত হইয়া আসিল। একটা স্বস্তির নিশ্বাস জোর করিয়া মোচন পূর্ব্বক সে শান্তভাবে শুধু কহিল—"তবে চল"—বলিয়া সে সেই গাঢ় সূচিভেদ্য অন্ধকারে আগেই অগ্রসর হইল।

তখন নীলিমাও তাহার সঙ্গ লইল। কাছে আসিয়া মৃদু স্বরে সে কহিল—"এসো, তোমায় দোর খুলে দিয়ে আসি, অন্ধকারে হয় ত তুমি পথ ঠিক পাবে না।"

দুই জনে সেই অন্ধকারের পুঞ্জ ভেদ করিয়া চলিল। দুই জনেই চিন্তাকুল—উভয়েই নীরব।

তাড়িতের অচিরস্থায়ী শিখা মধ্যে মধ্যে তাহাদের পথ চলার যেটুকু সাহায্য করিতেছিল, নীচের তলায় নামিতেই সেটুকু ফুরাইয়া আসিল। এই পরিত্যক্ত ভিতরমহলটা যেমন অন্ধকার, তেমনই ভাঙ্গাচোরা। একটা অর্দ্ধভগ্ন পৈঠায় পা বাধিয়া সুশীল পতনোন্মুখ হইয়াই অনেক কষ্টে আপনাকে সামলাইয়া লইল। নীলিমা আপনার চিন্তাস্রোতে ডুবিয়া এতক্ষণ নীরবেই ছিল; তাহার মনের মধ্যের তারে তখনও দুই বিভিন্ন সুরের রেষ ঝঙ্কার দিয়া দিয়া উঠিতেছিল। ব্যথায় ও আনন্দে তাহার বক্ষে দুইটি তরঙ্গ সমতালে উঠা-নামা করিতেছিল। সুশীলের পদস্খলন-শব্দে চকিত চঞ্চল হইয়া সে ত্বরিতে নিজের সেই অসীম ভাবনা-সমুদ্র হইতে হাবুডুবু-খাওয়া চিত্তকে উদ্ধার করিয়া লইয়া ক্ষিপ্রচরণে তাহার নিকটবর্ত্তী হইল। ব্যগ্রকণ্ঠে কহিল—"দেখবেন, প'ড়ে গিয়ে যেন সব মাটী করবেন না।—তা'র চেয়ে বরং আমার হাতটা ধরুন, আমার এখানকার সব জানা কি না,—আপনার এতে অনেকটা সুবিধা হবে।" সুশীলকে সে এবার "আপনি" বলিয়া কথা কহিল।

সুশীল নিরাপত্তিতে আজ্ঞা প্রতিপালন করিল। তাহার মনেও ধরা পড়ার ভয় প্রচুরতর হইয়া উঠিয়াছিল। তাই অন্ধকারে হাতড়াইয়া সে নীলিমার হাত খানা বেশ দৃঢ় করিয়াই ধরিল। সুশীলের যদি নিজের বক্ষের কম্পন তখন কম থাকিত, তবে সে বুঝিতে পারিত, নীলিমার সেই কর্ম্ম-কঠিন হাতখানা কি শীতল, কি ঘর্ম্মাপ্লুত ও কি কম্পিত!

অল্পদূর আসিয়াই নীলিমা আবার কথা কহিয়া বলিল—"জুতোর শব্দ হচ্ছে, ও দুটো খুলে আমার হাতে দিন।"

সুশীল তৎক্ষণাৎ জুতা খুলিয়া হাতে লইল, বলিল—"তুমি জুতো বইবে! সে হয় না,—আমিই নিচ্ছি।"

নীলিমা আন্দাজে হাত বাড়াইয়া জুতা দুইটা ধরিল, মিনতি নহে, হুকুমের সুরেই বলিল,—"আমায় দিন।"

সুশীলের মনে মনে একটা দারুণ অস্বস্তি জাগিলেও সে আর তখন জুতা দিতে আপত্তিটুকুও করিতে পারিল না।

মুক্ত দ্বারপথে বাহিরে আসিয়াই সুশীল সহসা বলিয়া উঠিল—"ঐ যাঃ! টাকা তো আনা হয়নি! কি হ'বে এখন?"

এই অবশ্যপ্রয়োজনীয় জিনিষটাকে এত বিলম্বে মনে হওয়ায় নীলিমা মনে মনে দুই জনের উপরেই অত্যন্ত রাগ করিল। ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া সে সুশীলকে জিজ্ঞাসা করিল—"টাকা কি আপনার ব্যাগে আছে?"

সুশীল তখন নিজেকে একান্ত বিপন্ন বোধ করিতেছিল। সে প্রায় হতাশার শেষ সীমায় পৌঁছিয়া রুদ্ধকণ্ঠে উত্তর দিল—"সে আব আমি পেয়েছি! আমাব কোটের পকেটে মণিব্যাগটা রেখেছিলুম; সকালবেলা সেই যে কান্না—জানি না, আমার গা থেকে কোর ক'রে সেটা খুলে নিলেন। কোথায় আছে এখন আমি বলবো কি ক'রে? সব টাকা যে তা'তেই ছিল।"

নীলিমার মনের তারে আশার রাগিণী বিপুল ঝঙ্কারে বাজিয়া উঠিল। মাথার উপর প্রবল বৃষ্টির ধারা ঝম্ ঝম্ নিনাদে যেন সেই সুবেবই তাল দিতে লাগিল। দুরন্ত ঝড়ের হাওয়া ইহারই পোষকতা করিয়া তাহার কানের কাছে বলিতে লাগিল—"তবে আর উপায় কি? তোর কায তুই ত করিলি!"—আকাশের দীপ্ত বিদ্যুতের শিখা নীলিমার চিত্তে আবার একটা লোভের আগুন ধরাইয়া দিল। সে নিশ্চল ও নীরব রহিল।

"নীলিমা!"

নীলিমা তড়িতাহতের মতই দেহে-মনে চমকিয়া অনুভব করিল সুশীলের হাত তাহার কাঁধের উপর। সে তাহাকে নাড়া দিয়া ঐ ব্যাকুল মিনতিভরা কণ্ঠে ডাকিতেছে—"নীলিমা! নীলিমা! ঘাটে এসে আমার নৌকা ডুবে যাবে? আজকের মতন আমায় অন্ততঃ দশটা টাকাও এনে দাও, গিয়েই আমি তোমার ওটা পাঠিয়ে দেব। এত করলে যদি—এই সামান্য কাযটাও আমার জন্য করো।"

নীলিমার গলা বুজিয়া শব্দ আর বাহির হইবার পথ পাইল না। সে কি একটা অস্পষ্টভাবে বলিয়াই ছুটিয়া চলিয়া গেল।

সেটাকে আশারই বাণী বুঝিয়া সুশীল সেই ঝটিকাতাড়িত বৃষ্টি অধ্যুষিত, ঘোরান্ধকারমধ্যে অনাবৃত আকাশতলে মুক্ত প্রকৃতির ক্রোড়ে উৎকণ্ঠা-উদ্বেলকক্ষে অধীর প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিল।

এদিকে বৃষ্টির বেগ ক্রমশঃই যেন অসহনীয় বোধ হইতেছিল। বারিপাত শব্দে ঝড়ের গর্জ্জনে, ক্ষণে ক্ষণে মেঘের কড় কড় নিনাদে, বজ্রাগ্নির ক্ষণিকোদ্ভবে নৈশ প্রকৃতি ভীষণতর মূর্ত্তি ধারণ করিতেছিলেন। সুশীলের মনে হইল, দক্ষ-যজ্ঞ বিনাশের জন্য স্বয়ং রুদ্র আজ সংহারমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন।' অমনই চকিতে তাহার সতীর কথাও স্মরণ হইল। সেই পিতৃনির্য্যাতিতা সতীর মতনই যদি—

"এই নিন।"

"কৈ? কোথায়? পেয়েছ? আঃ! আমার কেবলই ভয় করছিল যে, হয় ত তুমি ধরা প'ড়ে যাবে। কত পেলে? দশই আছে! আচ্ছা এতেই ঢের হবে—ওঃ, তোমার কাছে আমি চিরদিনের মতই কেনা হয়ে রইলুম! এ উপকার আমি কখন ভুলতে পারবো না। তা হ'লে যাই? নীলিমা! জেঠাইমাকে আমার সভক্তি প্রণাম দিও—তিনি আমায় বড্ড ভালবেসেছিলেন। —আচ্ছা যাই, তাহলে?"

জ্যেঠাইমাই শুধু ভালবাসিয়াছিলেন!—আর কি কেহই বাসে নাই?—হায় নিষ্ঠুর!

সুশীল অগ্রসর হইল। সেই অবিরল জলধারা ঠেলিয়া, বাতাসের ঝাপ্‌টা ভেদ করিয়া, ঘনতমসাবৃত ধরণীর অদৃশ্য পথরেখায় দিশাহারা হইয়াও সে কোনমতে একটুখানি অগ্রসর হইয়াছিল, কিন্তু আবার কি কথা তার মনে পড়িয়া যাওয়াতে তাহাকে আর একবার ফিরিতে হইল।

"নীলিমা! আছ কি?—কই তুমি?"

বাতাসের হুহুঙ্কারে প্রথমতঃ সে ডাক নীলিমার কানে পৌঁছায় নাই। সে তখনও গতিহারা হইয়া সেইখানেই দাঁড়াইয়া ছিল। দ্বিতীয় আহ্বান কানে ঢুকিতেই বুক তাহার উল্লাসে নৃত্য করিয়া উঠিল। সুশীল তাহা হইলে আবার ফিরিয়া আসিয়াছে! সে তবে তাহাকে ত্যাগ করিতে পারে নাই!

বিদ্যুতের আলোয় সুশীল দেখিল, নীলিমা ঠিক সেইখানেই দাঁড়াইয়া। সে তখন দ্রুতপদে তার কাছে আসিয়া অস্থির স্বরে কহিয়া উঠিল—"কিন্তু তোমার বাবা যদি তোমায় পীড়ন ক'রে সাক্ষী দেওয়ান? তিনি জোর করলে তুমি কি তাঁকে বাধা দিতে পারবে?"

—হরি! হরি! এই তাহার এত বড় আত্মত্যাগের শেষ পুরস্কার! এই তাহার সর্ব্বত্যাগের সমস্ত পরিণাম? এখনও সেই স্বার্থচিন্তা! সেই আত্মরক্ষার ক্ষুদ্রতম সতর্কতা! নীলিমার জন্য প্রাণের কোণেও এতটুকু একটু সহানুভূতি—করুণা—কৃপা বিন্দুমাত্র—কণামাত্রও কি জাগে নাই!—নীলিমা এখনও তোমার কাছে—সেই তুচ্ছতম, ক্ষুদ্রতম, হীনতম গরীবের মেয়ে? আর তাই-ই সে এতখানি দানের পরেও রহিয়া গেল? এই তাহার এ জন্মের চিরস্থায়ী পরিচয়? কোন মূল্যেই কি ইহার আর বিস্মৃতি নাই?—পরিবর্ত্তন নাই?

নীলিমাকে বাক্যহারা দেখিয়া সুশীল মনে মনে অত্যন্ত অধীর হইয়া উঠিল।

"তা হ'লে কি হবে, নীল্? তোমার উপরেই যে আমার সমস্ত নির্ভর করচে! তুমি নিজেকে তখন কঠিন রাখতে পারবে ত?"

নীলিমার একবার মনে হইল, উচ্চ চীৎকারে এই ঝড়ের তাণ্ডব, বৃষ্টির উন্মত্ত চীৎকার, অশনির কড় কড় নিনাদ এই সমস্তকেই ডুবাইয়া দিয়া, বিশ্বপ্রকৃতির কর্ণপটহ দীর্ণ-বিদীর্ণ করিয়া তুলিয়া সে তাহার ফাটান বুকের রক্তঝরা আর্ত্তনাদটাকে বাহির করিয়া দিয়া বলে—"ওগো নিষ্ঠুর! ওগো কঠিন! ওগো পাষাণ! আর নয়,—আর নয়—সাঙ্গ কর,—সাঙ্গ কর, সাঙ্গ কর গো! তোমার এ ক্ষুদ্র স্বার্থের খেলা তুমি সাঙ্গ কর। তাহা না হ'লে হয় ত আমার মনের প্রাণপণে বাঁধা বীণার চড়ানো তার কাটিয়া খান খান হইয়া পড়িয়া যাইবে। হয় ত কোন্ সময় বলিয়া ফেলিব, 'না, আমি পারিব না।' আমিও মানুষ—রক্তমাংসে আমারও এই শরীর একদিন একই ঈশ্বরের হাতে গঠিত হইয়াছিল। বুকে আমারও ঐ রকম অজস্র বাসনা-কামনার রাশি, বরং সকলই তাহার অতৃপ্ত ও অভুক্ত। লোভকে আমি জয় করিতেছি বলিয়াই সে যে আমায় ছাড়িয়া গিয়াছে, সে ভরসাও আমার খুব বেশী নাই! হয় ত কোন্ সময় সে প্রবল প্রতাপে জাগিয়া উঠিয়া, আমার সকল ত্যাগের মূল কাটিয়া, চিত্তে আমার জয়ের আসন পাতিয়া বসিবে। এইবার তুমি যাও—আর কেন?—যাও, সুলেখার স্বর্ণমন্দিরের মরকত-আসনে তোমার বিরামশয্যা তো বিস্তৃতই আছে। তবে আর কি? তবে আর বিলম্ব কি জন্য? কেন এ ফিরে আসা? হে পথিক! তোমরই এই শ্রান্ত-ক্লান্ত সংগ্রামপথের যাত্রা শেষ করিয়া ইহার লজ্জাঙ্কিত হেয় স্মৃতিটুকু পর্য্যন্ত সেখানে বসিয়া তুমি নিঃশেষেই ধুইয়া মুছিয়া ফেলিয়া দিতে

পারিবে।—তাই দিও!—হে অতিথি! অভাগার এই দৈন্যে পূর্ণ দুর্দ্দিনের আতিথ্যকে দুঃস্বপ্ন বলিয়াই—যদি কখনও বা মনে পড়ে ত মন হইতে সুদূরে ঠেলিয়া দিতে দ্বিধা করিও না। তবে আর কেন? যাবেই যদি তো যাও!—এ সন্দেহ, ভয়, সংশয় কি তোমার শেষ হইবে না? না এখনও লোভীকে—দরিদ্রকে বিশ্বাস করিতে পারিতেছ না? তা' তোমার দোষ নাই! লোভ যে দারিদ্র্যের ধর্ম্ম!

বৃষ্টির শিলাকঠিন ধারা মাথার উপর মুহুর্ম্মুহুঃ মুষলাঘাত করিতেছিল, ভয়ানক শব্দে জল, স্থল, আকাশ, পৃথিবী কাঁপাইয়া অদূরে বজ্রপাত হইল। ক্ষণকালের জন্য তাহারই সহস্র বৈদ্যুতিক আলোকপ্রবাহ সেই লণ্ডভণ্ড দীর্ণবিদীর্ণ বিপর্য্যস্ত পৃথিবীর প্রকৃতির আর্ত্তমূর্ত্তি সুপ্রকট করিয়া তুলিল। সুশীল সে আলোতে নীলিমাকে সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পাইল। দেখিয়া তাহার মনটা যেন সহসা চমকাইয়া উঠিল। সে মুখ যেন মৃত্যুপাণ্ডুতায় ভরা স্বর্ণলতারই মুখ!

"নীলিমা!"

"না না, ভয় নেই! আমি ত বলেছি! তবু কি বিশ্বাস করতে ভরসা হচ্চে না? যান যান, চ'লে যান। কেন বৃথা সময় নষ্ট করছেন? ট্রেণ ফেল করলে হয় ত আবার বিপদে পড়বেন। ওঃ না, না,—আর না,—এখনই যান,—এখনই যান।"—নীলিমা ছুটিয়া আসিয়া বাড়ীর ভিতরে ঢুকিল।

এক মুহূর্ত্ত মাত্র পরেই সুশীল আবার সেই দুর্যোগে ভরা মুক্ত প্রকৃতির মধ্যে অনিশ্চিত পদক্ষেপে যাত্রারম্ভ করিয়া মুক্তির নিশ্বাস গ্রহণ পূর্ব্বক মনে মনে বলিল—"যাক্, বাঁচা গেল!"

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

সন্ধ্যা হয় হয় ; আকাশ মেঘে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে ; মেঘের গায়ে মধ্যে মধ্যে বিদ্যুৎ ঝলকিতেছিল। সেই অন্ধকার আকাশে কুটিল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ভ্রূকুঞ্চন সহকারে অনুকূল বলিলেন, "দিনটে আজ শুভদিনই বটে।—দিব্যি একটি পুরোমাত্রায় ঝড়-বৃষ্টি হ'বারই লক্ষণটা দেখছি।"

বিবাহে উপকরণ-দক্ষিণাদির অপ্রাচুর্য্য বশতঃ, বিশেষতঃ বিবাহবিধির আগাগোড়াই অব্যবস্থায় বিরক্তচিত্ত পুরোহিতমহাশয় কন্যা-কর্ত্তার এই অদ্ভুত মন্তব্যে শ্লেষ-গম্ভীর মুখে কহিয়া উঠিলেন, "হ্যাঁ, আপনার মেয়ের বিবাহে দেবতারাই বর-যাত্রী হয়ে আস্ছেন দেখছি! মানুষকে ত আর নিমন্ত্রণ করা হল না। অগত্যা!"

কথাটার মধ্যে বিদ্রূপের তীব্রতা লক্ষ্য করিয়া অনুকূল ভ্রূ কুঞ্চিত করিলেন। গম্ভীর মুখে ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, "না হে, ঠাট্টা নয়! এই ঝড়-জল হওয়াটা বড়ই সুলক্ষণ! দেখ, আমি নেমন্তন্ন কর্লেও এই কাল-বৈশাখী মাথায় নিয়ে কেউ কি আর আমার বাড়ী পেট টাল্তে আস্ত? ভাগ্যে ভাগ্যে আমি তেমনধারা উদ্যুগটি করিনি, তাই, নইলে দেখতে দাঁড়িয়ে লোকসানটি হয়ে যেত!"

সন্ধ্যার পর হইতে রাত্রি আড়াই প্রহর পর্য্যন্ত আকাশে বাতাসে মিলিয়া যতই মাতামাতি করিল, অনুকূলের মনের ভিতর নিশ্চিন্ততার শান্তি ততই নিবিড়তর হইল। সারাদিনটা ধরিয়া তাঁহাকে যে সুনীলের উপর নজরটি রাখিতে হইয়াছিল, এখন আর তাহার প্রয়োজন নাই বুঝিয়া শান্তচিত্তে কলিকাটা চাপিয়া সাজিলেন এবং পরম আনন্দে উহা

উপভোগান্তে সম্প্রদান ঘরেরই এক পাশে একটা মাদুর বিছাইয়া একটুখানি আরাম করিতে শুইবামাত্র তাঁহার নাসিকা ঘোররবে গর্জ্জন করিয়া উঠিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই বিবাহবাড়ী বৃষ্টির সমতালের সহিত ঐক্যতানিক হইয়া উঠিল, দিকে দিকে নানা সুরের নানাবিধ নাসিকা-ধ্বনি।

যখন বৃষ্টির বেগ মন্দীভূত ও ঝড়ের দাপাদাপি ক্রমশঃ প্রশমিত হইয়া আসিল, তখন বিবাহলগ্নও উত্তীর্ণপ্রায় হইয়া আসিয়াছে। প্রথম নিদ্রাভঙ্গ হইল পুরোহিত বেণী ভট্‌চাযের। তিনি তখন চোখ রগ-ড়াইয়া, এক টিপ নস্য লইয়া, প্রথমে শুধু গলায়—তাহার পর গা ঠেলিয়া অনুকূলকে জাগাইলেন।

'কত্তা! বলি কত্তা! মেয়ের বিয়ে কি কাল সকালে দেবেন? রাত যে ওদিকে ভোর হয়ে গেল।"

চোখ মুছিতে মুছিতে অনুকূল তাড়াতাড়ি বর কনে আনিতে উপরতলায় ছুটিলেন।

কনে একখানি খাটো লাল চেলী পরিয়া, চণ্ডীর পুঁথি কোলে করিয়া সেইমাত্র পিঁড়ির উপর বসিয়াছে। স্বল্পমাত্র পূর্ব্বেই বেণী ভট্‌চাযের বোন্ ও গৃহিণী তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া উঠিয়া তাড়াতাড়ি মেয়ে-সজ্জায় মন দিয়াছেন। অনুকূলকে দেখিয়া ভট্টাচার্য্য-গৃহিণী মাথার কাপড় একটুখানি টানিয়া দিলেন, ভগিনী আধা-ঘোমটার মধ্য হইতে মৃদুস্বরে কহিলেন, "বর তুমি নিয়ে যাও, কনেকে এই চন্দনটুকু পরিয়ে আর পায়ে একটু আলতা দিয়ে দিলেই সব হয়ে যায়।"

এই বলিয়া শয্যালীনা স্বর্ণলতার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "সোনা-রূপোর আঁচড় ত আর কোথাও পড়বে না?"

তাঁহার মৌন দৃষ্টিতে কোন ভাষা না পাইয়া আপন মনেই বিড় বিড় করিয়া বলিলেন, "না হোক্, ভাগ্যে থাকে, ঢের পরবে—এই নে নীলি!

এই 'গো'টা (গুয়া) গালে দিয়ে রাখ। বাসরঘরে বরকে কেটে খাওয়াতে হ'বে। বউ, দেখ ভাই, চিতের কাঠি, ধুঁতরো, পীদিম, এসব ঠিক আছে ত? তালা-চাবিটে দিস্ বাপু, ভুলিসনে যেন ওটা—মায়ের মতন মেয়েকে যেন চিরকালটা মুখ বন্ধ ক'রেই না কাটাতে হয়! এবার ওটা একটু বদল হোক্।"

অনুকূল সুশীলের অনুসন্ধান করিতে আর কোথায় বাকী রাখিলেন না। তাহার পরও যখন তাহার দেখা পাওয়া গেল না, তখন তিনি অনেকক্ষণ যেন ইতিকর্ত্তব্যতা খুঁজিয়া পাইলেন না। এত বড় ঝড়-বৃষ্টি মাথায় করিয়া যে সুশীলের মতন সুশীল ছেলে এই মধ্যরাত্রে তাঁহার বাড়ী হইতে পলাইতে পারে, এ যেন সহজে বিশ্বাসই হয় না। আবার একবার এ ঘরটা সে ঘরটা খুঁজিয়া দেখিতে হইল। নাঃ, সে এ বাড়ীর কোনখানেই ত নাই! কখন্ গেল? তা'র চামড়ার ব্যাগ দুইটাই পড়িয়া আছে। তাহার মনিব্যাগ? নাঃ, সে-ও ত আজ সকালে শতাধিক মুদ্রা সমেত তাঁ'রই হস্তগত হইয়াছিল, সেটা—হ্যাঁ, এই ত রহিয়াছে! তবে কি লইয়া গেল সে?

বিস্ময়বিমূঢ়বৎ তিনি ফিরিয়া আসিয়া মেয়েকেই প্রশ্ন করিলেন, "সুশীল কোথা গেছে রে?"

নীলিমার ততক্ষণে আলতা-চন্দনের সাজ শেষ হইয়াছিল। তাহার সলিলার্দ্র কেশের রাশি হইতে তখনও জল ঝরিতেছে বলিয়া তাহা শুধু বাঁধা হয় নাই। আর সকলে কার্য্যান্তরে গিয়াছে, একা ভট্টাচার্য্য-গৃহিণী পিছনে বসিয়া শুষ্ক বস্ত্রে সেই রাশিকরা ভিজা চুল ঘষিয়া ঘষিয়া মুছিয়া দিতেছিলেন। বাপের প্রশ্নে আসন্ন বিপদের ছায়ায় নীলিমার মুখখানা অন্ধকার হইয়া আসিল, কিন্তু প্রথম বারের এই প্রশ্নটাকে এড়াইয়া গিয়া সে যথাপূর্ব্ব স্থিরভাবেই বসিয়া রহিল, উত্তর দিল না।

তখন মুখ খিঁচাইয়া রোষতীব্র কণ্ঠে অনুকূল বলিয়া উঠিলেন, "আবার লজ্জা করা হচ্চে! ঝাঁটা মার অমন লজ্জার মুখে! যা' জিজ্ঞেস করছি, তা'র ত এখন সোজা জবাব দে, এর পর তখন শ্বশুরবাড়ী গিয়ে যত পারিস লজ্জা করিস!—বলি সেই নবাবপুত্তুরটি এমন সময় গেলেন কোথা? এ দিকে যে লগ্ন-টগ্ন সব ভস্ম হয়, তা'র খোঁজ আছে কিছু তোমাদের? আমিই না হয় একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। তোমরা ত আর মর নি' ডাকলেই ত হ'ত আমাকে। তা' এখন তিনি গেলেন কোথা?"

নীলিমা মুখ তুলিয়া দ্রুতস্বরে বলিল, "চ'লে গেছেন।"—বলিয়াই এবার সে তাহার মায়ের মুখের দিকে তাকাইল এবং তাহাতে দেখিল যে, স্বর্ণলতা এই সংবাদে অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। কিন্তু এই কথাটি এমনই আকস্মিকভাবে শ্রুত হইল যে, অনুকূল প্রথমটা যেন তাহার মর্ম্মগ্রহ করিয়া উঠিতে পারিলেন না। তিনি বিস্ময়বিহ্বলবৎ হাঁ করিয়া মেয়ের মুখের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। নীলিমা সে দৃষ্টি অনুভব করিয়া মনের মধ্যে অস্বস্থ হইয়া উঠিল।

বিস্ময়ের প্রথম বেগটা দমনে আসিলেও তাহার বেষ তখনও যেন ফুরায় নাই, তাই অনুকূলের বিস্ময়ে স্তব্ধ কণ্ঠ হইতে যেন আপনা আপনিই স্খলিত হইয়া পড়িল, "চ'লে গেছেন! কোথায় গেলেন?"

নীলিমা আবার সুধীরে তার নত দৃষ্টি উত্তোলন পূর্ব্বক মৃদু অথচ পরিষ্কার স্বরেই প্রত্যুত্তর দিল,—"বাড়ী।"

এতক্ষণে অনুকূলের বিহ্বলতা ঘুচিয়া গেল। আহত শার্দ্দূলের ন্যায় ক্রোধরক্ত নেত্রে তিনি নীলিমার মুখের দিকে চাহিলেন। চাহিবার সঙ্গে সঙ্গেই বোধ হইল যেন, তাঁহার সেই আগুনের গোলার মত চোখ দুইটা ঠিক্‌রাইয়া বাহির হইয়া ছুটিয়া গিয়া এইবার নীলিমাকে বিদ্ধ করিবে। রোষগম্ভীর তীব্র স্বরে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তার হাতে তো টাকা

ছিল না, বাড়ী যাবার টাকা সে পেলে কোথায়? নিশ্চয়ই তাহ'লে তুই দিয়েছিস্?"

তাঁহার সেই রোষকঠোর দৃষ্টিতে কিছুমাত্র ভীত না হইয়াই নীলিমা বলিল, "দিয়েছি।"

"আমার টাকা চুরি ক'রে তাকে দিয়েছিস্?"

নীলিমা নীরবে চাহিয়া রহিল। অনুকূলের সিংহনাদ পদপ্রহারে সমস্ত ঘরখানা তখন অকস্মাৎ ঝন্-ঝন্ শব্দে কাঁপিয়া উঠিল। তিনি নিজে শুদ্ধ প্রচণ্ড ক্রোধে থর থর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে চীৎকার করিয়া উঠিলেন,—"সয়তানি! বেইমানি! যা'র জন্যে চুরি করি, সেই বলে চোর! তোর ভাল করতে গেলুম, আর তুই-ই কি না আমার এই করলি? কি হ'ল তোর এ কায ক'রে? বল্ শীগ্গির, কিসের জন্যে তুই এত বড় আহাম্মুকি করলি? বল্ শীগ্গির, বল!—না হ'লে আজ তোকে পাঁটা কাটা ক'রে আমি কেটেই ফেলবো। বল্ শীগ্গির বল্—"

বা'ঘর মত গর্জ্জন করিতে করিতে মেয়ের ঘাড়ের উপর পড়িয়া লাথি চড়, কিল দুহাতে দুপায়ে অজস্রধারে বর্ষণ করিতে করিতে অনুকূল এই কথা বলিতে লাগিলেন। নীলিমা ইহার প্রতিবাদে একটি কথাও কহিল না। অথবা এ কার্য্যে তাহাকে বাধামাত্রও সে প্রদান করিল না। সম্পূর্ণই নিঃশব্দে রহিল। আর ভট্টাচার্য্য-গৃহিণীও ঠিক সেই খানে ও সেই ভাবে গামছা হাতে কাঠের মতই অ-স্পষ্ট হইয়া বসিয়া রহিলেন। তাঁরও এতটুকু প্রতিবাদের ভরসা হইল না।

এদিকে কুদ্ধগর্জ্জনে অনুকূল চেঁচাইতে লাগিলেন—"মুখে আজ তোর রক্ত তুলে তবে ছাড়বো কি!—এখনই তোর হয়েছে কি! মিশনরী ইস্কুলে লিখাপড়া শিখে বিবি হয়েছেন! বরের সঙ্গে লুকিয়ে লুকিয়ে কোর্টশিপ্ করছিলেন, জানতে পেরে আমি বিয়ে দিতে গেছি, এই

আমার মস্ত অপরাধ হয়েছে, না ? শেষে আমারই পয়সা ভেঙ্গে পালিয়ে যেতে দিলি! অ্যাঁ! কেন এ কায করলি? কেন কর্‌লি? এর মানে আমি যে এখনও বুঝতে পারচিনে! অ্যাঁ!—বল্ রাক্ষুসি! শীগ্‌গির করে বল? কেন কর্‌লি?"

"ওগো! স্বর্ণদিদি যে মূর্চ্ছা গেছে, তোমরা ও করচো কি?" ভট্টাচার্য্য-গৃহিণীর সভয় চীৎকারে অনুকূল তখন অর্দ্ধমৃতা নীলিমাকে ছাড়িয়া দিলেন।

বেণী ভট্চায একটু কাসিয়া মাথাটাকে বারকতক কণ্ডুয়ন পূর্ব্বক কহিলেন, "তা হ'লে চক্রবর্ত্তী মশাই! এই রাত্রেই ত অন্য বর আমাদের খোঁজ করতে হবে। এ মেয়ের ত আর রাত পোয়ালে বিয়ে হ'বে না, আর আপনারও তা'তে জাত যাবে।"

মন্তব্য শুনিয়া অনুকূল দাঁত-মুখ খিঁচাইয়া ক্রোধপরুষ কণ্ঠে জবাব দিলেন, "ও মেয়ের বিয়ে আবার দেবে কে যে হবে? ও হারামজাদী মরুক গে, চুলোয় যাক্ গে, ওর কোন খবরে আর আমি নেই। এত বড় ছোটলোকের মেয়ে, আমার টাকা চুরি ক'রে ক'রে সেটাকে এত দিন ধরে খাইয়ে দাইয়ে আবার আমারই টাকা চুরি ক'রে কি না পালিয়ে যেতে দিলে! কলিকাল বটে!"

ভট্টাচার্য্য এক টিপ নস্য লইয়া বিস্ময়গম্ভীরস্বরে কহিলেন, "সমাজ ত তা' শুনবে না, ভায়া! রাত পোহাবার পূর্ব্বেই কন্যাসম্প্রদানটি কর্‌বার ব্যবস্থা হওয়া চাই ই চাই। তা যদি আপনার সম্মতি থাকে, তা হ'লে বরং আমি বরের জোগাড়টা কোন রকমে করে দিতেও পারি। আপনারই স্বঘর, আমার ভগ্নীর ভাসুর হন, সম্প্রতি স্ত্রীবিয়োগ হয়েছে।—এই আপনারই সমবয়সী হবেন আর কি। বিবাহে একান্তই ইচ্ছা আছে, কেবল পুত্র কন্যা আর পুত্রবধূদের ভয়েই পারেন নাই। তা' এ রকম

অবস্থায় নিশ্চয়ই তিনি সানন্দে সম্মত হবেন, এবং একটু কৌশল ক'রে আনিয়ে নিলেই ঘরের লোকেরাও কিছুই জান্‌তে পার্‌বে না। দেখুন, যদি যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করেন, তা' হ'লে না হয় চেষ্টা করি, সময় সংক্ষেপ।"

অনুকূলের মনের মধ্যে ক্রোধের বহ্নি তখনও ঊর্দ্ধশীর্ষে জ্বলিতেছিল, এবং সে ক্রোধের সঙ্গে একটা প্রচণ্ড বিদ্বেষেরও তীব্র জ্বালা মিশ্রিত ছিল; তাই জাতি হারাইবার ভয়ে নয়, শুধু নীলিমাকে জব্দ করিবার লোভে তিনি এ প্রস্তাবে তৎক্ষণাৎই সম্মত হইলেন। তাহার পর আর একটা কথা মনে পড়িতেই অমনি ত্রস্তে উঠিয়া চলিয়া গেলেন।

এদিকে ততক্ষণে স্বর্ণলতার হৃতসংজ্ঞা ফিরিয়া আসিয়াছিল, ভট্টাচার্য্য-পরিবার তাঁহাকে বেড়িয়া বসিয়া, নানা আক্ষেপোক্তি শুনাইয়া, মড়ার উপর খাঁড়া চালাইতেছিলেন এবং নীলিমা নীরব নতমুখে মা'কে পাখার বাতাস করিতেছিল। তাহার মুখে মাথায় ধূলা ও স্থানে স্থানে শোণিত চিহ্ন থাকিলেও তাহাকে ঝড়ের আকাশের মতই স্থির ও স্তব্ধ দেখাইতেছিল।

অনুকূল আসিয়াই এয়োদের উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, "আপনারা স্ত্রী-আচারের জোগাড় যন্ত্র করে রাখুন গিয়ে,—পুরুতদাদা বর নিয়ে এই এখনই এলেন ব'লে।

মেয়েরা বিস্ময়চমকিতভাবে ত্রস্তে উঠিয়া গেলেন। বর কে? ইহা জানিবার আগ্রহ অবশ্য সকলেরই চিত্তে সমান থাকিলেও ভরসা করিয়া কেহ আর উঁহাকে সে কথাটা জিজ্ঞাসা পর্য্যন্ত করিতে পারিলেন না।

সবাই উঠিয়া গেলে অনুকূল ডাকিলেন—"নীলি!"

নীলিমা সুধীরে দৃষ্টি উঠাইয়া বাপের মুখে তাহা নিবদ্ধ করিল। দৃষ্টিতে তাহার ভয় বা ভাবনা কিছুই ছিল না।

পিতা কহিলেন, "তোমার সামনে দুটো রাস্তা পড়ে রয়েছে। এক, কাল সকালে সুশীলের নামে ফৌজদারীতে নালিশ দায়ের করা,—যে, সে তোমার সঙ্গে অবৈধ ব্যবহার ক'রে—তোমায় বিয়ে করতে রাজী হ'য়ে, অবশেষে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে গেছে। এ মোকদ্দমা হ'লে খুব সম্ভব ভুবন বাবু হয় তোমায় বউ কর্‌বে, না হয় ঢের টাকা দিয়ে আমাদের মুখ বন্ধ করবে।—বোধ করি শেষেরটারই বেশী সম্ভব। তারপর যদি সে বলে, তুমিই তা'কে যেতে দিয়েছ—তা' হ'লে তোমায় বলতে হবে যে, তোমায় মেরে ফেলবার ভয় দেখিয়ে তোমার হাত থেকে জোর ক'রে সে টাকাটা কেড়ে নিয়েছিল। কেমন, এতে রাজী আছত? এতে ঢের টাকা পাবে। অন্ততঃ পাঁচ ছ' হাজারের কম তো নয় ত, চাই কি জোর কর্‌লে তখন হয় ত দশ হাজার'ও হ'তে পারে।—কেমন, রাজী আছ?"

নীলিমা ক্ষণকাল নীরবে চাহিয়া থাকিয়া তারপর ধীরে ধীরে মাথা নাড়িল,—"না।"

অনুকূলের মুখ লোহিতবর্ণ ধারণ করিল, শ্লেষপরুষ কণ্ঠে পুনশ্চ কহিতে লাগিলেন, "আর এক পথ,—এই যে, নিমাই ভট্‌চায—আমাদের ভট্‌চাযের ভগ্নীপতির বড় ভাই, তা'কে' বিয়ে করা। বর ওরা আন্‌তে গেছে,—এখনই এলো ব'লে, কেমন? তাতে' তুমি রাজী আছত?—যেমন তোমার বরাত! অমন সোনার চাঁদের মতন বর তোমারতো পছন্দ হলো না। বল্‌ছি, নালিশ ক'রে না হয় টাকাটাই নিয়ে নিয়ে পায়ের উপর পা দিয়ে চিরজন্মটা ব'সে কাটা, তা-ও ত শুন্‌বিনে। তা' হ'লে আর আমি কি করবো বল্‌? মর্‌ এখন নিমাই ভট্‌চাযকে বিয়ে ক'রে তার শ্রাদ্ধর পিণ্ডি রেঁধে"—

নীলিমা অবিচলিত দৃষ্টিতে যথাপূর্ব্বই চাহিয়া রহিল।

এমন সময় ঘরের মধ্যে যেন অকস্মাৎ প্রবল ভূমিকম্প হইল। সহসা

রোগীর খাটখানা মচ্‌মচ্‌ শব্দ করিয়া উঠিল। পিতা ও কন্যা উভয়েই একসঙ্গে সবিস্ময়ে মুখ ফিরাইয়া দেখিল যে, তা'র উপর সেই মাসাধিক কালের অনড় রোগী তখন ধড়মড়িয়া উঠিয়া বসিয়াছেন।—তাঁহার দুই বিস্ফারিত নেত্রে কেবল অকথ্য ভীতি।

অনুকূল সে দিকে লক্ষ্যমাত্র না করিয়াই নিজ বক্তব্য সমাধা করিতে লাগিলেন—"কি বলিস্? নালিশ কর্‌বি? আমি" যা' যা' শিখিয়ে দেব, তুই শুধু সেই কথাগুলো ঠিক করে ব'লে যাবি,—আর কিচ্ছুটিই তোকে করতে হবে না, শুদ্ধ এইটুকু। দেখ্!—এখনও বল্, কর্‌বি? নিমাই ভট্‌চাযের বয়েস কত জানিস্?—ছাপ্পান্ন বছর! দেখ, আমার পরামর্শটা নে, সেবই তাতে ভাল হ'বে। দশ হাজার টাকা কি সোজা টাকা! মনে করে দেখ দেখি, তাতে তোর কতটা সুবিধে হবে?"

নীলিমা নিঃশব্দ দৃঢ়পদে উঠিয়া মা'কে শয়ন করাইবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল, বাপের কথার জবাবও দিলনা।

"কি বলিস্, কর্‌বি? কথা ক'!"

"না।"

এমন সময় দ্বারের নিকট হইতে বেণী ভট্‌চায উৎসাহপ্রফুল্ল মুখে ডাক দিয়া বলিলেন, "ওহে ভায়া! বর এনেছি যে! এখনই কনে নিয়ে চট্ ক'রে চ'লে এসে দুটো মন্ত্র প'ড়ে যাও। স্ত্রীআচার-টাচারের আর সময়ও নাই,—আর কি জানো, ওগুলো ঠিক শাস্ত্রীয়ও নয়,—না হ'লেও কিছু আসে যায় না। চট্ ক'’র চ'লে এস ভায়া, সকাল হ'তে আর বাকী নেই।"

এইবার সহসা বাক্‌শক্তিহারা স্বর্ণলতা ঊর্দ্ধস্বরে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন,—"নালা! মা আমার! বাপের পাপের প্রায়শ্চিত্ত ক'রে কে

পুণ্যটুকু তুমি সঞ্চয় করেছ, তা'র এই পুরস্কার—তোমার বাপ হয়ে উনি তোমায় ভাল মতেই আজ দিচ্চেন! কিন্তু আমি বল্‌ছি,—তোর মা হয়েও বল্‌ছি যে, তুই ম'রে যা—তুই ম'রে যা!—কোন দিনই বুক ভ'রে তোদের কোন কিছুই দিতে পারিনি, আজ এই অন্তিমকালের বুকভরা আশীর্ব্বাদ ঢেলে দিয়ে গেলুম—কসাইয়ের হাতে বিক্রী হওয়ার চেয়ে মরণকে তুই বরণ কর্। একজন উপরে নিশ্চয়ই আছেন—যিনি কার্য্যের ভিতর কারণ খুঁজে দেখেন। তিনি তোকে নিশ্চয়ই তার জন্যে ক্ষমা করবেন।—কিন্তু এ অত্যাচারের দণ্ড কিছুতেই মাথায় নিস নে, চিরকাল জ্বলে মর্‌বি।"

বাতাহত কদলীকাণ্ডের মত অকস্মাৎ তাঁহার প্রাণহীন দেহ খাটের উপর হইতে গড়াইয়া মাটিতে পড়িয়া গেল।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

পর্ব্বতের কঠিন বক্ষ বিদারিত করিয়া স্রোতস্বিনীর স্নিগ্ধ ধারা যখন প্রবাহিত হইতে থাকে, তখন পর্ব্বত যেমন কোনরূপ কঠোরতা দিয়াই তাহাকে রুদ্ধ রাখিতে পারে না, পরন্তু বাধা দিতে গেলেই সে ক্ষুদ্র ধারা শতগুণ স্ফীতবক্ষে জলপ্রপাতের আকাব ধারণ পূর্ব্বক সেই প্রস্তরকারা উল্লঙ্ঘন করিয়া ভীষণ গর্জ্জনে ধরণীবক্ষে আছড়াইয়া পড়িয়া বিশালকায়া নদীরূপ ধাবণ করে, সুশীলের অন্তবে নীলিমার স্মৃতি তেমনই যতই বাধা পাইতে লাগিল, ততই যেন তাহা বর্ষাবারিপুষ্ট তটিনীর ন্যায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতে লাগিল। তবে সে বাত্রে পশ্চিমের টিকিট কিনিয়া সে যখন একখানা থার্ড ক্লাস কম্পার্টমেণ্টে চাপিয়া বসিল, তখন তাহার শরীর মনে কোন কিছুই চিন্তা করিবাব মত সামর্থ্য ছিল না। তাই সে ভিজা সার্টটা খুলিয়া ফেলিয়া আর্দ্রবস্ত্র যথাসাধ্য নিংড়াইয়া পরিয়া একখানা গদিশূন্য ধূলি-ধূসরিত বেঞ্চিব উপর বাহুতে মাথা রাখিয়া শুইয়া পড়িল এবং প্রায় ঘণ্টার পরে ঘণ্টা তেমনই নিদ্রাহীন, চিন্তাহীন অবস্থায় পড়িয়া থাকিয়াই কাটাইয়া দিল। অপ্রত্যাশিত জটিল ও ভয়াবহ ঘটনাচক্রের আকস্মিক ঘাত-প্রতিঘাত, তাহার উপর অনাহার, দুর্ভাবনা, আতঙ্ক ও পরিশ্রম মিলিয়া তাহার সুখ-লালিত কোমল দেহ মনকে যেন কেমন একটা সুগভীর ক্লান্তিতে সমাচ্ছন্ন ও অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিল। প্রবল উত্তেজনার পরেই বিষম অবসাদের আক্রমণ অনিবার্য্য। সুশীলেরও সমুন্নত অন্তরাত্মা তাহার দেহের সহিত সমভাবেই সেই একান্ত অবসাদের মহান্ধকারে আক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

অল্প-স্বল্প অনুভব করিতে পারিল সে * * * ছাড়াইয়া। তখন ঝড-বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছে—অথবা এত দূরপথে তাহারা সে দিন দেখাও দেয় নাই। খোলা জানালা দিয়া নক্ষত্রখচিত আকাশ দেখা যাইতেছিল; গভীর কালো আকাশের গায়ে উজ্জ্বল তারকাগুলা শতনরী হীরকহারের মত ঝক্‌মক্ ঝলমল কবিতেছিল। মাঝে মাঝে কেন্দ্রভ্রষ্ট এক একটা উল্কা অগ্নিগোলকের ন্যায় অন্ধকাব ব্যোমপথ প্রদীপ্ত করিয়া দেবরোষাগ্নির রূপে ধরণীব পানে ছুটিয়া আসিতেছিল। মুক্ত গবাক্ষপথে দৃষ্টি মেলিয়া সুশীল স্থিরভাবে পড়িয়া রহিল। নৈশ শীতল বায়ু ধীবে ধীরে আসিয়া তাহাব চিন্তাতপ্ত ললাট স্পর্শ করিতে লাগিল। সে স্নিগ্ধ স্পর্শে সুশীলের ক্লান্ত চক্ষু আবারও ধীরে ধীবে মুদ্রিত হইয়া আসিল, নামিবাব কথা তার স্মৃতি পথে উদিত হইল না।

সকালবেলা সেই তন্দ্রাটুকু ভাঙ্গিয়া গেলে সুশীল দেখিল, ট্রেণখানা * * পৌঁছিয়া থামিয়াছে। রাত্রিব নিবীড় অন্ধকাব তখন দিবসেব স্নিগ্ধ আলোকে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। ঘুম ভাঙ্গিয়া জাগিয়া উঠিয়া গত বজনীব সেই দুর্যোগময়ী প্রকৃতি এবং দুর্যোগে পূর্ণ জীবনেব স্মৃতি সহসা তাহার দুঃস্বপ্ন বলিয়াই বোধ হইয়াছিল। তাহাব পব একে একে ক্রমে ক্রমে সকল কথাই তাহাব বিস্ময়বিকল চিত্তে উদিত হইতে লাগিল এবং ইহার যাথার্থ্য সম্বন্ধে সাক্ষ্য প্রদান করিল—তাহার নিজের এই অনির্দ্দিষ্ট পথের যাত্রা এবং কর্দ্দমাক্ত মলিন জুতা-কাপড়! সজাগ হইয়া তাড়াতাড়ি সে ট্রেণ ছাড়িয়া নামিয়া পড়িল। যে ষ্টেশনের টিকিট কেনা হইয়াছিল, সেখান হইতে সে আরও কয়েকটা ষ্টেশন বেশী আসিয়া পড়িয়াছে, ইহার জন্য দণ্ড দিতে হইবে। তাহার পর কলিকাতা ফিরিবার মত সম্বল ত তাহার হাতে থাকেনা! সুশীলের মাথা টিপ্‌টিপ করিয়া উঠিল। এ কি বে-হিসাবী কাণ্ড করিয়া সে আবার একটা

জটিলতার মধ্যে নিজেকে জড়িত করিয়া ফেলিল! একেই ত মাথার উপর সেই আসন্ন বিপদ তাহাকে অশনি প্রহারে উদ্যত হইয়া রহিয়াছে; তাহারই বীভৎস কুৎসিত মূর্ত্তি স্মরণে আসিতেই সমুদয় হৃদয়-শোণিত তাহার শীতল হইয়া উঠিতেছিল, আবার এই একটা ছোট ব্যাপার লইয়া না জানি কত ভোগই বা তাহাকে ভুগিতে হয়! ক্ষোভে ও লজ্জায় তাহার যেন কান্না পাইতে লাগিল। কিন্তু এখন আর তার উপায়ই বা কি? একটা উপায় অবশ্য আছে, কিন্তু সেটাকে অবলম্বন করিবার কথা মনে প'ড়তেই সুশীলের সমুদয় মনুষ্যত্ব যেন কুণ্ঠিত হইয়া উঠিল। ছি ছি, মন তাহার এত বড় হীনতার কথাও ভাবিতে পারিল! এ কি তবে সেই হীন সংস্রবেরই ফল?

এই হীন সংস্রবের স্মরণে একসঙ্গে হুড়াহুড়ি করিয়া সুশীলের স্মৃতি-পথে অজস্র বিভিন্ন চিন্তা-তরঙ্গ জাগিয়া উঠিল। পিতার কথা, নিজের সুখময় স্মৃতিময় গৃহের কথা, বিপ্রদাস ও সুলেখার কথা। বিপ্রদাসের কথা মনে পড়িতেই তাহার আকপোল-কণ্ঠ লোহিত রাগে রঞ্জিত হইয়া উঠিল। স্বতঃই মনে মনে একটা তুলনামূলক সমালোচনা দেখা দিল অনুকূলের সঙ্গে। তখন তাহার শুষ্ক ওষ্ঠাধরে একটুখানি ঘৃণা ও পরিতাপের মৃদু হাস্য ফুটিয়া উঠিল। শ্বশুরভাগ্যটাই কি তাহার এই রকম! সেবারেও বেত্রাঘাতে ইহার আরম্ভ। আর এবারে?—তাহার পর সে ভাবিল সুলেখাকে। সেই নির্জ্জন সান্ধ্য অন্ধকারে নিতান্ত অবমানিত লাঞ্ছিত বালকের লজ্জিত ভয়ার্ত্ত অন্তরে কোন ছদ্মবেশী দেববালার মতই তাহার আকস্মিক আবির্ভাব! সে দিনের স্মৃতিকথা সুশীলের হৃদয়ে উজ্জ্বলতর সুবর্ণাক্ষরে ক্ষোদিত হইয়া আছে, কালের ধূলিজাল তাহাকে আচ্ছন্ন করিতে পারিবে না, সময়ের বিস্মৃতি-হস্ত তাহাকে অস্পষ্ট করিয়া ফেলিতে অপারগ। স্নেহে, শ্রদ্ধায়,

প্রীতিতে কণ্টকিত হইয়া সে নিজের সেই মানসপ্রতিমাকে মনের মধ্যে স্মরণ করিল। বিপ্রদাসের সকল কলঙ্ক ঐ অকলঙ্ক পূর্ণিমাচন্দ্রের অম্লান জ্যোতিস্তরঙ্গে যে বিধৌত হইয়া গিয়াছে। বিপ্রদাস নিষ্ঠুর, স্বার্থপর ও গর্ব্বান্ধ হইলেও সুলেখা যে মূর্ত্তিমতী দেবী!

সুশীলের তরতরবেগে প্রবাহিত এই একটানা চিন্তাস্রোতে সহসা একটা বিরুদ্ধ তরঙ্গ কোথা হইতে ভাসিয়া আসিয়া আঘাত করিল। সহসা সুলেখার সেই অনিন্দ্য জ্যোতিঃপূর্ণ মুখখানাকে আড়াল করিয়া আর একটা পরিচিত—অতি পরিচিত মূর্ত্তি অমনই সুস্পষ্টভাবেই যেন আত্মপ্রকাশ করিয়া দাঁড়াইল। সুশীল সবিস্ময়ে দেখিল, সে মুখ সরমকুণ্ঠিতা অপরাধিনী নীলিমার। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! যেন আজ আর সেই পূর্ব্বেকার ত্রস্ত, ভীত কুণ্ঠিত মূর্ত্তি নহে, আজ ইহার কোথাও কোন কুণ্ঠা নাই, দ্বিধা নাই, এ যেন নিজের অধিকারবলে আজ দৃঢ়পদে স্মিত মুখে আসিয়া তার মুখের সামনে মুখ তুলিয়া দাঁড়াইল। সুশীল ইহার সমুজ্জল স্থিরদৃষ্টির আঘাতে যেন একটু অপ্রস্তুত হইয়া উঠিয়া দৃষ্টি নত করিয়া লইল। সহসা তার মনে হইল, যদি বিপ্রদাসের আচরণ সুলেখাকে কলঙ্কিত না করে, তবে অনুকূলের পাপেই বা নীলিমা পাপী হইবে কেন? তখন সুশীলের চিত্তে চিন্তাস্রোত উল্টা হাওয়ায় বিপরীত মুখেই বহিতে লাগিল। বিগত রাত্রির বিচিত্র ঘটনাটা এতক্ষণ তাহার আধ-জাগ্রত চিত্তে যেন বৈচিত্র্যে ভরা স্বপ্নজালের মতই একটা বিহ্বলতার সৃষ্টি করিতেছিল। কিন্তু এখন সেটা সকল স্মৃতি-রেখাকে সুস্পষ্ট করিয়া দিয়া স্ফুটতর হইয়া উঠিল এবং সেই অপূর্ব্ব ঘটনা জালের জটিল গ্রন্থিগুলি আপনা হইতেই খুলিয়া খুলিয়া তাহার মধ্য হইতে ঐ একটি মুখই তাহার মনের চোখে ভাস্বর হইয়া উঠিতে লাগিল। সুশীলের এতক্ষণকার আত্মচিন্তার স্থল অতি সহসাই পরার্থপরতার অতি সমুজ্জল দৃষ্টান্তটা অধিকার করিয়া লইল। তখন বিস্ময়ে অভিভূতপ্রায়

হইয়া গিয়া তাহার মনে পড়িল যে, নীলিমা কাল নিজেকে কতখানি বঞ্চিত করিয়াই তাহাকে এই মুক্তিদান করিয়াছে!

সুশীল সুদীর্ঘ একটা নিশ্বাস সজোরে টানিয়া ফেলিল। যে কথাটা অতর্কিত বিপদের পরিবেষ্টনের মধ্যে পড়িয়া তাহার একবারও মনে পড়িতে পায় নাই, এখন এই নিরালায় একা বসিয়া অতীত কথা স্মরণ করিতে গিয়া তাহাই তাহার হৃদয়কে অধিকার করিয়া লইল। তাহা নীলিমার বিপন্নাবস্থার আশঙ্কা। সুশীলের চিত্তে কেমন একটা গ্লানির মতই কি একটা জিনিষ যেন তাহার মনটাকে এই বলিয়া পীড়িত করিতে লাগিল যে, তুমি ত বাঁচিলে, এখন সেই হতভাগীর কি দশা তাহার বাপে করিবে, তাহার কি কিছু ঠিকানা আছে? সেই যে সুশীলের পলায়নের সহায় হইয়াছিল, এ কথা জানিতে পারিলে, চাই কি মেয়েকে সে রাক্ষসটা খুনও তো করিতে পারে!

এ চিন্তায় সুশীলের আপাদমস্তক কাঁপিয়া উঠিল। সে সবই পারে—যদি তাই হয়, সত্যই যদি সুশীলকে বাঁচাইতে গিয়া নীলিমাকে প্রাণ দিতে হয়? ওঃ!—ওঃ! কেন সে এই কথাটা কাল রাত্রে একবারটিও ভাবিয়া দেখিল না? কি নিশ্চিন্ত মনেই চলিয়া আসিল। উঃ বড় অন্যায় হইয়াছে।

বহুক্ষণ ধরিয়া সেই ক্ষুদ্র ষ্টেশনের ক্ষুদ্র প্ল্যাটফরমের একটা ধারে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া বসিয়া সুশীল এই রকম কত কি আকাশপাতাল ভাবিয়া অস্থির হইয়া উঠিল। কিন্তু এ সকল পরস্পরবিরোধী চিন্তার সে কোথাও যেন কূল খুঁজিয়া পাইল না। নীলিমার অদৃষ্টে এতক্ষণ না জানি কি হইয়াছে? ভাবিয়া মন তাহার ব্যাকুলতায় অধীর হইয়া উঠিতেছিল—এমন কি, নিজের স্বার্থে সম্পূর্ণ বিসর্জ্জন দিয়া পুনশ্চ সেখানে ফিরিয়া গিয়া অনুকুল-প্রদত্ত অত্যাচারের অংশগ্রহণে এই কাপুরুষতার প্রায়শ্চিত্ত গ্রহণের কথাও এক একবার তাহার মনে হইয়াছিল। কিন্তু মানুষ নিজের মায়া-

টাকে বড় সহজেতো কাটাইতে পাবেনা। এই চিন্তার সঙ্গে সঙ্গেই বিপরীত ভাবের তরঙ্গ চিত্তকে আন্দোলিত করিয়া যুক্তি দেখাইল যে, নিশ্চয়ই নীলিমা তাহার সাহায্য করার কথা স্বীকার করে নাই এবং তাহাকে এ ক্ষেত্রে সন্দেহ করিবার তো কথাও নহে। অতএব এই বৃথা আত্মোৎসর্গের প্রয়োজনীয়তা কোথায়?

এই চিন্তায় গুরুভাবাতুর হৃদয় অনেকখানি যেন লঘু হইলেও একটা সূক্ষ্ম অথচ অতি তীব্র অনুতাপের বেদনা সুশীলকে ভিতরে ভিতরে পীড়িত করিয়াই রাখিল এবং নীলিমার নিকট হইতে সে আগাগোড়াই যে নির্ব্বাক ও নিঃস্বার্থ সেবা-যত্নগুলা পাইয়াছে, তাহার সেবাকুশলতার, স্বার্থশূন্যতার, কর্ম্মশক্তির, ধৈর্য্যেব যে সকল পবিচয় সে এ যাবৎ পাইয়া আসিয়াছে, আর তাহার উপর সর্ব্বাপেক্ষা বড় করিযা নিজেকে কেবল মাত্র কর্ত্তব্যের খাতিরেই এই যে এত বড় বলিদানটা সে কবিল, এই সকল একত্র মিলিত হইয়া তাহার কৃতজ্ঞ হৃদয়কে তাহার প্রতি স্নেহে, শ্রদ্ধায় এবং হয় ত তদপেক্ষাও সমধিক বেগবান্ আরও কোন কিছুতে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতে লাগিল। সুলেখার উজ্জ্বল মূর্ত্তি ইহার পাশে আজ যেন একটুখানি নিষ্প্রভই বোধ হইতেছিল। তার মনে হইল যদি এই সুলেখাকে তার বাপ বহু পূর্ব্বাবধিই বাগ্দত্তা বধূ রূপে নির্ব্বাচন কবিয়া না রাখিতেন তবে হয়ত তার পক্ষে ভালই হইত। নীলিমার প্রতি তাহাকে এরূপ অমানুষিক নির্ম্মমতা প্রদর্শন করিয়া আসিবাব প্রয়োজন হইতনা। মনটা তার নিতান্তই ব্যথিত হইয়া উঠিল।

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

বাড়ী ফিরিতে সুশীলের প্রায় সপ্তাহকাল বিলম্ব ঘটিল। এই দিন সাতেকের ইতিহাসটা মোটামুটি এই রকম,—

সে দিন * * ষ্টেশনের প্ল্যাটফরমে থার্ড ক্লাস-যাত্রীরা সকলেই চলিয়া গেল। বহুবিলম্বিত দু'তিনখানা প্যাসেঞ্জার ট্রেণ গতায়াত করিল, কিন্তু সুশীল ঠিক সেই একরকমেই গভীর চিন্তাভারাতুর আচ্ছন্ন অভিভূতবৎ বসিয়াই রহিল। উঠিল না, নড়িল না বা সে সম্বন্ধীয় কোন চিন্তাও হয় ত তখন তাহার মনের মধ্য হইতে মুছিয়া গিয়াছিল। মাথার উপর রুদ্র বৈশাখের খরতপ্ত রৌদ্র লইয়া ঘর্ম্মাক্ত শরীরে শুষ্ক কণ্ঠে আর কর্ত্তব্যবিমূঢ় চিত্ত লইয়া সে আকাশ পাতাল ভাবিয়া অস্থির হইতেছিল।

ষ্টেশন মাষ্টার নিজের কর্ত্তব্য সমাধা করিয়া নিকটবর্ত্তী বাসাবাড়ীতে মধ্যাহ্নভোজনের জন্য যাইতেছিলেন, দৃষ্টি সুশীলের প্রতি বদ্ধ হইল। তাহার কর্দ্দমলিপ্ত চটিজুতা, তাহার কাদামাখা ধুতী-পিরাণ, রুক্ষ ও বিপর্য্যস্ত কেশ, এ সকলে দেখিবার কিছুই ছিল না, ছিল শুধু তাহার দক্ষিণ হস্তের কব্জিতে বাঁধা হলদে সূতায় শুষ্ক কয়েকটি দূর্ব্বাদল। বিস্মিত নেত্রে নিরীক্ষণ করিতে করিতে কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কে হে তুমি? সেই ভোর থেকে ব'সে আছ? যাবে কোথায়?"

সুশীল এই অতর্কিত সম্বোধনে চকিত হইয়া চম্‌কাইয়া উঠিল। তাহার পর মুখ ফিরাইয়া দেখিয়া উত্তর করিল, "কল্‌কাতা।"

"কল্‌কাতা যাবে? তবে ঐ ৯টার প্যাসেঞ্জারটায় গেলে না কেন? ওটার চাইতে সুবিধার ট্রেণ ত আর একটাও নেই।"

সুশীল শুষ্কমুখে চাহিয়া রহিল।

ষ্টেশন-মাষ্টারের কৌতূহল বাধা মানিল না। সহসা তিনি সুশীলের সেই সূতাবাঁধা হাতটার প্রতি অঙ্গুলী নির্দ্দেশপূর্ব্বক সকৌতুকে প্রশ্ন করিয়া উঠিলেন, "তোমার হাতে বিয়ের সূতো বাঁধা দেখছি, কিন্তু"—বাক্যের পাদপূরণ করিলেন অদৃশ্য বধূর বৃথান্বেষণ চেষ্টায় ইতস্ততঃ দৃষ্টিসঞ্চালন পূর্ব্বক।—তাহার পর স্মিতমুখে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সঙ্গে বউ ত কই দেখছিনে ?"

সুশীলের শ্রান্তিমলিন মুখ এই কথায় লোহিতবর্ণ ধারণ করিল, সে নিরুত্তরে স্তব্ধ হইয়া রহিল। তা' দেখিয়া ষ্টেশন-মাষ্টারের সহসা সন্দেহ হইল যে, হয়ত লোকটা পাগল, মা-বাপ ছেলের পাগলত্ব গোপন করিয়া কোন নিরীহ বালিকার স্কন্ধে ইহাকে চাপাইতেছিল, কিন্তু তাহার ভাগ্যের জোর থাকায় ভগবান্ ইহার মাথায় পলাইয়া আসার খেয়াল চাপাইয়া দিয়া থাকিবেন।—এই কথাটা মনে হওয়ায় তাঁহার মনটা একটুখানি প্রসন্ন হইয়া উঠিল এবং তিনি কোমল স্বরে সুশীলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিছু খেয়েছ ?"

আবার একটা ত্বরিত রক্তোচ্ছ্বাস তড়িদ্বেগে সুশীলের কণ্ঠ, কপোল ও কর্ণমূল রক্তিম করিয়া দিয়া বহিয়া গেল। কিন্তু অকস্মাৎ কি ভাবিয়া সে-ও যেন আত্মসংবরণ করিয়া লইয়া হাসিমুখে ঘাড় নাড়িল— "না"

"খাবি কিছু ?"

সুশীল একমুহূর্ত্ত ভাবিয়া লইয়া হাসিয়া মাথা হেলাইল।—খাইবে।

বাস্তবিকই তখন তাহার জঠরানল যেরূপ প্রচণ্ডবেগে জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, ইহার অপেক্ষাও তুচ্ছভাবে কেহ তাহাকে এ প্রস্তাব জানাইলে তাহাতেও হয় ত সে নিমন্ত্রণ গ্রহণে সে দ্বিধা করিত না।

"আয় তবে আমার সঙ্গে আয়"—বলিয়া ষ্টেশন-মাষ্টার তাঁহার

সম্মুখের দিকেই অগ্রসর হইলেন, এবং সুশীলও অসঙ্কোচে তাঁহার সঙ্গ লইল। তিনি যে উহাকে নিতান্ত দরিদ্রাবস্থা বলিয়াই মনে করিয়া লইয়াছেন, ইহা বুঝিয়া সে অনেকখানি আশ্বস্ত এবং একটা বেশ কৌতুক বোধও করিতেছিল। পথে সে হাতের সুতাটা খুলিয়া ফেলিয়া দিল। খুলিবার ও ফেলিবার সময় আর একবার নীলিমার মুখখানা তাহার মনের আকাশে তড়িৎস্ফূর্ত্তির মতই চকিতে উঠিয়া মিলাইয়া গেল। অন্তরের মধ্য হইতে একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস উত্থিত হইয়া আসিল। —আহা বেচারা!

ষ্টেশন-মাষ্টারের গৃহে আসিয়া আর এক বিভ্রাট উপস্থিত হইল। এত বেলায় এক পূর্ণবয়স্ক অতিথি সঙ্গে আসিতে দেখিয়া ষ্টেশন-মাষ্টার-গৃহিণী স্বামীর প্রতি বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। রাগের মাথায় যা মুখে আসিল তাই বলিয়া অবশেষে উঁচু গলায় শেষ মন্তব্য প্রকাশ করিলেন, "এনেছ সথ ক'রে, নিজের ভাতগুলো ধ'রে দিয়ে এক থালা ছাই বেড়ে এনে দিচ্ছি, তাই খাওসে।"

স্বামীটী বিনতি সুরে অনেক মিনতি স্তুতি করিতে লাগিলেন, বাহিরে থাকিয়া সে-সকলের ভাষাগত অর্থবোধ না হইলেও তাহার ভাবার্থ বুঝিতে সুশীলের পক্ষে বাধা ঘটিল না। তাহার সঙ্গে আরও একটা শব্দ অকস্মাৎ তাহার কানে আসিয়া বাজিতে সে যথেষ্ট বিস্মিত হইলেও সেই সঙ্গেই মনে মনে ইহাতে অপরিমিত কৌতুকও বোধ করিল। সে শুনিতে পাইল, ষ্টেশন-মাষ্টারটী তাঁহার কুপিতা-প্রিয়ার মনস্তুষ্টির জন্য নানা কথার মাঝখানে বলিয়া বসিলেন, "ওকে কি আর শুধুই এনেছি? তুমি যে সে দিন এক জন রাঁধুনীর খোঁজ করতে বলেছিলে না, তারই জন্যেই না এনেছি।"

এ কথায় গৃহিণী সহসা অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া কহিয়া উঠিলেন, "আহা,

তাই বল! তা এতক্ষণ বললি কেন ছাই? আচ্ছা, নাও, এখন মুখ-হাত ধুয়ে খেতে বসো, ওলো বিমল! নে' চট্ ক'রে, তোর বাবাকে একটা ঠাঁই ক'রে দে,—বলি গেলে কোথা? আছ না মরেছ?"

"যাই মা," বলিয়া একটি বছর তেরোর মেয়ে আধখোলা রুক্ষ চুলের বেণী দুলাইয়া ছুটিয়া আ'সল। সে তখন পাড়ার দুটি হিন্দুস্থানী ছেলে-মেয়ের সঙ্গে কড়ি খেলিতে ব্যস্ত ছিল। মা তাহাকে দেখিয়া বলিলেন, "ধেড়ে মেয়ের দিনরাত কেবল কড়ি খেলা। যা, শীগ্‌গির ঠাঁই ক'রে দিয়ে, একখানা থাল ধুয়ে দে, দেখ—ভাতটা বেড়ে ফেলি। হাঁাগা! তোমার ঐ রাঁধুনীটাকে দুটো ছাতুটাতু দি'ল এ বেলাটা আর চলবে না? ভাত ত আর রাঁধা হয় নি ওর জন্যে।"

সুশীলের মনটা একটু শঙ্কিত হইয়া উঠিল। ছাতু! সে কেমন লাগিবে? তাহার পরই সে মনটাকে সহজ করিয়া লইল। তাই বা মন্দ কি? বরং সেইটাই তাহার এই রাঁধুনী-জীবনের সহিত অধিকতরই খাপ খাইবে। ছাতু খাইবার জন্যই সে মনে মনে প্রস্তুত হইয়া উৎসুক হইয়া রহিল। তাহার মনে হইতেছিল ছাতু ছাড়িয়া আস্ত ঘোড়ার দানা পাইলেও সে এখন খাইতে পারে। ক্ষুধার জ্বালা ও তৃষ্ণার কষ্ট ক্রমেই তাহার পক্ষে অসহ্যতর হইয়া উঠিতেছিল।

যা হউক, অবশেষে এক মুঠা হাঁড়িচাঁচা ভাতের সঙ্গে চারিটি ছাতু, একটু গুড় ও একঘটী ঠাণ্ডা জল সে খাইতে পাইল। সেই 'বিমল'-নাম-ধারিণী অনূঢ়া কন্যাটি এই সকল ভোজ্য বস্তু তাহাকে আনিয়া দিয়া আদেশ করিয়া গেল, "খেয়ে উঠে বেশ ক'রে গোবর দিয়ে 'ঝুটা' মুক্ত করো, আর বাসন-মাজা নোংরা হয় না দেখ! তা হ'লে 'দোহরায়কে' মল্‌তে হবে।"

গোবরে হাত দিতে অত্যন্ত ঘৃণা বোধ করিলেও আলগোছভাবে কোনমতে সুশীল সে আদেশও পালন করিল।

ষ্টেশন-মাষ্টারের ক্ষুদ্র বাসবাড়ীতে মোটে দুখানি ঘর। একখানি কর্ত্তার শয়নগৃহ, অপরখানি প্রয়োজন-মত বাহিরের ঘর হয়, আবার রাত্রে ছেলেমেয়েদেরও কেহ কেহ সে গৃহে শয়ন করিয়া থাকে। ইহারই এক প্রান্তে খালি মেজের উপর হাতে মাথা দিয়া সুশীল শুইয়া পড়িল এবং তাহার এই সম্পূর্ণ নূতন কৌতুকপ্রদ অবস্থার কথা সকৌতুকে মনে করিতে করিতে অতি সত্বরেই সে গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িল। বিছাইবার জন্য একটা মাদুর চাহিয়া পাঠাইতে উত্তর পাইয়াছিল যে, রাঁধুনী মানুষের আবার বিছানার কি দরকার? নবাবের বেটা ত আর এ বাড়ীতে রাঁধিতে আসে নাই!

সন্ধ্যার পরে যখন সুশীলের ঘুম ভাঙ্গিল, সে তখনই অনুভব করিল, বাড়ীর মধ্যে খুব একটা সোরগোল চলিতেছিল। একটুক্ষণ পরেই বুঝিতে পারা গেল যে, সেটা তাহারই উদ্দেশ্যে। গৃহিণী গৃহান্তর হইতে সপ্তমে গলা চড়াইয়া চীৎকার করিয়া বলিতেছিলেন, "ও মা! এ কেমন রাঁধুনী নিয়ে এল গো! এ যে দেখি কুম্ভকর্ণের পিস্তুতো ভাই! এর কানের কাছে ঢাক পিটোলেও সাড়া দেয় না যে! মিন্সে ম'রে গেল না কি? ওলো ও বিমল! এক ঘটী জল এনে ছোঁড়াটার মাথায় ঢেলে দে'ত দেখি, জাগে কি না জাগে! এ সব ভিটকিলিমী আমার ঢের ঢের দেখা আছে।"

এই মন্তব্য কানে ঢুকিতেই ধড়মড়িয়া উঠিয়া পড়িয়া সুশীল তৎক্ষণাৎ সেই ঘরের বাহিরে গিয়া দাঁড়াইল। তাহা দেখিয়া তাহার চারি পাশে জমা হওয়া একপাল ছেলেমেয়ে হো হো শব্দে হাসিয়া উঠিল এবং জলের ঘটী হাতে সদ্য প্রবিষ্টা বিমলা এই আকস্মিক রসভঙ্গে সকোপ তীক্ষ্ণ স্বরে কহিয়া উঠিল, "মা যে অত চেঁচিয়ে মরছিল, নিশ্চয়ই তুমি তা হ'লে 'বল্লা' ক'রে প'ড়ে ছিলে? 'ঝুটো'কে আমার জল তোলালে? ভারি বদ মানুষ তো তুমি দেখতে পাই।"

সুশীল প্রথমে বিরক্তি ভ্রূকুটি করিল, পরে স্মিতমুখে এই অপবাদকেও শিরোধার্য্য করিয়া লইল।

কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা বিপদে পড়িল সে রাঁধিতে বসিয়া। প্রথমে তাহার মনে হইয়াছিল, রান্না আর এমন শক্ত কায কি? যখন অবস্থা এই রকমই ঘটিল, তখন আর কি করা যাইবে? দু'দিন রাঁধিয়া দু' টাকা পাইলে তাহার বাড়ী ফিরিবার একটু সুবিধা হইবে ত। কিন্তু কাযটাকে বাহিরে থাকিয়া যতটা সহজ দেখায়, কার্য্যক্ষেত্রে পৌছিয়া দেখা গেল সেটা আদৌ সে রকমই নহে। সব্বের চাইতে অসুবিধা ঘটিল ভাত-রাঁধা লইয়া। ভাত সিদ্ধ করিতে কি আন্দাজ জল ঢালিতে হয়, সুশীলের সে বিষয়ে কোনই অভিজ্ঞতা নাই। সিদ্ধ হইল কি না, বুঝিবারই বা উপায় কোথায়? তাহার পর ফেন গড়ান? সে যে এক বিষম বিপদ! অশেষ চেষ্টার পর সে যখন পাকপিণ্ডবৎ-ভাতের হাঁড়িটা জ্বলন্ত চুল্লী হইতে কোনমতে ভূমে নামাইল, তখন পোড়াভাতের গন্ধে পাড়া মাতিয়া উঠিয়াছে এবং হাঁড়ি উল্টাইবার বৃথা শ্রম তাহার যে উপায়ে বাঁচিয়া গেল, তাহার ফলে তাহাকে চির-অনভ্যস্ত এতই কঠিন কথা শুনিতে হইল যে, ধৈর্য্য রাখা যেন তাহার পক্ষেও দায় হইয়া উঠিল। সেই চৌচির হওয়া ভাতের হাঁড়ি, গরম ফেনের স্রোত এবং পোড়াভাতের দুর্গন্ধের মধ্যে হেঁটমুখে লজ্জাক্ষুব্ধ চিত্তে বসিয়া সুশীল তাহার নূতন অবস্থার সকল কৌতুক-প্রলোভন হইতে মনকে মুক্ত করিয়া লইল। না, নিশ্চয়ই তাহাকে উপায়ান্তর খুঁজিতে হইবে!

ষ্টেশন মাষ্টার ষ্টেশনে নিজের নির্দ্দিষ্ট কার্য্যে নিমগ্ন ছিলেন, সুশীল গিয়া নিঃশব্দে পাশে দাঁড়াইল।

"কিরে? রান্না শেষ হয়েছে? খেতে ডাক্‌তে এলি না কি?" বলিয়া কৌতুকস্মিতমুখে ভদ্রলোকটি মুখ তুলিয়া চাহিলেন।

সুশীল বিষণ্ণ হাসি হাসিল। ক্ষুণ্ণ স্বরে বলিল, "আজ্ঞে, মাপ করবেন, রান্না আমি করতে পারলেম না।"

"অ্যাঁ। পারলি নে? কেন রে?—কেন? ওরা দেখিয়ে শুনিয়ে দেয়নি বুঝি? দুটো দিন দেখে নিজেই খাসা শিখে নিবি। বকুনি খেয়ে পালিয়ে এসেছিস্ বুঝি? তা দেখ্, আমার বাড়ীর ভিতরের ওরা একটু বকতে ভালবাসে, তা বকলেই বা? বকুনি খেলেত আর কারু গায়ে ফোস্কা পড়ে না।—কি বলিস্? এই দেখনা কেন, আমাকেই ত সে কত বকে। আমি চুপটি ক'রে শুনে যাই, কথাটি কই নে'। কি আর করবে? বকে বকে মুখ ব্যথা হয়ে গেলে নিজেই তখন থামে। তুইও ঠিক তাই করবি। বুঝলি? আয়, আমি দেখে আস্ছি, কি হয়েছে। আয়, আমার সঙ্গে আয়।"

সুশীলের আশ্রয়হীন চিত্ত এই সরল নিরীহ লোকটির প্রতি আকর্ষণ বোধ করিল। সে তাহার পক্ষে সে বাড়ীতে ফিরিয়া যাওয়া নিরাপদ নহে বুঝিয়াও তাই আর 'না' বলিতে পারিল না।

বাড়ী ফিরিয়া মনিব ভৃত্যের সৎকারটা যে কিরূপ সাদরে ও সাড়ম্বরে হইল, তাহা অনুমেয় মাত্র।

প্রভাতে নিদ্রোত্থিত হইয়া সুশীলের মনটা আজ প্রথমেই নিরানন্দে ভরিয়া উঠিল। আবার সারাদিন সেই হীনতার ছদ্মবেশে হীনাভিনয় করিয়া তাহাকে কাটাইতে হইবে! নিজের প্রতি ইহাতে একান্ত বিরক্ত ধরিল। একবার মনে হইল, দূর হউক, বাড়ীতে টেলিগ্রামে টাকা পাঠাইবার জন্য আর্জেন্ট তার দিই। আবার মনটা কেমন গুটাইয়া আসিল। বাড়ীতে এতক্ষণ তাহার সম্বন্ধে যে কি কথাই না রটিয়াছে, কি সংবাদই না পৌঁছিয়াছে, তাহারই বা স্থিরতা কোথায়? সে সব খবর সঠিক না জানিয়াই সে তুচ্ছ কয়টা টাকার জন্য সহসা সেখানে

হাত পাতিতে যাইবে না। যদি অমুকূল তাহার বাপকে সেই তাহার হেয় চক্রান্তের হীনতম কথা সত্য সত্যই লিখিয়া থাকে ? ওঃ ভগবান্! সে তাহা হইলে তাঁহাকে আর মুখ দেখাইবে কেমন করিয়া ? আর এ কথা শুনিবার পরে তিনিই কি বাঁচিয়া থাকিতে পারিবেন ?

সুশীলের বুকের মধ্যে দারুণ অশান্তি তুমুল হইয়া উঠিতে লাগিল। যদি পিতা সে সব কথা বিশ্বাস করিয়া লয়েন ? যদি তিনি সুশীলকে দোষী মনে করেন ? যদি তাহাকে আর কখন ক্ষমা না করেন ? তবে সেই বা বাঁচিবে কিরূপে ? পিতা যে তাহার চিরজীবনের একমাত্র অবলম্বন ও আদর্শ। পিতা যে তাহার শুধু পিতা নহেন, একাধারে পিতামাতা দুই-ই। যদি এত বড় কঠিন আঘাতে সেই অগাধ পিতৃ-স্নেহ তাহার বিপর্যাস্ত হইয়া উঠে ? সুশীল সে ক্ষতি ত সহিতে পারিবে না। বাড়ী ফিরিতে ভয় ও সঙ্কোচের সহিত ফিরিবার আগ্রহও তাহার যেন সীমা-হারা হইয়া উঠিতে লাগিল। অথচ ফিরিবারই বা উপায় কোথায় ? ফিরিবেই বা সে কেমন করিয়া ?

এই আশঙ্কা-উদ্বেলিত, দুশ্চিন্তা পীড়িত, উত্তেজিত শরীর-মন লইয়া কোনমতে দুইটা দিন কাটাইয়া তৃতীয় দিবসাবসানে শরীর-মন দুই-ই সুশীলের যেন তাহার নিজের বিরুদ্ধেই বিষম বিদ্রোহ করিয়া বসিল। এই অনভ্যস্ত অক্ষম দাসত্বের বন্ধন তাহার যেন অসহনীয় বলিয়া মনে হইল এবং তাহার সঙ্গে মনে পড়িল যে, এই ক্ষুদ্র কার্য্যের ক্ষুদ্র বেতনের উপর নির্ভর করিয়া দিনাতিপাত করিতে গেলে তাহার পক্ষে কত দিনই যে এই দুরবস্থা ভোগ অনিবার্য্য হইবে, তাহাওতো বলা যায় না। মনটা যেন বিষাদে ভরিয়া উঠিল। প্রথমতঃ সে একটু কৌতুকবোধও এই চাকরীস্বীকারের মধ্যে অনুভব করিতেছিল; কিন্তু সেটুকু দিনে দিনেই নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। আজ আর কোনমতেই তাহার

গৃহাভিমুখী চিত্তকে সে ঠেকাইয়া রাখিতে সমর্থ হইল না। একবার মরিয়া হইয়া মনে করিল, বিনা টিকিটেই না হয় চলিয়া যাই—কিন্তু অন্যায় কার্য্যের অনভ্যস্ততায় বিবেক ইহাতে কিছুতেই সায় দিতে পারিল না।

বিমলা আসিয়া তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলিল —এই পাগ্‌লা। হাঁ ক'রে ব'সে বসে ধ্যান কর্‌ছিস্ কি? রান্না কখন চড়বে শুনি? তোর মত সবারই ত আর হাওয়া খেয়ে খেয়ে পেট ভরবে না? ভাল এক খ্যাপা এসে জুটেছে বাপু!"

সুনীল অবাক্ হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। সবিস্ময়ে সে মনে মনে কহিল—"এই সব মেয়ে ভদ্রসংসারেরই, পড়িবেও কোন ভদ্রঘরে; কিন্তু ইহাদের কোনরূপ শিক্ষা সহবতের কোন জ্ঞানই নাই!—ইহার তুলনায় নীলিমা কত ভাল। অথচ ইহার বাপ তাহার বাপের চাইতে অনেক ভদ্র।"

তখন তাহার মনে পড়িয়া গেল স্বর্ণলতাকে। আহা, নিরীহ বেচারা! সুনীলের বুকটা ব্যথায় টন টন করিয়া উঠিল। কত মহৎ মন তাঁহার। নীলিমা মায়ের সেই মহত্বের অংশ কি না পাইতে পারে! নীলিমার মহত্বের কথায় নিজের অনুদারতা স্মরণে মনটা অশান্তিতে ভরিয়া উঠিল।

সুনীলকে নিরুত্তর দেখিয়া বিমলা বিষম রাগিয়া গেল। ক্রুদ্ধ তর্জ্জনে মুখ খিঁচাইয়া বলিল, "বলি, কানে কথা যাচ্ছে?—শীগ্‌গির ওঠ্ বল্‌ছি। না হ'লে ছিশ্‌টা মেরে তুলবো।"

সুনীল ক্ষুণ্ণ স্বরে জবাব দিল,—"আজ আমার ভাল লাগ্‌ছে না, আজ আর আমি রাঁধবো না।"

বিমলার মুখ ক্রোধে পরুষ হইয়া উঠিল, "কি আব্দার গো!—ম'রে

যাই আর কি! রাঁধবেন না!—ওঁর ভাল লাগ্‌ছে না! লাট সাহেব এয়েছেন!—আস্পদ্ধা ত বড় কম নয়!—মা! ও মা! শুন্‌তে পাচ্ছো—তোমার আদুরে-গোপাল আজ রাঁধতে পারবেন না, তাঁর মন ভাল নেই।"

গৃহান্তর হইতে গৃহিণীর ক্রোধ-গম্ভীর কণ্ঠের সাড়া আসিল,—"যাচ্ছি কি না চ্যালা কাঠ নিয়ে, মন ভাল ক'রে দিয়ে আস্‌ছি। হতচ্ছাড়া ছোঁড়ার সকলই বায়নাক্কা।"

রাত্রি ৯টার মধ্যেই এ বাড়ীর রান্না খাওয়া চুকিয়া যায়। ডাউন প্যাসেঞ্জার প্রায় মধ্য রাত্রে এখানকার ষ্টেশন ছাড়ে। আহার সমাধা করিয়া আসিয়া ষ্টেশন-মাষ্টার নিদ্রাবিজড়িত নেত্রে টেবলের সাম্‌নে বসিয়া ঢুলিতেছিলেন ও মধ্যে মধ্যে সম্মুখস্থ ঘটিকা যন্ত্রের প্রতি চকিত কটাক্ষ স্বতঃই পতিত হইতেছিল। সুশীল আসিয়া বিজড়িতভাবে এক পাশে দাঁড়াইল।

"কি রে? এত রাত্রে কি কর্‌তে এলি?"—বলিয়া নন্দ বাবু সস্নেহ-কণ্ঠে তাহাকে সম্বোধন করিলেন। তাহার বিষণ্ণ মুখের দিকে চাহিতেই মনটা যেন তাঁহার করুণামথিত হইয়া গেল। এই নিরাশ্রয় তরুণ ও সুন্দর ছেলেটিকে আশ্রয় দিয়া তাহাকে যে তিনি একান্ত পীড়িত করিয়া তুলিয়াছেন, তাহা তাঁহার বিশেষ অজ্ঞাত ছিল না। আজ যে একটা বড় রকম ঝাপ্‌টা ইহার উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে, ইহাও তাঁহাকে জানিতে হইয়াছিল। কারণ, তিনিই ত গৃহিণীর উপর শত্রুতা সাধনের বদ মতলবেই এটাকে জুটাইয়াছেন।

সুশীল আজ সকল দ্বিধাকে পরাস্ত করিয়া স্থিরসঙ্কল্প লইয়া আসিয়াছিল। সঙ্কোচে কণ্ঠ তাহার রোধ করিতে চাহিলেও সেই নিষেধাজ্ঞা ঠেলিয়া ফেলিয়া এক নিশ্বাসেই বলিয়া ফেলিল,—"আমার

আপনি যা দেখছেন, আমি ঠিক তা নই।—আমার নাম সুশীলকুমার রায়, আমার বাপ শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন রায় অবস্থাপন্ন লোক, দৈববিড়ম্বনায় আমায় এ রকম বিপন্ন হ'তে হয়েছে আপনি যদি আমায় ৭টি টাকা কর্জ্জ দেন,—আমি বাড়ী ফিরে যাই। সেখানে পৌঁছেই আপনার টাকা আমি ফিরিয়ে দেবো।

নন্দ বাবু বিস্মিতনেত্রে সুশীলের গভীরভাবে উত্তেজিত মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন। তাহার কণ্ঠে অপগুনীয় যে সত্যের সুর ঝঙ্কার দিয়াছিল, তাহার মুখ-চোখের উৎকণ্ঠিত আগ্রহের মধ্য হইতে সহস্র সত্যের যে অমিশ্র রূপ ফুটিয়া উঠিতেছিল, তাহাকে নিতান্ত অন্ধ ব্যতীত আর কেহই যে অবিশ্বাস করিতে অপারগ।

উত্তেজনারক্তমুখে আগ্রহব্যাকুলকণ্ঠে সুশীল পুনশ্চ কহিল, "পারবেন কি বিশ্বাস করতে? আমি ইঞ্জিনীয়ারী পড়তুম, রান্নার আমি কি জানি? এক মাস আপনার বাড়ী রাঁধতে পারলেও হয় ত ঐ সাত টাকা আমার হবে না, আর আমি তা পারবোও না, অত দেরী করাও আমার পক্ষে সম্ভব নয়। বাবাকে এ সব কথা জানাতে ইচ্ছা করি না, না হলে—"

সুশীলের কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল। উদ্বেলিত লজ্জা অভিমানটাকে দমন চেষ্টায় সে এইবার বিশেষ ভাবেই মনোযোগী হইয়া পড়িল।

নন্দ বাবু একটি কথাও না বলিয়া বাক্স খুলিয়া এক টাকার করিয়া সাত খানি নোট গণিয়া লইয়া তাহার হাতে দিলেন।

ঢং ঢং ঢং ট্রেণ ছাড়িবার ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। ষ্টেশন-মাষ্টার সুশীলের হাতে টিকিটখানা দিয়া বলিলেন, "আমার বাড়ী অনেক দুঃখই তুমি পেয়েছ, সে সব ভুলে যেও।"

সুশীল সাশ্রুনেত্রে তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিয়া অশ্রুগাঢ় স্বরে

কহিল, "আমায় আপনি ভুলবেন না। যদি কখন সুযোগ পাই, আবার একবার আপনার কাছে আমি আসবো।"

নন্দ বাবু স্নেহ-করুণ নেত্রে চাহিয়া রহিলেন। হুইশেল দিয়া ট্রেণ ছাড়িয়া দিল এবং দেখিতে দেখিতে নৈশ অন্ধকাররাশির মধ্যে সেই দু'দিনের রহস্যময় অপরিচিতকে তাঁহার নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া অদৃশ্য হইয়া গেল।

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

কলিকাতা মহানগরীর এক সুপ্রশস্ত রাজপথের উপর উদ্যানমধ্যবর্ত্তী প্রাসাদোপম অট্টালিকার একটি যত্ন-সজ্জিত প্রশস্ত কক্ষে বসিয়া দুইটী সুন্দরী তরুণী মিলিয়া কথোপকথন করিতেছিল। মুক্ত জানালার উপর ঝালরদার পর্দ্দা আঁটা, দরজার উপর মোটা কাপড়ের পর্দ্দা ফেলা, ঘরের মার্ব্বেলের মেজে পুরু গালিচায় মণ্ডিত, আশপাশে টেবল চেয়ার কৌচ, ইহার একপাশে একখানা বড় সোফার উপরে বসিয়া বিনতা ও সুলেখা।

সুলেখা এখন আর সেই ক্ষুদ্রাকৃতি বালিকাটি নাই। সে এখন বর্ষাবারিপরিপূর্ণা স্রোতস্বিনীর মতই অভিনব শ্রীধারণ করিয়াছে। গোমুখী-নিঃসৃত স্বচ্ছ নির্ঝরধারাটুকু এখন যমুনাসঙ্গমের জাহ্নবীরূপিণী, সেই হিম-গৌরতপ্তকাঞ্চনবর্ণ এখন যেন বয়সের উজ্জ্বলতায় উজ্জ্বলতর ও আভাযুক্ত হইয়াছিল। সর্ব্বাঙ্গের পূর্ণতা ও মসৃণতা যেন তাহাকে নিপুণ হস্তের রচনা করা দেবী প্রতিমার মতই অপরূপ করিয়া তুলিয়াছিল। চিরচঞ্চল হরিণীনেত্র যেন আজ ঈষৎ সরমসঙ্কোচে নত হইয়া আসিতে শিক্ষা করিয়াছে, গণ্ডেও তাহার এখন মধ্যে মধ্যে লজ্জার লালিমা গোলাপের বর্ণকে গাঢ়তর করে।

দুই জনে কথা হইতেছিল। বিনতা বলিতেছিল, "তুই বুঝতে পারবি কেন? নিজে রূপের ডালি সাজিয়ে ব'সে আছিস্ কি না, রূপতৃষ্ণা কি জিনিষ, তা ত কখন জানলি না। আমি নিজে কালো মানুষ, আমার নিজেকে নিয়ে ত কোন দিনই আশ মেটেনি তাই আমি অপরকে নিয়ে

সেইটে মেটাতে চাই, তুই নিজের রূপেই নিজে মস্‌গুল হয়ে থাকবি, তোর কি ?"

সুলেখা লজ্জাস্মিত মুখে উত্তর করিল, "তাই নাকি হয় ? নিজে কালো কি ভাল, তা বুঝি আবার দেখা যায় ? না ভাই ! তা ব'লে তোমার ও কথাটা ঠিক নয়। রূপে মন মুগ্ধ হয় বটে, কিন্তু সেটা কখনই স্থায়ী হ'তে প্যারে না, এক দিন না এক দিন মানুষের মন থেকে রূপের মোহ কেটে যায়ই যায়। কিন্তু গুণের আদর চিরস্থায়ী।"

বিনতা সন্দেহ-স্মিত মুখে একটু অনুযোগের সুরে কহিল, "তবে কি তুই বল্‌তে চাস্‌. তোর হবু-নন্দাইয়ের কোন গুণই নেই ? সেটি মাকালফল ?"

সুলেখা অপ্রতিভের একশেষ হইয়া রঞ্জিত হইয়া উঠিল, মনের মধ্যে এই অনুযোগটাকে সে অস্বীকার করিতে না পারিলেও প্রকাশ্যে আবার উহাকে স্বীকার করাও চলিল না, তাই ঘাড় হেঁট করিয়া ঈষৎ নম্র মধুর হাস্যের সহিত সে কেবলমাত্র কহিল. "তাই কি আমি বল্‌ছি ?"

বিনতা আবেগের সহিত কহিল, "বলছিস্‌ বৈ কি, তা শুধুই কি তুই ? সব্বাই ত এই কথাই বল্‌ছে, বাবার মন ত খুবই খারাপ হয়ে রয়েছে,—সেও আমি বেশ টের পাচ্ছি। দিদি ত আমার সঙ্গে বাক্যালাপই ছেড়েছে। জামাইবাবু এ বিয়েয় ত আসবেনই না, কারণ তাঁর ভাইকে অপমান করা হয়েছে,—দাদার যে কি মতলব, তা সেই বল্‌তে পারে। এ দিকে ত দেখি দুই জনে হরিহর-আত্মা ! কিন্তু গরীবকে বন্ধু বল্লেও নিজের ভগ্নীপতি বল্‌তে হয়তো তাঁরও বেশ শ্রদ্ধা হচ্চে না।—আচ্ছা, কেন বল্‌ত ভাই, গরীব ব'লে বুঝি বেচারার বড়লোকের মেয়েকে ভালবাসতেও অধিকার নেই ? আমি কালো, আমায় যে ওর ভাল লেগেছে, সেই ত ওর কতখানি উদারতা।"

সুলেখা বিস্মিত নেত্রে বিনতার ভাব-গম্ভীর মুখের পানে চাহিয়া

রহিল। তাহা দেখিয়া বিনতা ঈষৎ অপ্রতিভভাবে প্রসঙ্গান্তর আনিয়া ফেলিল।

"অচ্ছা ভাই সু! তোরও ত দাদার সঙ্গে কত দিন থেকে বিয়ের কথা হয়ে রয়েছে, দাদাকে তোর খুব দেখতে ইচ্ছে করে? দেখতে ভাল লাগে? বিয়ের দেরী হচ্চে ব'লে মনটা বিরক্ত হয় ত? আচ্ছা ভাই, ঠিক ক'রে বল।"

সুলেখার গালদুটি ডালিমফুলের মত লাল হইয়া উঠিল। চঞ্চল হইয়া সে নিজের অঞ্চল হইতে রেশমী সূত্র টানিয়া ছিঁড়িতে লাগিল। কোন কথারই কিন্তু সে একটুও প্রতিবাদ করিল না। ইহা দেখিয়া বিনতা সকৌতুকে উচ্চহাস্য করিল।

বাহিরের দিকে একটা গোলমাল শুনা গেল। অল্পক্ষণ পরে নিতাই চাকরটা উচ্চকণ্ঠে কাহাকে ডাকিয়া বলিতেছে শুনা গেল—"ওরে পিসীমাকে ব'লে আয়, ছোটবাবু এয়েছেন।"

বিনতা ও সুলেখা একসঙ্গে দুই জনেই এ সংবাদে চঞ্চল হইয়া উঠিল। সুলেখার পদনখ হইতে উত্থিত হইয়া মাথার কেশমূল পর্য্যন্ত একটা পুলকের হিল্লোল প্রবাহিত হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে লজ্জার রক্তিমায় তাহার হিমশুভ্র ললাট ও কম্বু কণ্ঠাবধি আরক্তিম হইয়া উঠিল। বিনতা তাহার ফুলা ঠোঁট একটুখানি বাঁকাইয়া সাভিমান মন্তব্য প্রকাশ করিল, "ঘরের ছেলে ঘরে এলেন তা হ'লে, আমি বলি, নীলিমা বুঝি তাঁকে ভুলিয়েই বা নিলে!"

সুলেখার কানে বা এ ব্যঙ্গোক্তিটা বড় ভাল লাগিল না। সে ব্যক্তিটি কে? এই প্রশ্ন তাহার মনে জাগিলেও, কিন্তু ইহাকে প্রকাশ করিতে তাহার প্রয়াস জন্মিল না; একটু লজ্জা বোধ হইল।

সুশীলকে দেখিয়া দ্বারবান্, সরকারমহাশয় ও নিতাই খানসামা

যতটা বিস্মিত হইয়াছিল, ঠিক ততখানিই সে তাহার ঘরের লোকেদের দান করিতে ইচ্ছুক হইল না। তাড়াতাড়ি স্নানের ঘরে ঢুকিয়া পড়িয়া সে নিতাইয়ের সাহায্যে স্নানাদি সারিয়া তাহার স্বাভাবিক বেশে যখন পিসীমার ও তাহার পরই ভুবনবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেল তখন তাহাকে কিছু রোগা দেখাইলেও তাহার উপর দিয়া কত বড় ঝড় যে বহিয়া গিয়াছে, তাহার কোন বিশেষ চিহ্ন প্রকটিত ছিল না। পিসীমা তাহার গায়ে মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে মনে মনে কৃপণ বুড়ার আদ্যশ্রাদ্ধের ব্যবস্থা করিলেন। মুখে বিশেষ কিছু বলিবার প্রবৃত্তি হইল না; কারণ সেই সন্ধ্যবেশে কৃপণটার জ্বালা তাঁহার সংসারে যে ভাবে পতিত হইয়াছে, তাহার কাছে এটুকু ত সামান্যই।

সুশীল এ বিবাহের সংবাদ স্তম্ভিত হইল। এ কি দৈববিড়ম্বনা, না প্রকৃতির প্রতিশোধ? যে দুর্দ্দশার হাত হইতে আত্মরক্ষা করিয়া সে ফিরিল, সেই অবস্থায় পতিত হইল তাহারই বোন্ বিনতা!

বিনতাকে অনুকূলের পুত্রবধূ হইতে হইবে, মনে করিতেই সুশীলের মনটা বিরক্তিতে একেবারে বিতৃষ্ণ হইয়া উঠিল। না, এ কখন হইতেই পারে না। বিনতা সে ঘরের সহিত সম্পর্কিত হইলে, তাহাদের সংস্রব রাখা অনিবার্য্য হইবে। তাহা সম্ভবে না। এ বিবাহ এখনই বন্ধ করিতে হইবে।

তাহার পর শুভেন্দুর কথা মনে করিতে গিয়া সুশীলের মনে পড়িল যে, সেই বা কোন্ ভরসায় তাহাদের সেই মলিন সংসারের সংস্রবে তাহার বোন্‌কে টানিতে চাহিতেছে! তাহার পর এ কথা মনে করার জন্য তাহার মনে মনে হাসিই পাইল। অনুকূলচন্দ্রের পুত্রই ত সে—তাহার পক্ষে আর বিনতাকে বিবাহ করিতে চাওয়া এমনই কি দুঃসাহস?

কতকটা সরোজিনীর অনুরোধে, কতকটা স্বেচ্ছায় সে একবার বিনতার সহিত শেষ চেষ্টায় আসিতে সম্মত হইল।

"বিনু!"—বলিয়া ঘরে ঢুকিতেই সুশীলের সর্ব্বপ্রথম দৃষ্টি পড়িল সুলেখার জবাকুসুম সদৃশ আরক্তাভ মুখের উপর। চকিত বিস্ময়ের একটা বিপুল আনন্দ তাহার শিরায় শিরায় বহিয়া গেল। সুলেখাকে এখানে অতর্কিত দেখিয়া তাহার সারাপ্রাণ যেন আশ্বাসে ও পরিতৃপ্তিতে ভরিয়া উঠিল। তাহার মনে হইল, সে যেন নিজেরও অজ্ঞাতে ভিতরে ভিতরে ইহাকেই খুঁজিতেছিল। নিজের মনকে সামলাইয়া লইবার জন্য আজ ইহাকে তাহার একান্ত প্রয়োজন ঘটিয়াছে, তাহা সে জানিতে পারিয়া মনের মধ্যে একটা অস্বস্তি অনুভব করিতেছিল। তাই তাহার প্রার্থিতাকে নিকটে দেখিয়া তাহার সুখের সীমা রহিল না। এ ভিন্ন নীলিমার চিন্তার হাত হইতে মুক্তি পাওয়া কঠিন হইয়া উঠিতেছিল।

"কি গো দাদা! বড়ী ফিরলে যে? নীলিমা যে বড় ছেড়ে দিলে? আমরা বলি, একেবারে গাঁটছড়া বেঁধেই বা বুঝি আস্‌ছ!"

বিনতার এই সহজ বিদ্রূপে সুশীল যেমনই ভীষণভাবে চমকিত, তেমনই রাঙ্গিত হইয়া উঠিল। তাহার বুকের মধ্যে অপরাধের লজ্জা রক্ত স্রোতে তোলপাড় করিতে লাগিল। তাহার মনে হইল, তা হ'লে হয় ত অনুকূল বাবাকে চিঠি লিখিয়াছে। তিনি কিছু বলিলেন না বটে, কিন্তু তিনি ত কখনই কিছু বলেন না। সহসা অপরিসীম মানসিক লজ্জায় সে সুলেখার দিকে পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইল। সুলেখাও কি সে সব কথা জানে?

বিনতা সুশীলের বিজড়িত অবস্থা দেখিয়া কৌতুকে হাসিয়া উঠিল, "খোকাছেলের বুঝি রাগ হয়ে গেল? হ্যাঁ, রাগ শুধু উনিই করতে জানেন, আমি ত আর জানি নে! এত দেরী ক'রে আসা হলো কেন বল ত? সুলি শুদ্ধ তোমার পথ চেয়ে ব'সে রয়েছে—বাবুর আর সেই

'কিপটে বামুনের' ভাতের মায়া কাটে না—সাধ ক'রে কি আর বল্‌তে হয় যে, নীলিমা সেখানে তোমায় 'তুক' করেছে।"

সুশীলের সর্ব্বাঙ্গ হইতে একটা দারুণ লজ্জার খোলস খসিয়া পড়িল। সে নিশ্চিন্ত স্মিতমুখে মুখ ফিরাইয়া হাসিয়া বলিল—"কে' কাকে কি করেছে—সে তো বাড়ী এসেই দেখতে পাচ্ছি!"—বলিয়া সুলেখার সহিত দৃষ্টি মিলিত হইতেই সলজ্জ স্মিতমুখে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—

"ভাল আছ সুলেখা?"

রঞ্জিতমুখী সুলেখা ঘাড় নাড়িয়া এ প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিল। বিনতা বলিল—"ভাল এত দিন ছিল না, আজ এই এখনই ভাল হলো। পোড়ারমুখী ক'দিন ধ'রে কেবল কান পেতে পেতে মোটরের শব্দই শুনেছে। বিশ্বের আর কোন শব্দই ক'দিন ওর কানে গিয়ে পৌছায় নি।"

সুলেখা বিনতার বাহুমূলে একটা কঠিন চিম্‌টী কাটিয়া চাপা তর্জ্জনে উহাকে শাসন করিল—"খবরদার!"

সুশীলের ভাবাক্রান্ত চিত্ত ক্রমেই লঘুতর হইয়া আসিতেছিল। সুলেখা।—তাহার সুলেখা!—তাহার অন্তবাসনের চির-প্রতিষ্ঠিত দেবী—তাহার সঙ্গে কাহারও প্রতিদ্বন্দ্বিতা সম্ভবে না।—এত রূপ—এত গুণ—এত স্নেহ, আর এই দীর্ঘ প্রতীক্ষা! এত দিন বিবাহের কথা চলিলেও সুশীল কোন দিনই ইহাকে বিভিন্ন দৃষ্টিতে দেখে নাই। সেই বাল্যে পরিচিতা, ইদানীং কদাচিৎ দৃষ্টা, নিকট-আত্মীয়া হিসাবেই সে এই সুন্দরী মেয়েটির কথা স্মরণে রাখিয়াছে। এই ঘটনাতেই সর্ব্বপ্রথম সে তাহাকে তাহার মানসী-প্রেয়সীরূপে কল্পনা করিয়া, মনে মনে বিপুল নির্ভরে তাহাকে নিজের অত্যন্ত নিকটবর্ত্তী করিয়া লইয়াছিল। আবার আজই সে তাহাকে নিজ চিত্তের দুর্ব্বলতার—চঞ্চলতার রক্ষাকবচ বলিয়া একান্ত বিশ্বাসে আঁকড়িয়া ধরিতে চাহিল। তাহার মনে হইল,

আগামী পরশু বিনতার পরিবর্ত্তে যদি তাহারই বিবাহটা প্রথম হইয়া যাইত!

বিবাহের ইচ্ছা মনে জাগিতেই অনিবার্য্যরূপে সঙ্গে সঙ্গেই স্মরণে আসিল নীলিমা। সেই নির্জ্জন পথপ্রান্তে অবিরল বৃষ্টিধারামধ্যে পরিত্যক্তা নীলিমার অশ্রুপ্লাবিত দীনমূর্ত্তি! সুশীল ক্লিষ্ট চিত্তে সুলেখার দিকে পাশ করিয়া দাঁড়াইল।

"কি গো দাদা! দাড়িয়ে রইলে যে, বস্‌লে না? না—হার হাইনেসের হুকুম না পেলে বস্‌তে পারছো না? ইওর হাইনেস! দাদা বেচারীকে কৃপা ক'রে একটু খানি বসবার অনুমতি দিয়ে দেন।"

"যাঃ, আমি চ'লে যাচ্ছি"—বলিয়া সুলেখা একট নড়াচড়া করিল, কিন্তু বাস্তবিকই সে চলিয়া গেল না।

সুশীল অপ্রস্তুতভাবে একটা চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিয়া পড়িয়া বলিয়া ফেলিল—"তোর সঙ্গে একটা কথা ছিল।"

এই প্রস্তাব শ্রবণে বিনতার সূক্ষ্ম অধর স-বিরক্তি মৃদু হাস্যে ঈষৎ কুঞ্চিত হইল।—"ব'লে ফেল।"

সুশীল অপাঙ্গে সুলেখার দিকে চাহিতে সুলেখা আপত্তি বুঝিয়া তাড়াতাড়ি উঠিতে যাইতেই বিনতা তাহার হাত চাপিয়া ধরিল, বলিল—"তোকে যেতে হবে কেন? যা কথা হবে, তুইও উপস্থিত থেকে তা' শুনেই যা। কথা যা, সে ত আর নূতন কিছুই নয়, আর গোপনেরও তাতে আমার কিছুই নেই।—দাদা, তুমি এই বলবে ত যে, এ বিয়েয় আমার পক্ষে লজ্জা!—আর তোমাদের পক্ষে অপমান?—কেমন এই ত?"

সুশীল ঠিক এ রকম জেরায় পড়িবে, তাহা ভাবে নাই, তাই কিছু কাল একটু বিপন্নবৎ থাকিয়া পরে নিজেকে কঠিন করিয়া লইল, দৃঢ়স্বরেই কহিল,—"অ্যাঁ—হ্যাঁ! তা তার চাইতে খুব তফাৎও নয়।"

উত্তরটা সুশীলের স্বভাববহির্ভূত হইয়াছিল বলিয়া বিনতা একটু যেন বিস্ময়ানুভব করিল। তাহার পর তাহার একরোখা স্বভাবের বশে উথলিত ক্রোধাভিমানে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়া গম্ভীর পরুষকণ্ঠে "হোক গে যাক্,—তাতেও কিন্তু আমার মত বদল হবার নয়।"—বলিয়াই ক্রোধ-সজল চক্ষুতে তড়িদ্‌বেগে উঠিয়া গেল। তাহার দাদা যে তাহার বন্ধুর বিরুদ্ধে এত বড় মন্তব্য প্রকাশ করিতে পারিবে, এ যেন তাহার ধারণাতেও ছিল না। আর কেহ না করুক, সুশীল আসিয়া তাহাকে যে নিশ্চয়ই সমর্থন করিবে, এ বিশ্বাস তাহার অন্তরে দৃঢ় ও বদ্ধমূল ছিল।

বিনতা অমন করিয়া কান্নাভরা চোখে ও বিদ্ধবক্ষে পলাইয়া গেলে সে আঘাত সুশীলকে বড় কম বাজে নাই। কিন্তু এ কয় দিনের অভিজ্ঞতা তাহাকে এমনই কঠিন করিয়া তুলিয়াছে যে, আজ স্নেহের বোনের ঐ সাভিমান বেদনাটুকুর তাহার কাছে আর তেমন আদর ছিলনা। শুভেন্দুর মধ্যে কত দুর্বলতা, কত অন্যায়ের বীজ নিহিত, আজ সে সব কথা মনে করিয়া তাহার মন কঠিনতর হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার মনে হইতেছিল, জোর করিয়াও এ বিবাহ বন্ধ করা সঙ্গত। পিতার প্রতিও একটু অভিমান হইল। এ কি অসঙ্গত আবদার রক্ষা? তিনি অসম্মত হইলেই ত সব চুকিয়া যাইত।

প্রস্থানোদ্যত সুলেখার চুড়ির ঝনৎকার সুশীলকে সসংজ্ঞ করিয়া তুলিল। ব্যগ্রভাবে চোখ ফিরাইয়া সে অসঙ্কোচে ডাকিল, "লেখা!"

সুলেখা দ্বারপ্রান্তে পৌঁছিয়াছিল, ফিরিয়া দাঁড়াইল।

"এস, ব'সো, তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।"

সুলেখা পূর্ব্বস্থানে আসিয়া বসিল। সুশীলের সঙ্কোচহীন ব্যবহারে সেও তাহার নবজাত সলজ্জ ভাবটা দমন করিয়া লইয়াছিল। স্বভাবে

সে ত কখনই সঙ্কুচিতা নহে। বয়োধর্ম্ম ও মাতৃশিক্ষা মাত্র তাহাকে লজ্জাবরণ পরাইয়া দিতেছিল।

দুই জনে বহুক্ষণ নীরবে বসিয়া থাকার পর সুলেখাই প্রথম কথা কহিল, "কৈ, কি কথা আছে বল্লেন যে? বলচেন না?"

সুশীলের মুখ চিন্তাম্লান। সুলেখাকে যে কথা জানানো তাহার আজ প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হইতেছিল, এবং জানাইবার এমন প্রশস্ত অবসরও আপনা হইতে ঘটিয়া গিয়া সে বিষয়ে তাহাকে প্রলুব্ধ করিয়া তুলিয়াছিল, এখন বলার সময় দেখা গেল, বলিবার পক্ষে তাহাতে যথেষ্ট সঙ্কোচ আছে। নীলিমাঘটিত সকল কথা হয় ত সে তাহার বাগ্দত্তা এই কুমারী মেয়ের কাছে অসঙ্কোচে প্রকাশ করিতে পারিবে না বাস্তবিকই ত আর সে তাহার এখনও স্ত্রী হয় নাই।

সুশীল নিজের ফাঁদে নিজেই জড়াইয়া পড়িয়া বিমূঢ়ভাবে উত্তর দিল, "কি বলা উচিত, ভেবে পাচ্চিনে, লেখা!"—তাহার পর একটুখানি উৎসাহিত ভাবে সহসা প্রশ্ন করিল, "আচ্ছা, লেখা! মনে কর, কেউ আমার খুব নিন্দা করলে—তুমি কি সে কথায় বিশ্বাস করবে?"—এই কথা বলিয়া ফেলিয়াই সুশীল গভীর আগ্রহভরে সুলেখার বিস্ময়াপন্ন মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

সুলেখা ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া ঈষৎ হাসিল। সে মিষ্ট হাসিতে তাহার চকিত হরিণীচঞ্চল কালো চোখের সবটুকু বিস্ময়লেখা ধৌত হইয়া একটি অতি কোমল স্নিগ্ধজ্যোতি বিচ্ছুরিত হইল। স্নিগ্ধ মধুর কণ্ঠে জবাব দিল, "শুধু পেয়ারা-চুরি ছাড়া আর কিছু বিশ্বাস করিনা," বলিয়াই সে মুখে সলজ্জভাবে আঁচল চাপিয়া দিল।

তখন সুশীলও মুক্তকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল। হাসিতে হাসিতে যোড়হাত করিয়া বলিল, "ভুলে গেছলেম, সত্যিই ত, ও বিষয়ে যে আপনি আমার

'আই উইটনেস্।' ও কুকীর্ত্তিটা আর আমার এ জন্মে চাপা দেবার কোন উপায়ই নেই। কিন্তু দোহাই আপনার,—ধর্ম্মাবতার। পেয়ারা চুরি করে ছিলুম বলেই—'যা কিছু হারাবে, কেষ্টা বেটাই চোর'—এ সিদ্ধান্ত স্থির ক'রে রাখবেন না যেন।"

দুই জনেই অনেকখানি হাসি হাসিল, কিন্তু সেই হাসির শেষদিকে দুই জনেরই মন দুই রকমে ঈষৎ গম্ভীর হইয়া আসিল। সুলেখার হঠাৎ মনে হইল, যাহার সহিত তাহার আজও বিবাহ হয় নাই, তাহার মুখ হইতে এ ধরণের কথাবার্ত্তা বেশীক্ষণ তাহার শুনা সঙ্গত নহে। আর সুশীলের স্মরণপথে অতর্কিতে সহসা ভাসিয়া আসিল—নীলিমা। তাহার সঙ্গেও কতদিন এমনই কোন হাসির কথায় এমনই হাসিই সে হাসিয়াছে। আজ সে কোথায়! এই ক্লেশক্লিষ্ট আলোচনাকে সে নিজের মনে স্থান দিতে ব্যথা পায়, ভীত হয়, তাই ইহাদের সে সযত্নে পরিহার করিয়াই চলিতে চাহে, অথচ ইহারাও যে সময় নাই, অসময় নাই একটা ভৌতিক ব্যাপারের ছায়ার মত তাহার চিত্তকে সদাসর্বদা অনুসরণ করিতেও তো ছাড়ে না এবং সুযোগ পাইলেই মহা উপদ্রবও উপস্থিত করে। এখন এই প্রিয়সমাগমের মধ্যে একে প্রশ্রয় দিতে কোন মতেই মন সায় দিল না। তাই মনটাকে সহজ করিয়া লইবার জন্য তাড়াতাড়ি একটা কিছু সে বলিয়া উঠিতে গেল। যেটা প্রথম মুখে আসিল, তাহাই বলিল।

"লেখা! লেখা! আমার তোমাকে বড্ড দরকার হয়েছে - ভারী দরকার। তুমি আমার কাছে থাকলে আমি জগতের সমস্ত বিপদকে— সব প্রলোভনকেই ঠেলে ফেলে দিতে পারি। আমার জীবনে তুমি ধ্রুবতারা হয়ে থেকো, আমায় রক্ষা করো! করবে ত?"

সুলেখা বিস্ময়ে চমকিয়া উঠিল। এ কি কাতর স্বর, এ কি ক্লিষ্ট

মুখ! সে চকিতে উঠিয়া সুশীলের কাছে আসিল। মমতা-মাখা তরল কণ্ঠে কহিয়া উঠিল, "আমার মনে হচ্চে, আপনার কোন বিপদ ঘটেচে, আমায় বলুন, আমার যথাসাধ্য আমি সাহায্য করতে কুণ্ঠিত হব না।"

সুশীলের আর্ত্তচিত্তে সহানুভূতির এই প্রলেপ যেন তাহার সকল জ্বালা জুড়াইয়া দিল। এই অপার স্নেহসমুদ্রের শীতল জলে ডুবিয়া যাইতে তাহার সারা মনপ্রাণ যেন আগ্রহে ব্যাকুল হইয়া হাত বাড়াইল। তাহার মনে হইল, যদি সুলেখা আজ তাহার—সম্পূর্ণভাবে তাহার হইয়া যাইতে পারিত, তবে তাহার অপেক্ষা ভাল আর তাহার পক্ষে কোন কিছুই হইতে পারিত না। ঐ করুণারূপিণীর বুকের মধ্যে মাথা রাখিয়া সে তাহার জীবনের এই জটিল রহস্যের কথা তাহাকে জানাইতে পারিলে আজ বাঁচিয়া যায়, কিন্তু কাছে থাকিয়া যে ঐ সুদূর-বর্ত্তিনী, তাহার কাছে মন খুলিতে চাহিলেও মুখ যে লজ্জার বাধা কিছুতেই কাটাইতে চাহেনা।

তখন নিজেকে অনেকখানি সংযত করিয়া লইয়া ম্লানমুখে কহিল, "বিপদ আমার আছে, সময় এলে তোমায় তা আমি জানাবো, তখন এম্নি ক'রে আমায় তোমার রক্ষাবাহু বাড়িয়ে দিও। এখন এই তোমায় অনুরোধ যে, এর মধ্যে যদি কিছু আমার সম্বন্ধে শোন, আমায় না জানিয়ে তুমি তা' বিশ্বাস করো না।"—অনুকূল যে কখনই নীরবে থাকিবে না, তাহার পরে কোন ভীষণ প্রতিশোধ সে যে লইবেই এ দুশ্চিন্তা তাহার মন হইতে একবারও অপসৃত হইতেছিল না এবং মন তাহার যেন ক্রমাগতই একটা অনিশ্চিত অমঙ্গলেরই প্রত্যাশায় শঙ্কিত হইয়া রহিয়াছিল।

সুলেখা মাথা হেলাইয়া তাহার ভাবী স্বামীর অনুরোধে স্বীকৃতি প্রদান

করিল। তাহার পর দুই জনে কিছুক্ষণ চিন্তিতচিত্তে নীরবে থাকার পর অকস্মাৎ মৌনভঙ্গ করিয়া সুলেখাই কথা কহিল, —"তা হ'লে এখন তো আর কিছু বলবার নেই ? আমি এখন যাই ? যখনই আবশ্যক বোধ হবে, আমায় আপনি জানাবেন।"

এই বলিয়া স্মিতমুখে সে সুশীলের পায়ের কাছে প্রণাম করিল।

"ও কি করছো লেখা !"—সুশীল অপ্রস্তুতের একশেষ হইয়া তাড়াতাড়ি তাহার হাত ধরিয়া তুলিল, কিন্তু আর কোন কথাই সে বলিতে পারিল না। সুলেখার সমস্ত আচরণে তাহার ব্যথিত বক্ষ যেন নূতন একটা অজানা ব্যথায় ভরিয়া উঠিতেছিল, এখন সেটা প্রবলভাবেই টন্‌টন্ করিয়া উঠিল। তাহার চোখের কোণে যেন গোমুখীর জলস্রোত প্রবল উচ্ছ্বাসে ঠেলাঠেলি করিতে লাগিল। সুলেখার হাত সে এক মুহূর্ত্ত কালের জন্য ছাড়িয়া দিতে ভুলিয়া গেল। প্রাণপণে আত্মসংবরণ করিতে করিতে জলভারাক্রান্ত শ্রাবণমেঘের মতই স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। ওঃ সুলেখা ! তার অন্তরের বিপ্লব তুমি যদি দেখিতে পাইতে।

সুলেখা ঈষৎ লজ্জিতা ও রঞ্জিতা হইয়া হাত টানিয়া লইয়া কখন্ যে চলিয়া গেল, সে বুঝি তাহা জানিতেও পারিল না।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

বিনতার বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেল। বিবাহের পূর্ব্বদিন অনুকূলকে পত্র লেখা হয়, বিবাহের দিন টেলিগ্রাম যায়, কিন্তু সেখান হইতে কোন উত্তরই আইসে নাই। বিবাহের বর ইহাতে উল্লসিত। কন্যাকর্ত্তা ঈষদুদ্বিগ্ন হইলেও অনেকখানি তৃপ্ত। কেবল একা সুশীলের মনেই এ ঘটনা কোন দুর্ঘটনারই পূর্ব্বাভাষরূপে অশান্তির অনলে ইন্ধন যোগাইতে লাগিল। অত বড় ধূর্ত্ত যে নিরুপদ্রবে এ দাবীটাকেও অগ্রাহ্য করিবে, সে যে নিজের চোখে দেখিলেও তাহা বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না।

বিনতা বিবাহের পর পিতৃ-গৃহেই রহিল। কোথায়ই বা যাইবে? বিনতা ও শুভেন্দুর অবশ্য ইচ্ছা ছিল যে, ভুবনবাবু খরচপত্র করিয়া তাহাদের জন্য এখনই স্বতন্ত্র বাসা করিয়া দেন, কিন্তু ভুবনবাবু এ প্রস্তাব অনুমোদন করেন নাই। তিনি শুভেন্দুকে নিজের আফিসে কাজ শিখিবার জন্য ভর্ত্তি করিয়া লইয়া নিজের কাছেই রাখিলেন। বিনতার মনে প্রথম ধাক্কা লাগিল এইখানেই। তাহার অবিবাহিত জীবনে ও বিবাহিত জীবনে বিশেষ কোন কিছুরই প্রভেদ ঘটিল না।

ফুলশয্যার রাত্রে শুভেন্দুর স্বামিত্বের প্রথম পরিচয়েই সে একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেল। সে যে কাঞ্চনবোধে কাচ কিনিয়াছে, সেই একটি দিনেই সে বিষয়ে তাহার চিত্তে ঘোরতর সংশয় জাগিল এবং সঙ্গে সঙ্গেই একটা গভীর বিষাদের ঘনমেঘ অন্তরাকাশকে ব্যাপ্ত করিল।

বিনতার বিবাহব্যাপার চুকিলেই সুশীলের বিবাহোৎসব আরম্ভ হইবে, এইরূপই সকলের ইচ্ছা ছিল। এমন কি, সুশীলের নিজের মনেও

এ সম্বন্ধে আগ্রহ অপর কাহারও অপেক্ষা কম নহে। কিন্তু দুর্ভাগ্য-ক্রমে বিবাহের শুভ তিথি দুই মাসের মধ্যে আর পাওয়াই গেল না। অগত্যাই এটুকু বিলম্ব ঘটা অনিবার্য হইল এবং সপরিবারে বিপ্রদাসবাবু আরও এক সপ্তাহের জন্য ভাবী বৈবাহিক-গৃহের আতিথ্য স্বীকার করিয়া লইয়া প্রায় প্রতি রাত্রে থিয়েটার, বায়স্কোপ এবং এমনই কোথায় কোথায় ঘুরিয়া ফিরিতে লাগিলেন। সত্যবতী সরোজিনীর সহিত কালীঘাট সর্ব্বমঙ্গলা, দক্ষিণেশ্বর প্রভৃতিতে এবং বিনতা, শুভেন্দু, সুশীল, সুলেখা প্রভৃতি তরুণের দল দক্ষিণেশ্বর হইতে বায়স্কোপ, চিড়িয়াখানা, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল কোন কিছুকেই তুচ্ছ করিল না। প্রভাতে মোটরারোহণে যশোহর এবং সান্ধ্য নদীতে ষ্টীমারবিলাসে দুই এক দিন ডায়মণ্ডহারবার পর্য্যন্তই তাহারা ঘুরিয়া আসিল।

শেষ যে দিন ষ্টীমারে করিয়া বেড়ান হইল, ফিরিবার সময় শুভেন্দু ও বিনতা কথায় কথায় কি লইয়া তর্ক করিল এবং তাহার ফলে বিনতা রাগ করিয়া উপরের কেবিনে গিয়া কোচে শুইয়া রহিল, তখন শুভেন্দু গেল তাহাকে সাধিতে। অগত্যা সুশীল ও সুলেখা মাত্র সেখানে একা রহিল।

তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। স্নিগ্ধকান্তি নীল আকাশে অগণ্য তারকার দীপালোক মর্ত্ত্যবাসীর অবনত চিত্তকে উদ্ধপানে আকর্ষণ করিতেছিল। ধবলা জাহ্নবী দেবী আহোরাত্র ষ্টীমারচক্র-মথিতা হইয়া ইদানীং মলীনা হইয়াছেন, তবু তাঁহার সেই মলিমাঙ্গেরই বা কি অপরূপ রূপদ্যুতী! বর্ষাবারিরাশিপরিপুষ্ট নীরধারা মৃদুকল্লোলে অব্যাহত গতি-শালী। নদীবক্ষে তরঙ্গে তরঙ্গে নক্ষত্রচ্ছায়া নর্ত্তিত, বর্দ্ধিত ও বিভক্ত হইয়া জলকে আলোকরঞ্জিত করিয়াছিল। দুই তীরে কোথাও শ্যামল বিটপিশীর্ষে জোনাকির সহস্র ভাতি, কোথাও কলবাড়ীতে অত্যু

বিদ্যুদালোকের লহরীমালা, কোথাও গৃহস্থ-গৃহে রক্তাভ ক্ষুদ্র সান্ধ্য-দীপটুকু। চারিদিকেই যেন আলোকের আর পুলকের একটানা খর-স্রোত বহিয়া যাইতেছে।

সুশীল খোলা ডেকের উপর বেঞ্চের পিঠে বুকের ভর দিয়া সাম্‌নে ঝুঁকিয়া পড়িয়া নদীতীরের দিকে চাহিয়া বিষণ্ণচিত্তে ভাবিতেছিল, বিনতা কি ভুলকেই তার জীবনে স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া লইল! ঐ অসহিষ্ণুপ্রকৃতির আদুরে মেয়ে কেমন করিয়াই এই বিড়ম্বিত জীবন কাটাইবে?

সুলেখা কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। —"কি সুন্দর!"

সুশীল নিজের মনকে চিন্তাজালবিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া তাহার দিকে মুখ ফিরাইতেই তাহার ঐ দুটি কথার প্রতিধ্বনি তাহারও জিহ্বাগ্রে ফোটো ফোটো হইল। - কি সুন্দর!—প্রকাশ্যেও সে সহাস্যে প্রশ্ন করিল—"কি সুন্দর?"

সুলেখা কহিল—"কেন, এই গঙ্গার জল—আর ঐ গঙ্গাতীর! খুব সুন্দর নয়?"

সুশীল বিকসিতনেত্রে সুলেখার জ্যোৎস্না-সমুজ্জল আনন্দজ্যোতি-বিভাসিত প্রফুল্ল সুন্দর মুখের উপর স্থিরদৃষ্টি করিয়া স্মিতহাস্যে কহিল—"তোমার চাইতেও কি সুন্দর লেখা?"

সুলেখার হিমগৌর ললাট মঙ্গলগ্রহের মত আরক্তাভা ধারণ করিল। জ্ঞানোদয়াবধি সে তাহার দৈহিক রূপশোভার সম্বন্ধে অনেক উচ্চ প্রশংসা শুনিয়া আসিতেছে, কিন্তু কখন তাহা এমন করিয়া তাহার হৃদয়কে সুখ-প্রদীপ্ত করে নাই। এই স্তুতিটুকুতেই তাহার যেন নারীজন্ম সফল বোধ হইল। প্রীতি-মধুর চক্ষুতে এক লহমার জন্য ঈষৎ অনুযোগের দৃষ্টি হানিয়া সে কলস্বরে প্রতিবাদ চেষ্টা করিল—"যান্! তাই বই কি! আমি ত ছাই!"

সুশীল হাসিভরা স্নেহনেত্রে একটু মধুরদৃষ্টি আনিয়া তাহার দিকে দেখিতে দেখিতে চাপাহাসির সহিত কহিতে লাগিল—"তুমি ছাই? ওঃ, তা হবে! তবে বোধ হয় স্বর্ণভস্ম। ঘুঁটের ছাই ব'লে ত মোটেই বোধ হচ্ছে না।"

দুই জনেই তখন খুব হাসিল। সুশীল অপর বেঞ্চিখানা দেখাইয়া বলিল, "ব'সো।"

সুলেখা সে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিল। তাহার পর উৎসুকভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন? কোন কথা আছে কি?"

সুশীল প্রথমে ব্যঙ্গস্বরে উত্তর করিল, "কথার শেষ আছে কি?" পরক্ষণেই তাহার হাসিমুখ ঈষৎ গম্ভীর হইয়া আসিল। সেদিনকার সেই কথাগুলা মনে পড়িয়া গেল। সুলেখা সে কথা ভুলিয়া যায় নাই। নিজের সেটুকু দুর্ব্বলতা প্রকাশ সহসা সে দিন না করিলেই বুঝি ভাল ছিল। যখন বিপৎপাতের কোন সম্ভাবনাই দেখা যাইতেছে না, তখন অহেতুক এই নিষ্পাপহৃদয়া সরলা বালিকার চিত্তে ঐটুকু সংশয়ের বীজ বপনেরই বা কি সার্থকতা ছিল?

সুলেখা সেই কথাই তুলিল। বলিল, "সে দিন যে কথা বলবেন বলেছিলেন, সেই কথাই আজ বলবেন কি? তাই জিজ্ঞাসা করছিলেম। সে কথা বলার আর কি তাহলে' দরকার নেই?"

সুশীল মনে মনে একটু অস্বস্তি বোধ করিল, তাহার পর সেটা চাপা দিয়া মনটাকে সুস্থির করিয়া লইয়া সে উত্তর দিল—"বোধ হয়, আর তার দরকার হবে না। সে ভালই হয়েছে। অবশ্য কোন দিন না কোন দিন এ কথা তোমায় আমি জানাবো, তবে এখন নয়। সে এর পরে।"

ইহার পর দুই জনেই নীরবে রহিল। আকাশে তখন চাঁদ দেখা দিয়া অজস্র জ্যোৎস্না ফুটাইয়া তুলিয়াছিলেন। শুভ্র জলরাশি সেই স্বর্ণরশ্মি-

বিমণ্ডিত হইয়া চক্রমথিত সুবর্ণপিণ্ডবৎ প্রতীয়মান হইতেছিল। কলিকাতার উপকণ্ঠে নদীতীব বিদ্যুদালোকখচিত হইয়া মণিময় কণ্ঠহারের মতই দ্যুতি বিকীর্ণ করিয়া জ্বলিতেছিল।

বিনতা ও শুভেন্দু আসিয়া দাঁড়াইল। শুভেন্দুর মুখে সুস্পষ্ট বিরক্তি-চিহ্ন, বিনতার নেত্রে ক্ষমার স্নিগ্ধহাস্য।

বাড়ী ফিরিয়া বিনতা সুলেখাকে পীড়ন করিয়া ধরিল, "তোরা যখন দুজনে একা ছিলি, দাদা তোকে কি সব কথা বলছিল, বল না ভাই ?" সুলেখা তাহা না বলিলে—"তা গরীব ননদকে বলবে কেন ?" বলিয়া তাহার পরে তীব্র অভিমান জানাইল।

সুলেখাকে অগত্যাই তখন সকল কথা খুলিয়া বলিতে হইল। কথায় কথায় সে দিনের সে কথাগুলাও তাই আর বাদ গেল না। শুনিয়া বিনতার মুখ গম্ভীর হইয়া আসিল এবং ক্ষণপরে সে উহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "এ কথা শুনে তোর কি মনে হলো ? কি আন্দাজ করলি ?"

এ আলোচনা চালাইতে সুলেখার ভাল লাগিতেছিল না, বরং সুশীলের বিশ্বাসভঙ্গ করিয়া অপরকে এ সব কথা জানাইতে হওয়ায় সে নিজের মধ্যে একটা অশান্তিই অনুভব করিতেছিল। তাই এই প্রশ্নে ঈষৎ অপ্রসন্নমুখে জবাব দিল, "কই, কিছুইত মনে হয়নি,—আর আন্দাজই বা এর জন্য আমি করতে যাব কেন ?"

বিনতা বলিল, "না করলেই ভাল। আমিও একদিন 'তা' করতুম না, লোকে চোকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেও এতটুকু দোষ দেখিনি, কিন্তু এই কদিনেই দেখছি যে, পুরুষ জাতটাই মন্দ। অবশ্য আমার বাবা ছাড়া—হ্যাঁ, আর জামাইবাবুও।"

সুলেখার মনটা একথায় যেন একটু ভার হইয়া উঠিল, সে আর কোন কথাই কহিল না; কিন্তু মনে মনে বিনতার প্রতিই সে ইহাতে একটু

অসন্তুষ্ট হইল। তাহাব যেমন তুলনা করা! শুভেন্দুতে আর সুশীলে! সুশীলেব ছোট বেলার সেই যত কিছু বিপত্তি, সে ত সবই ওই দুর্দ্দান্ত শুভেন্দুরই জন্য, সে কথা নাকি সুলেখা জানেনা! তাহার বাপ নিজেই যে ভাল করিয়া সে কথা জানিয়া তবে না এই বিবাহ স্থির করিয়াছিলেন। বিনতা নিজের ভাইকে চিনিল না, অথচ পর সে, সেও জানে সুশীল কত ভাল।

ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

বাড়ী ফিরিয়া প্রথম প্রথম কয়েক দিন সুশীলের মন সদাসর্ব্বদাই ভয়চকিত ও ত্রস্ত হইয়া থাকিত। পিতার সহিত সাক্ষাৎ ঘটিলে সে সর্ব্বপ্রথম সভয়-স্পন্দিত বক্ষে তাঁহার মুখের দিকে চকিত কটাক্ষে চাহিয়া দেখিত—তাঁহার মুখে হাসি আছে কি না। তবে বিনতার এই অযোগ্য বিবাহব্যাপারে হাসি প্রায় তাঁহার মুখের সীমানা-ছাড়া হইয়াই গিয়াছিল এবং অনেক সময় এই অচেনা গাম্ভীর্য্যপূর্ণ ক্লিষ্ট মুখ সুশীলের অপরাধভীত সঙ্কুচিত চিত্তকে সংশয়াকুল করিয়াও তুলিয়াছে।

ক্রমে ক্রমে একটু একটু করিয়া অতীত দুর্ঘটনার দুঃস্বপ্ন সুশীলের চিত্ত হইতে মুছিয়া আসিতেছিল। অনুকূল তবে প্রতিশোধ লইল না? গভীর স্বস্তির নিশ্বাস মোচন করিয়া সে তাহার তত বড় উৎপীড়কেরও প্রতি কৃতজ্ঞ বোধ করিল এবং তাহার পর নিশ্চিন্ত হইয়া সে বিষয়ান্তরে মনোনিবেশ করিতে পারিল। অবশ্য নীলিমার কথা সে এত শীঘ্র এতখানি ভুলিতে পারিত না—যদি না এই সময় সুলেখা তাহার এত কাছাকাছি থাকিত। সুলেখাকে সে দেখিতে পায়, কদাচিৎ দুই জনে কথাবার্ত্তারও সুযোগ ঘটে। ভুবনবাবু ও বিপ্রদাসের সান্নিধ্যে প্রতি-দিনই তাদের মধ্যে দেখা শুনা ঘটে, সুশীলের সমস্ত মন-প্রাণ তাই এই সুযোগে একান্ত আকর্ষণে তাহার এই চির-প্রিয়তমাকে আশ্রয় করিতে ছুটিয়া গেল। এত দিন ভাবী সম্বন্ধের মধুর সম্পর্কমাত্র স্মৃতির মধ্যে খাড়া ছিল, আজ সে প্রতিমা প্রাণময় হইয়া উঠিল, যখনই নীলিমার সেই আনন্দশূন্য স্ফূর্ত্তিহীন নিষ্প্রভ মুখখানা বুকের মধ্যে ব্যথার আঁচড় কাটিতে

থাকে, তাহার প্রতি নিজের ব্যবহারের স্মৃতি অন্তরে গ্লানির কালিমা মাখাইয়া দেয়, তখনই সে প্রাণপণ শক্তিতে সুলেখার সুবর্ণময়ী মূর্ত্তি স্মরণ করে, সম্ভব থাকিলে সযত্নে এক মুহূর্ত্তকালের জন্যও তাহার সান্নিধ্যলাভ চেষ্টা করিতে থাকে, তাহার চিত্ত হইতে বেদনার মোচড় প্রায় থামিয়া যায়, কালির লেখা ধীরে ধীরে মুছিয়া আইসে। এমনই করিয়া তাহার সকল চিত্ত যখন বিগত দুঃস্বপ্ন বিস্মৃতপ্রায় হইযা সুলেখাময় হইয়া গিয়াছে, নীলিমা সেখানে চকিতোদয় অনধিকার প্রবেশের বিরক্তিতে পর্য্যবসিত-প্রায়, এমনই সময় একদা প্রভাতে এক অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটিয়া উঠিল।

সুলেখার জন্য বিপ্রদাস বাবু ভুবনবাবুর জহরতওয়ালা এক ভাটিয়া-রত্নবণিকের নিকট কতকগুলি অলঙ্কার গড়িতে দিয়াছিলেন, সে দিন সেইগুলি গড়া হইয়া আসিয়াছিল। দুই ভাবি বৈবাহিকে মিলিয়া সেই সকল দেখাশুনা করিতেছিলেন এবং দুইজনেই সুলেখাকে সেইখানে ডাকিয়া পাঠাইয়া তাহার অঙ্গে সেগুলি কেমন মানায়, তাহারও পরীক্ষা হইতেছিল, এমন সময় ডাকহরকরা কতকগুলি চিঠিপত্র দিয়া গেল। তাহার মধ্যে দুইখানির উপর স্বতঃই সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। সে দুইখানি একই হস্তাক্ষরে বাঙ্গালায় ঠিকানা লেখা, ঠিকানায় বাড়ীর ঠিক নম্বর দেওয়া নাই, তাই সেগুলি পঞ্চাশটি ছাপ-মারা হইয়া ডেড-লেটার অফিস হইতে ঘুরিয়া অনেকদিন পরে যথাস্থানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

হীরার মুকুট একখানা ভুবনবাবু ভাবী বধূর জন্য পছন্দ করিতে-ছিলেন, সেখানা সুলেখার হাতে দিয়া বলিলেন, "দেখ ত মা, ডিজা-ইনটা তোমার বেশ পছন্দ হয় কি না?" বলিতে বলিতে সর্ব্ব-প্রথম সেই চিঠিখানাই ছিঁড়িয়া পড়িতে আরম্ভ করিলেন।

সুলেখা ও বিপ্রদাস দেখিল, চিঠিখানার একটুখানি পড়িবার

পরই তিনি পাতা উল্টাইয়া লেখকের নামটা আগে ভাগে দেখিয়া লইলেন, তখনই তাঁহার মুখ বিশেষরূপ গম্ভীর হইয়া উঠিয়াছে। পাত দুয়েক পড়া হইলে পত্রপাঠ বন্ধ করিয়া যখন কপালের ঘাম মুছিয়া আর্ত্তশ্বাসের সহিত "মাঃ!" করিয়া একটা উৎকট যন্ত্রণা-ব্যঞ্জক ধ্বনি করিয়া উঠিলেন, তখন কোন অশুভাশঙ্কায় সুলেখার বুকের মধ্যেও সজোরে ঐ কাতর শব্দের একটা প্রতিধ্বনি জাগিয়া উঠিল, তাহার কোমল চিত্ত সেইক্ষণেই প্রবল সহানুভূতির সহিত তাহার পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্বশুরের অভিমুখে ছুটিয়া গেল, গহনাগুলা খুলিয়া নামাইয়া রাখিয়া বাপের দিকে চাহিয়া বলিল, "আজ এ সব নিয়ে যাক্ বাবা! কা'ল ওঁকে না হয় আসিতে ব'লে দিন।"

ততক্ষণে ভুবনবাবু আবার সেই অকথ্য যন্ত্রণাদায়ক ভীষণ পত্র পাঠ আরম্ভ করিয়াছেন। সব চিঠিখানা যখন পড়া শেষ হইয়া গেল, তখনও তিনি সেই চিঠির দিকেই বদ্ধচক্ষুতে চাহিয়া আছেন, সে পত্র যেন কাহার অশরীরী মূর্ত্তি। সে যেন কোন অন্তরতমের মৃত্যুসংবাদ, সে যে কি,—সে যে কি, সে যার এ দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে, সেই শুধু জানে!

সুলেখা কাছে গিয়া গায়ে হাত দিল, স্নিগ্ধ মধুরস্বরে কহিল, "অসুখ করচে কি?"

ভুবনবাবু ভয়ার্ত্তচক্ষুতে তাহার দিকে ক্ষণকাল আড়ষ্টভাবে চাহিয়া থাকিবার পর সহসা প্রায় আর্ত্তনাদের মত করিয়াই বলিয়া উঠিলেন,— "মা গো আমার! আমি বুঝি তোকে হারালুম!" বলিতে বলিতে দুই হাতের মধ্যে তাহার হাতটা সজোরে জড়াইয়া ধরিলেন।

"কেন আপনি অমন করচেন? আমায় কেন হারাবেন? এই যে আমি।" সুলেখা সেই ছোটবেলার মত করিয়াই তাঁহার কাছে

ঘেঁষিয়া গেল। তখন ভুবনবাবুও তাহাকে বুকের কাছে টানিয়া লইলেন, এবং তাঁর চোক দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

ব্যাপারটা যে কি ঘটিল, তাহা না বুঝিলেও কিছু ভয়ানক কাণ্ড যে একটা ঘটিয়াছে, এটা সহজ বুদ্ধিতে কে না বুঝিবে? ভুবনবাবুকে কতকটা সময় শান্ত হইতে দিয়া বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন বিপ্রদাস সুলেখাকে বিশেষ চেষ্টা পূর্ব্বক বাড়ীর ভিতর পাঠাইয়া দিলেন। তাহার পর তিনি মুহ্য-মান ও বাক্যহীন ভুবনবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "চিঠি আমি পড়তে পারি?"

ভুবনবাবু সচেষ্ট ইঙ্গিতে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া যেমন তেমনই অনড়-ভাবেই আরাম-চৌকির উপর পড়িয়া রহিলেন।—ওঃ, কি তীব্র,—কি অসহনীয় যন্ত্রণার মুহূর্ত্তও মানুষকে যাপন করিতে হয়! কি অসহ্য, কি অসহ্য সে জ্বালা। প্রাণ-প্রিয়ের মৃতমুখ দেখার অপেক্ষাও এ বুঝি অসহ্যতর! তথাপি মানুষের কঠিন প্রাণে তাহাও সহ্য হইয়া যায়! এ কি রহস্য দিয়া গড়িয়াছ মানবচিত্ত হে ভগবান! যেখানে ভ্রমরপদভার সহিত না, সেখানে বজ্রাঘাতও যে সহিয়া গেল! ভুবনবাবুর জ্বালাভরা চিত্তে এমনিধারা এলো-মেলো কতকগুলা কথা ওতপ্রোতভাবে উঠা-নামা করিতেছিল, সব কথা ভাল করিয়া তাঁহার মনে গুছাইয়া আসিতে-ছিল না, শুধু নিদারুণ শোকের মত মনের মধ্যে বজ্রবলে বাজিয়া উঠিতেছিল—তাঁহার আদর্শ ফুরাইয়া গিয়াছে! তাঁহার সুনীল আজ এত বড় কলঙ্কে কলঙ্কিত!

বিপ্রদাস সেই দীর্ঘ পত্র যথেষ্ট সহিষ্ণুতার সহিত পাঠ শেষ করিয়া সম্পূর্ণ সংযত কণ্ঠে মন্তব্য প্রকাশ করিলেন, "এতে এত ঘাবড়ে গেলে চলবে কেন রায়? একটা বাজে লোকের বাজে ভয় দেখান;

শ'দুই টাকা পাঠিয়ে দাও আর লিখে দাও যে, এ নিয়ে যদি ফিরে ঘ্যান-ঘ্যান করতে আসে, তা হ'লে ছেলেকে জোর ক'রে ধ'রে রেখে বিয়ে দিচ্ছিল ব'লে আমরাই ওর নামে উল্টো নালিশ দায়ের ক'রে দেবো। কি'চ্ছু ভেবো না তুমি, বরং ওটা তুমি আমার হাতেই ফেলে দাও, আমি ওসব'তু কথায় মিটিয়ে দিচ্ছি।"

ভুবনবাবু একান্ত বিস্ময়ে তড়িৎস্পৃষ্টের ন্যায় উঠিয়া বসিলেন। বিস্ফারিত বিহ্বল চক্ষুতে বিপ্রদাসের স্থির চক্ষুর উপর চাহিয়া তেমনই বিহ্বলতর ভাবেই তিনি সাশ্চর্য্যে কহিয়া উঠিলেন, "তুমি মিটিয়ে দেবে?—তুমি?—"

বিপ্রদাস কহিলেন, "তা বোধ হয় তোমার চাইতে আমি ভালই পারবো। এসব কাজ তোমার মতন অমন কোমল হৃদয়ের কর্ম্ম নয়।"

বিপ্রদাসের অবিচলিত ভাবে ভুবনবাবুর নিজের বিকলতা যেন একটুখানি প্রশমিত হইবার উপক্রম করিতেছিল, কিন্তু সহসা আবার নূতন করিয়া তাঁহার বুকের মধ্যের ধূনাইত যন্ত্রণানল তীব্র শিখায় জ্বলিয়া উঠিল।

"বিপ্রদাস! দেখা—মা'কে আমার... আমি যে তরু-বিন্দুর উপর ক'রে স্নেহ করেছিলুম ভাই!"

বিপ্রদাসের মুখে বা ভাবে কোন বিপর্য্যই দেখা গেল না। তিনি যথাপূর্ব্ব শান্ত স্বরেই কহিলেন, "বেশ ত, চিরদিনই তাই করবে। তোমার বউ তুমি ত স্নেহ করবেই, সে আর এমন বিচিত্র কি?"

ভুবনবাবুর ব্যথাহত প্রাণ এ আশ্বাসে কি যে করিয়া উঠিল, তাহা যেন তাঁহার প্রকাশেরও অনেক দূরের বস্তু। ক্ষণকাল নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে বিমূঢ়বৎ থাকিয়া পুনশ্চ একটা বুকফাটা হাহাকারের

মতই কাতর আর্ত্তস্বরে কহিয়া উঠিলেন,—"সুশীল আমার এ কি করলে! আমার সুশীল!"

বিপ্রদাস তৎক্ষণাৎ আহতগর্ব্ব অপমানাহত শোকার্ত্ত পিতাকে সান্ত্বনা দিয়া সতর্কভাবে উপদেশ প্রদান করিলেন।

"দেখ ভাই! এ নিয়ে তুমি খুব বেশী একটা বাড়াবাড়ি মন খারাপ-টারাপ করো না। বয়েসকালে এমন সব ঘটনা সকলকারই এক সময় না এক সময় ঘ'টে থাকে। আবার বিয়ে-থাওয়া হয়ে দু একটি সন্তান-টন্তান জন্মালে ওসব সেরে সুরেও যায়। ও কি আর অত ক'রে ধর্‌তে আছে? পুরুষমানুষ কে' না অমন একটু আধটু ভুলচুক করচে সংসারে। সব্বাইত আর ভগবান শঙ্করাচার্য্য আসেনি।"

ভুবনবাবু কি শুনিতেছেন, নিজের কানকেই যেন বিশ্বাস করিতে পারিতেছিলেন না। সুলেখার বাপ—তাঁহার ছেলের ভাবী শ্বশুর, সে এমন অবিচলিতভাবে এই এত বড় কুৎসিত ঘটনাটাকে অনায়াসেই গ্রহণ করিতে পারিল, যে অপরাধের ক্ষমা বাপ হইয়াও তিনি কোথাও খুঁজিয়া পাইতেছেন না!

মানুষের মনের মধ্যে এত প্রভেদ! বিস্ময়ের সহিত তাঁহার মুখ দিয়া নির্গত হইল;—

"তবে কি তুমি এ বিয়ে ভেঙ্গে দেবে না? তাকে এত বড় দোষে দোষী জেনেও তার হাতে তোমার অমন লক্ষ্মী-রূপিণী মেয়ে দিতে পারবে?"

বলিতে বলিতে ক্ষোভে ঘৃণায় তাঁহার গলার স্বর বদ্ধ হইয়া আসিল। উঃ, কি লজ্জা! কি লজ্জা! কি অপমান রে! সুশীল!—সুশীল!

বিপ্রদাস তেমনই বিস্ময়াশ্চর্য্যের সহিত তৎক্ষণাৎ প্রত্যুত্তর করি-

লেন, "বল কি রায়। বিয়ে ভেঙ্গে দেবো? বিলক্ষণ! সাত বৎসর ধ'রে যে কথা চলেছে, আজ এক মুহূর্ত্তেই তা ভেঙ্গে প'ড়ে যাবে? বলেছি ত, কম বয়সের ভুল ভ্রান্তি বয়েস পাকলেই সব সামলে যায়, ওর জন্যেও আবার অত মন খারাপ করতে আছে? এখন যাতে বিয়েটা শীঘ্র শীঘ্র হয়ে যায়, তারই চেষ্টা আমাদের করতে হবে। আর এ দিকে মিটমাট—সে-ও আমি সব ঠিকঠাক ক'রে নিচ্চি, ওর জন্যে তুমি একরত্তিও মাথা খরচ ক'রে অনর্থক দুঃখ পেও না,—যত সব জ্বালাকাতুরের ব্যাপার!"

ভুবনবাবু ধীরে ধীরে সুগভীর একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন করিলেন। তাঁহার বুকের ভিতর যন্ত্রণার তীব্র হাহাকারে ভরা যে অগ্নিময় ঝটিকা বহিতেছিল, তাহা যদিও এই সান্ত্বনায় এতটুকুও প্রশমিত করিতে পারিল না, তবে সুলেখার জন্য তাঁহাকেও যে তাঁহার গুরু অপরাধে অপরাধী পুত্রকে অন্ততঃ প্রকাশ্যভাবে কতকটা ক্ষমা করিতে হইবে, ইহা তখনই মনে মনে স্থির হইয়া গেল।

সে দিনের ডায়ারিতে স্খলিত কলমের লেখায় এই কয়টি কথা লিখিত হইল;—

"চারুশশি!—কোথায় আছ? লজ্জায় মুখ লুকাও! আমার আদর্শ, আমার আনন্দ, আমার আশা, আমার আজীবনের সকল সাধনা আজ অতল জলে বিসর্জ্জন দিয়াছি! আমার মেয়ে স্বেচ্ছাচারের বশীভূত হইয়া কুবিবাহে নিজেকে অবনত করিয়াছে—আর আমার ছেলে,—ওঃ ভগবান্! সুশীল! সুশীল! তুমি আমার এ'কি করলে;—কেন মরিলাম না!"

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

গোলমাল এইখানেই মিটিয়া যাইতে পারিত—যদি না সেই দিনের ডাকেই অনুকূলের নিকট হইতে আর একখানা চিঠি শুভেন্দুর নাম লইয়া এই বাড়ীতেই আসিত। সেই চিঠিখানা পড়িয়া শুভেন্দু তখন এক ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিল।—বড়লোকের জামাই হইয়া শুভেন্দু নিজেকে সম্মানিত বোধ না করিয়া বরং পদে পদে অপমানিতই বোধ করিতেছিল। তাহার বিশ্বাস, সে গরীব বলিয়া সকলেই মনে মনে তাহাকে অগ্রাহ্য করে। ভুবন বাবু হইতে আরম্ভ করিয়া বাড়ীর নূতন ঝিটা পর্য্যন্ত এই অভিযোগে তাহার কাছে অতি ভীষণভাবেই অভিযুক্ত। দুই জন লোক একসঙ্গে দাঁড়াইয়া কোন কথা কহিলেই শুভেন্দুর মনে হয় যে, তাহারা তাহারই কথা বলিতেছে। কেহ কোথাও হাসিলে ত আর রক্ষাই নাই! সে হাসি নিশ্চয়ই তাহাকে উপহাস করিয়া হাসা—বিনতাকে সে সর্ব্বদাই এ কথা শুনাইতে ছাড়েনা এবং তাহার ফলে দুইজনে সদাসর্ব্বদা কলহ চলিতেছেই থাকে। বিনতা কখনও স্বামীর পক্ষ লইয়া পরিজনবর্গের প্রতি অভিমান করে, কখনও ক্রমাগত একই অভিযোগে উত্যক্ত হইয়া বলে—"বেশ করে,—তাচ্ছীল্য করে। যাতে না করতে পারে, সে যোগ্যতা অর্জ্জন কর না কেন, তখন ওরাও আর করবে না। তাচ্ছীল্যের যোগ্য কি তুমি নয়, যে বলছ না?"

সুশীলের উপরেও শুভেন্দুর ঈর্ষা ও বিরক্তির অন্ত ছিল না। সুশীল বড়লোকের ছেলে বলিয়া বরাবরই সে তাহাকে মনে মনে তীব্র ঈর্ষা করিত এখন নিজে বড়লোকের জামাই হইয়া সেটা তার বদ্ধিতই হইয়াছে।

জামাই আর ছেলে যেই কিছুতেই এক হতে পারে না, তা সে খাওয়া পরা সকল বিষয়ে একত্বলাভেও নয়, এই অভিজ্ঞতাটুকুর লাভ হইতে এই ঈর্ষাটাও তাহার মনে নিত্যই প্রবলতর হইতেছিল। বিশেষতঃ এবার ফিরিয়া অবধি সুনীল কোনমতেই শুভেন্দুর কাছে তিষ্ঠিতে পারিতনা। ইহার অবশ্য নানা কারণই বর্ত্তমান ছিল; কিন্তু শুভেন্দু তাহার এই একটা কারণই ধরিয়া লইয়াছিল যে, সে গরীব বলিয়া সুনীলেরও ঘৃণা হইয়াছে, বন্ধু হিসাবে সুনীলের কাছে তাহার এত দিন দর থাকিলেও ভগ্নীপতি হিসাবে নাই। শুভেন্দু তাই মনে মনে এতদিন ধরিয়া গুমরিয়াছিল।

আজ সুযোগ পাইবা মাত্র সে তাহার অপব্যয়ও করিল না। খোলা চিঠিখানা হাতে করিয়া একেবারেই সে সুনীলের উদ্দেশ্যে তার ঘরে গেল। সুনীলের বসিবার ঘরে তখন সুলেখা ও বিনতা দাঁড়াইয়া উদ্বিগ্নভাবে কথা বার্ত্তা কহিতেছিল। ভুবন বাবুর শরীর বিশেষ অসুস্থ; তিনি আজ স্নানাহার করেন নাই। সেই কথাই হইতেছিল। সুলেখা বলিল, "একজন ডাক্তার আনা কিন্তু খুবই দরকার ছিল।"

বিনতা কহিল, "দাদা সেকথা বলেছিল, তা' তাতে বাবার আর তোমার বাবারও কি জানি কেন মত হলো না।"

এই সময় শুভেন্দু ঘরে ঢুকিয়া ব্যাগ্রস্বরে গর্জ্জিয়া উঠিল,—"কই, সে হতভাগাটা কোথায়? কোথায় গেল সে রাস্কেলটা? তাকে আমি আজ একবার দেখে নিতে চাই! পাজি ড্যাম শূয়ার!"

এই ভীষণ আস্ফালনযুক্ত আক্রমণে দুইজনেই ভীত হইল। বিনতা কিছু নম্রস্বরেই কহিল, "কাকে খুঁজচো? মাধবকে? সে ত এ দিকে আসেনি। কি করেছে সে?"

ক্রোধ-পরুষ কণ্ঠে ব্যঙ্গ করিয়া শুভেন্দু বলিল,—"মাধবকে নিয়ে

আমি কি করবো ? খুঁজছি তোমার গুণধাম দাদাকে। পাজি, বজ্জাত, ছোটলোক, জানে না সে, আমাদের সে কি সর্ব্বনাশটা ক'রে এসেছে ? গরীব ব'লে এত অত্যাচার ? উঃ ! দেশে কি আইন-আদালতও নেই ? রাজা নেই ? আমি ওকে পুলিসে দেবো, জেল খাটাবো, ঘানি টানাবো, পাথর ভাঙ্গাবো—তবে আমার নাম শুভেন্দু চক্রবর্ত্তী !—অমন ছাড়বো ওকে ? সাধু পুরুষের ডুবে ডুবে জল খাওয়া বার ক'রে দিচ্ছি এইবার দেখ না ! আমরা যা' করি দশের সাক্ষাতে জানিয়ে করি, ধর্ম্মের খোলস পরে লুকিয়ে লুকিয়ে করিনে।"

নারী দুই জন ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। বিনতা দুই একবার মুখ খুলিতে গিয়াছিল, কিন্তু সেই বদ্ধ মুষ্টি, ঘূর্ণিত চক্ষু ও ভীষণ মূর্ত্তি দেখিয়া ভয়ে তাহার গলা কাঠ হইয়া গেল, কথা কহিবে কি, আতঙ্কে সে আড়ষ্ট হইয়া রহিল।

শুভেন্দু দুইটি অসহায়া নারীকে নিজের নির্ব্বাক শ্রোতারূপে পাওয়ায় দ্বিগুণ উৎসাহের সহিতই এদিকে নিজের বাক্যস্রোত প্রবাহিত করিয়া দিয়াছিল—"ছোট লোকটা যখনই সেখান থেকে আসতে চাইলে না, তখনই আমি এই সন্দেহ করেছিলুম ! গরীবকে দয়া দেখিয়ে নিজের ছেলের চাইতে আপন হয়ে এই কুমতলবেই তাদের বুকে চেপে বসেছিলেন ! অ্যাঁ, এ কি অমানুষিক অত্যাচার ! আমরা গরীব হ'তে পারি, এঁদের মতন অত পাশও করিনি ; কিন্তু এত বড় নৈতিক অবনতি তা ব'লে আমাদের ভিতর হয় নি। আমরা ও সব ভণ্ড তপস্বীদের চাইতে লাখো গুণে উপরে তা এই বড় গলা করে বলতে পারি ! ভণ্ডতপস্বী এদিকে—"

"ব্যাপার কি শুভু ! সকালবেলায় অমন করে চেঁচাচ্চো কেন ?" —বলিতে বলিতে ঈষৎ অপ্রসন্নমুখে সুশীল আসিয়া গৃহে প্রবেশ

করিল।—"বাবার আজ শরীরটা বড় ভাল নেই, গোলমাল কানে গেলে হয় ত কষ্ট পাবেন ; কি, তোমাদের হয়েছে কি, বিনু?"

"হয়েছে কি? পাজি! রাস্কেল! জানো না কি হয়েছে? দুধ দিয়ে কালসাপ পুষে রেখে এসেছিলুম! একেবারে বুড় বুড়ির বুকে ছোবল মেরে এসেছ! সয়তান!"

এক নিমেষের মধ্যে সকল ব্যাপারই সুশীলের হৃদয়ঙ্গম হইয়া গেল। একই মুহূর্ত্তে তাহার চোখে পৃথিবীর বর্ণ পরিবর্ত্তিত বোধ হইল, তাহার পায়ের নীচের মাটী দুলিয়া উঠিল, তার কানের পাশ দিয়া যেন কামানের গোলা চলিয়া গেল। একটি কথাও না কহিয়া সে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল, আর একবারটী মুখ তুলিয়া চাহিলও না এবং তাই সে দেখিতেও পাইল না যে, তাহারই অনতিদূরে গৃহপ্রান্তে দাঁড়াইয়া এক কুপিতা সিংহী-সদৃশী বালিকার অগ্নিবর্ষী অনিমিষ দৃষ্টি ও সেই সঙ্গে সঙ্গে কি তীব্র ক্ষোভের লজ্জায় ধরাতলশায়ী হইতে চাহিল।—সে বালিকা সুলেখা।

শুভেন্দু যখন দেখিল, তাহার এতখানি বীরত্বের কেহ প্রতিবাদমাত্রও করিল না, তখন তাহার সাহসও বর্দ্ধিততর হইল। সুশীলের উপর সকল ক্ষোভের জ্বালা মিটাইতে চাহিয়া সে তখন পুনশ্চ ক্রুদ্ধ তর্জ্জনে চোখ পাকাই বলিল, "ভদ্রলোক জেনে মা-বোনের কাছে বিশ্বাস ক'রে রেখে এসেছিলুম, তাহার এই প্রতিফল দিলে! বিশ্বাসঘাতক! নীচ! কুচরিত্র! পশু!"

সুশীল সবেগে দুই পদ শুভেন্দুর দিকে অগ্রসর হইয়া আসিয়া আহত সিংহের ন্যায় উন্নত গ্রীবায় আরক্ত মুখ তুলিয়া রোষক্ষুব্ধ স্বরে বাধা দিল, "সাবধান শুভেন্দু!"

"কিসের সাবধান সুশীল? আমার বোনের সর্ব্বনাশ ক'রে, আমার

মাকে হত্যা ক'রে চোরের মতন লুকিয়ে পালিয়ে এসে নিজের দুর্গে আশ্রয় নিয়েছ, তারই জন্যে কি আমাকে সাবধান হ'তে হবে?"

"তোমার মাকে হত্যা ক'রে!"

"হ্যাঁ, আমার মাকে! এই চিঠিখানা নিজেই প'ড়ে দেখ, নীলির সর্ব্বনাশ ক'রে তাকে ফেলে তুমি চোরের মতন পালিয়ে এসে, বাবা কেলেঙ্কারীর ভয়ে একটা বুড়োর সঙ্গে তাড়াতাড়ি তার বিয়ে দিয়ে দিচ্ছিল; কিন্তু বিয়ে হবার আগেই, মায়ের হার্টফেল ক'রে,— নীলিও তখনই বাড়ী থেকে পালিয়ে যায়—এসব কার জন্যে?— কে তাকে লুকিয়ে রেখেছে?"

সুশীল সহসা অধোমুখ হইল। স্বর্ণলতা মরিয়াছেন! সেই রাত্রে! নীলিমা পলাইয়াছে। 'কার জন্য'? 'এ সব' কার জন্য? সত্যই তো! এসব তারই জন্য নহে কি? সে যদি সে বাড়ীতে কোন দিনই না ঢুকত!

সুশীলের এই অসহ্য নীরবতা এই সময় ঐ স্থানেই অগ্ন্যুৎপাত করিল, তাহার মধ্যে অতেন্দু সহসা হিতাহিত জ্ঞানহারা হইয়া প্রমত্ত-ভাবে ছুটিয়া আসিয়া সুশীলের হাত চাপিয়া ধরিল, চিৎকারস্বরে কহিল,—"নীলিকে নিশ্চয়ই তুমি কোথাও লুকিয়ে রেখেছ। তাকে বিয়ে করতে পার না, কিন্তু নিজের বিলাসের সাথী, সেবাদাসী করতে ত আর কোনই অনিচ্ছা নেই। বল সে কোথায়? বার করে দে' তাকে। কেন, মেয়েরা গরীব ব'লে আমাদের পরে এত বড় অত্যাচার! কেন আমরা তা সইবো?"

সুশীল কথা কহিল না, মুখ তুলিল না, নিবাতনিষ্কম্প প্রদীপের মতই অনড় অচল হইয়া সে স্তব্ধ রহিল। এত বড় অপবাদও তাহার মাথায় তুলিয়া দিল? এও কি সম্ভব? উঃ, মানুষে এ কাযও পারে?

"তবে এই দেখ্ তোকে দিয়ে সত্যকথা স্বীকার করাতে পারি কি না!"—বলিয়াই শুভেন্দু তাহার কঠিন মুষ্টি বদ্ধ করিয়া সজোরে সুশীলের নাকের উপর একটা প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাত করিল।

এই কাণ্ডটা সে অত্যন্ত আতকিতেই করিয়া ফেলিলেও ইহা দেখিয়াই সঙ্গে সঙ্গে ক্রুদ্ধ স্বরে বিনতাও চিৎকার করিয়া উঠিল,—"বেরিয়ে যাও আমাদের বাড়ী থেকে! দাদার গায়ে তুমি হাত তুলতে সাহস কর? এত বড় স্পর্দ্ধা তোমার?"

সেই প্রচণ্ড আঘাতে সুশীল একবার ঘুরিয়া পড়ার মত হইয়া দেওয়াল ধরিয়া নিজের পতন সামলাইয়া লইল। তাহার পর কোঁচার কাপড় নাকে চাপিয়া নিকটবর্ত্তী একটা কোচের উপর সে মাতালের মতন টলিয়া বসিয়া পড়িল। দেখিতে দেখিতে তাহার কাপড়খানা চেলীর কাপড়ের মতই রক্তে লাল হইয়া গেল। সমস্ত পৃথিবী তাহার চোখের সামনে একটা ভাঁটার মতই বন্‌বন্ করিয়া ঘুরিতে লাগিল, তাহারই মধ্যে সে তাহার প্রায় অন্ধকার চোখের দৃষ্টি দিয়া দেখিতে পাইল যে, তাহার সম্মুখে রহিয়াছে সুলেখার রক্তহীন বিবর্ণ মুখ এবং সেই মুখের মধ্যের চোখ দুইটা যেন দুইটা লাল বাতির মতই কি অস্বাভাবিক তেজে জ্বলিতেছে।

* * * *

সুলেখা তাহার বাপকে ডাকাইয়া আনিয়া বলিল, "আজই আমি বাড়ী যাব বাবা! সব গুছিয়ে নিয়েছি এক্ষণই গাড়ী ডাকতে ব'লে দাও।"

বিপ্রদাস একটু ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন, "আজই কি করতে যাবি? দাঁড়া, কা'ল গহনাগুলো আসুক, আর—"

সুলেখা দৃঢ়কণ্ঠে উত্তর করিল, "না বাবা! আমায় আজ যেতেই

হবে। আমার শরীর ভারি খারাপ বোধ হচ্চে। কলকাতা আর এক দিনও আমার থাকা চলবে না। ওসব এর পরে হবে তখন, আমায় আগে এখন রেখে এস।"

বিপ্রদাস সকালের ব্যাপারে নিজের মেয়ের সম্বন্ধে মনে মনে একটু উদ্বিগ্ন হইয়াও ছিলেন। মেয়ে বা আসল ব্যাপারটা বুঝিতে পারে, সে ভাবনা তাঁহার মনে বিলক্ষণই ছিল। সেই জন্যই তাহার এখান হইতে সরিয়া যাওয়ার তিনি আর আপত্তিমাত্র করিলেন না, বলিলেন,—"আচ্ছা, রায়কে তা হ'লে বলি গিয়ে, সে যদি মত করে ত গাড়ী আনাইগে, তার আবার আজ মাথাটা কেমন হঠাৎ একরকম হয়ে গেছে। একটা মস্ত মোকদ্দমা হারাব খবর পেয়েছে কি না আজ সকালে—"

সুলেখা একবার তীক্ষ্ণচোখে বাপের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিয়া ত্বরিতপদে সেখান হইতে চলিয়া গেল।

সমস্ত বাড়ীটাই কেমন যেন একটা অন্তর্বিদ্ধ বেদনাভারে ভারাক্রান্ত ও থমথমে হইয়া রহিল। অথচ কেন, যে, তাহার প্রকৃত কারণটা অনেকেরই নিকট অজ্ঞাত। বাবু অসুস্থ এবং দাদাবাবুর সহিত জামাইবাবুর ভয়ঙ্কর একটা ঝগড়া হইয়া গিয়াছে।—তা হবেই ত, নির্ধনের ধন হইলে জগৎকে সে যে তৃণ জ্ঞান করিয়াই থাকে,—এ ত' আর কিছু নূতন কথা নয়! তা' ঠিক এই রকমই ঘটনা অমুক অমুক অমুক সংসারে এর কত আগে আগেই যে ঘটিয়া গিয়াছে। তা ছোট দিদিমণিও না কি এবারে ছেড়ে কথা কয় নি, সেও আজ খুব যাচ্ছেতাই করেছে।—বাবুসাহেব গোঁসা ক'রে তখনই তো ফরকে উঠে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেছেন।—গেছেন, যেতে দাও না, পিত্তি চুঁই চুঁই করলেই আবার ল্যাজ মুখে করে আপনিই ফিরে আসতে পথ পাবেন না।

হতো সেই সময় গর্মালা দেওয়া, তা হ'লে ছদিন গাঁজে-গোবরে হয়ে মেজাজ একটুখানি ঠাণ্ডা হতো।—ছোট দিদিমণির যেমন বেয়াড়া সখ, মাকালফলটাকে কি না থামোকাই ইচ্ছে সাধে বেছে নিলে!

চারিদিকে চাকরদাসীমহলে চুপি চুপি এই সকল নানাবিধ আলোচনা চলিতেছিল।

সুশীল সারা দুপুর সেই ঘরে সেই কৌচখানার উপরেই আড়ষ্ট অভিভূতবৎ পড়িয়া রহিল। একই সময় বিমলা, শুভেন্দু ও সুলেখা তাহাকে একা রাখিয়া চলিয়া গিয়াছিল। শুভেন্দু বিমলা যে কলহ করিতে করিতে গিয়াছিল, তাহাদের সেই সরব গর্জ্জন তখন সুশীলের কানের বা মনের মধ্যে প্রবেশও করিতে পারে নাই; কিন্তু আর এক জনের নিঃশব্দ প্রস্থানকালীন সেই একটুখানি নীরব ঘৃণার চাহনি আজ তাহার ব্যথাভারাতুর শরীর-মনের উপর যেন সহস্র মণ ভারের মতই বিরাট হইয়া চাপিয়া ধরিয়া আছে। সুলেখা—যে সুলেখা এক দিন অপরিচিত বালক সুশীলের প্রতি তাহার বাপের দেওয়া শাস্তিকে সহিতে পারে নাই, সেই সুলেখা আজ তাহার সাত বছরের পরিচিতা বিবাহপণে বদ্ধা, বুঝি এই মাসাধিককালের ঘনিষ্ঠতায় সমধিক স্নেহবন্ধনে সম্বদ্ধ, সেই সুলেখা আজ তাহাকে এইরূপ অবমানিত ও শোণিতাপ্লুত দেখিয়াও অনায়াসে অবহেলায় মুখ ফিরাইয়া চলিয়া গেল! আর চোখে তাহার সে কি সঘৃণ দৃষ্টি!—উঃ, সুশীলের বুক এখনও লজ্জায় ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে না কেন?

সহসা সুশীলের মনে পড়িল তাহার বাপের কথা! তবে তিনিও কি এই সংবাদেই আজ শয্যাশায়ী হইয়াছেন? আচ্ছা সুশীল তখন ঘরে ঢুকিতেই তিনি না তাহার দিকে অমনই পিছন ফিরিয়াছিলেন? তাহার সঙ্গে একটি কথাও ত কই তিনি আজ কহেন নাই? সামনে গেলে অমনই চোখ ঢাকা দিয়াছিলেন না!—ঠিক তাই—ঠিক তাই—

নিশ্চয় নীলিমার পিতা তাহার উপর এই অতি হীন প্রতিশোধ লইয়াছেন! সর্বলতাও ঘরে নাই—নীলিমাও পলায় নাই—মাত্র আরও একটা মিথ্যা চক্রান্ত গড়িয়া তাহাকে নূতনভাবে আক্রমণ করা হইয়াছে। সুশীলের সর্বশরীরের শোণিতপ্রবাহ যেন অসহায় রুদ্ধরোষে তরল অগ্নিপ্রবাহের মতই তাহার দেহকে জরতপ্ত করিয়া তুলিল। মানুষ এত ক্ষুদ্র হয়? এমন হীন হয়? এত ছোট হয়? উঃ!—উঃ!—উঃ!

ধীরে ধীরে ধীরে আবার আর একটা নিবিড় অভিমানে তাহার বুক ভরিয়া উঠিতে লাগিল। এ সম্বন্ধে তাহাকে একবার জিজ্ঞাসা করিবারও কি কাহারও কোন প্রয়োজন ছিল না? সুশীলের চরিত্রে কবে কি সন্দেহজনক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছিল যে, এক কথায় তাহাকে এত বড় একটা অমানুষিক অপরাধের পাপে পাপী বিনা বিচারেই সাব্যস্ত করা হইল? আর যে যা করে করুক, তাহার বাপের এ অবিচার যে তাহার পক্ষে একান্তই অসহ্য! আর সুলেখা—সেও কি এই সে দিনও বলে নাই যে, সে তাহাকে অবিশ্বাস করিতে পারে না?

ঘরের দরজা খোলার একটুখানি শব্দ হইল। সুশীল নিজের চিন্তাভারে আচ্ছন্ন থাকিয়াও সেটুকু কেমন করিয়া জানিতে পারিয়াছিল; অতি কষ্টে সে মাথা ফিরাইয়া দেখিল, মুক্তদ্বারপথে সুলেখা গৃহপ্রবেশ করিতেছে। সেই মুহূর্তে কি আবেগ, কি আহ্লাদ, কি আশাই যে তাহার ভগ্নচিত্তে বিদ্যুচ্চমকে জাগিয়া উঠিল, সে শুধু সে-ই জানে। অতি কষ্টে সে তখন উঠিয়া বসিল। বসিতে গিয়া রক্তপাতজনিত দৌর্বল্যে মাথা তার আবার ঘুরিয়া উঠিল; চোখে অন্ধকার বোধ হইল, তথাপি সে তাহাতে ভ্রূক্ষেপমাত্র করিল না। সুলেখা তাহাকে অবিশ্বাস করে নাই! সে তাহাকে পরিত্যাগ করে নাই! সে তাহার কাছে ফিরিয়া আসিয়াছে! আঃ!

সুলেখা আসিয়া টেবলের আর এক ধারে সুশীলের সম্মুখীন হইয়া দাঁড়াইল। তাহার মুখের সেই মিষ্ট স্নিগ্ধ-স্মিত হাস্যটুকু আর সেখানে নাই। সে স্থির অপলক নেত্রে সুশীলের মুখের দিকে চাহিল, এখনও সেখানে অচপল গাম্ভীর্য্যের সহিত যে একটা অক্ষমণীয় ঘৃণার ভাব অমিশ্রিত-ভাবে দেদীপ্যমান রহিয়া গিয়াছে, তাহা চিনিতে কোনরূপেই বাধে না। সুশীল বারেক সে চোখের দিকে চাহিয়াই তাই অপরাধীর মত নিজের মাথা নত করিল। প্রখর সূর্য্যের দিকে চাহিতে যেরূপ ক্লেশ হয়, তাহারও আজ এই পুণ্যজ্যোতির্ম্ময়ীর বিচারদৃষ্টির সহিত দৃষ্টি মিলাইতে তেমনই কষ্ট বোধ হইল। এ মিথ্যা কলঙ্কের মধ্যে যতটুকু সত্য, যেটুকু কাপুরুষোচিত, তাহাই যে তাহাকে পীড়া দিতেছিল।

সুলেখা নিজেই কথা কহিল। স্থিরস্বরে সে কহিল, "আমি আজ বাড়ী যাচ্ছি। এক দিন তুমি আমায় বলেছিলে, "আমার সম্বন্ধে যদি কিছু শোন, আমায় না জানিয়ে বিশ্বাস করো না।"—আমিও সেদিন তাতে প্রতিশ্রুত হয়েছিলেম। যদিও আজ সকালে যে সকল ঘটনা আমাদের দু'জনেরই সাক্ষাতে ঘটে গেছে, তার পর আর এ প্রতিশ্রুতি রক্ষার আমার কোন প্রয়োজন ছিল ব'লেই আমি মনে করি নে; কিন্তু তথাপি নিজের প্রতিজ্ঞাপালনের হিসাবেই আমি এই শেষবার জেনে যেতে এসেছি, আর জানিয়ে যেতেও এসেছি যে, যা আমি আজ জেনেছি এবং তুমি নিজেও যাহার কিছুমাত্র প্রতিবাদ না করেই মাথা পেতে যাকে স্বীকার ক'রে নিয়েছ, তার উপর আর আমাদের মধ্যে কখনও কোন সম্বন্ধ থাকতেই যে পারে না, সে কথা তুমিও অবশ্য অস্বীকার করবে না এবং আমিও তা করি নে।"

কার এ কণ্ঠ? কার এ ভাষা? এ ভয়ানক কথাগুলা কে আজ এমন অনায়াস-সহজে উচ্চারণ করিতে পারিল? এ কি সেই সুলেখা?

সেই বনচারিণী কপালকুণ্ডলা ? সেই শরীরিণী দয়ামূর্ত্তি ? আবার এই সে দিনেরই সেই ষ্টীমারভ্রমণের সঙ্গিনী, সেই জ্যোৎস্নাজড়িতা স্নেহময়ী, প্রেমময়ী নারী ? আর আজ এ কোন পাষাণী এত বড় নির্ম্মম বাক্য এমন করিয়া মুখের উপর বলিয়া বসিল ? নারীর মধ্যে সর্ব্বত্রই কি দশ-মহাবিদ্যার দশরূপ বিদ্যমান ? কোথাও সে মোহিনী ভুবনেশ্বরী, কোথাও শিববক্ষারূঢ়া করালবদনা কালী ! সুশীল আহত বিস্ময়ে নির্ব্বাক্ হইয়া শুধু চাহিয়া রহিল।

তাহার চোখের সেই ভাষাহীন দৃষ্টি সুলেখাকে পাগল করিয়া দিবার উপক্রম করিল। এতটুকু প্রতিবাদ নাই ? এ লোক যে নিশ্চিত অপরাধী, তাহাতে আবার সংশয়ের স্থান কোথায় আছে ? ওরে নির্ব্বোধ, লোভী সুলেখা ! এখনও তোমার মোহ ঘুচে না ? কত বড় রক্ষাহ যে তুমি পাইয়া গিয়াছ, এখনও সে কথা না ভাবিয়া অতীতের পানে, সেই সাধের স্বপ্নের অতীতের পানেই লুব্ধ চোখে চাহিয়া দেখিতেছ—তোমার কি মরণ নাই ? ছি ছি ছি, তোমার নারীমর্য্যাদার অবমাননা করিয়া ফেলিও না ! এখনও মনকে তোমার দৃঢ় কর।

তখনও সুশীল তেমনই অনড়, তেমনই স্তব্ধ ও নতনেত্র। তাহার পানে বারেক রোষতীব্র দৃষ্টি হানিয়া বিরাগ-শুষ্ককণ্ঠে সুলেখা বলিল, “ত, হ'লে এই শেষ ! তোমার আমার মধ্যে এ জন্মে বোধ হয় আর কখন কোন দিনই দেখা হবে না, তাই যাবার সময় একটা কথা ব'লে যাই, যদি সঙ্গত মনে কর ত শুনো—এর পর যে যতই চেষ্টা করুক, আমি তোমায় বিয়ে করবো না, এটা স্থির !—তাই বলি,—তোমার এখন উচিত, সেই যে মেয়ের তুমি সর্ব্বনাশ ক'রে এসেছ, তাকেই ফিরে গিয়ে বিয়ে করা। আর এ করতে তুমি ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ বাধ্যও।

যদি না কর, জেনো, এ জীবনে ত নয়ই, জন্মজন্মান্তরেও তুমি কখন ঈশ্বরের ক্ষমা পাবে না।—মানুষের ত নয়ই।"

সুলেখার মুখে এই প্রস্তাব উচ্চারিত হইবামাত্রই সুশীল ভীষণভাবে চমকিয়া উঠিয়াছিল। সুলেখার কথা সমাপ্ত হইবামাত্র তাহার সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। তাহার মনে হইল, যেন সত্যই সে অপরাধী—নীলিমার কাছে ঘোরতর অপরাধে অপরাধী। আর এ অপরাধের বিচারক তাহার সম্মুখবর্ত্তিনী ঐ মহিমময়ী নারীমূর্ত্তি—ঐ সুলেখাই। এই কঠোর দণ্ডাদেশ সে স্তব্ধ থাকিয়া শুনিল, একটা ক্ষীণ প্রতিবাদও তাহার কণ্ঠ, তাহার জিহ্বা উচ্চারণ করিতে সমর্থ হইল না। তাহার মনে হইল, এ আদেশ যেন অলঙ্ঘ্য, ইহার পরিবর্ত্তন যেন কোন কালে কাহারও দ্বারা আর কখন হইতেই পারে না।

সুলেখা এবার মুখ ফিরাইল। চলিয়া যাইতে উদ্যতা হইয়া পুনশ্চ একবার সে ফিরিয়া দাঁড়াইল। দেখিল, সুশীল তখনও যেমন তেমনই একই ভাবে বসিয়া আছে। দেখিল, তাহার নাসিকা স্ফীত, চুল রুক্ষ, মুখ শুষ্ক, দৃষ্টি যেন পৃথিবীর কোন পরপারে ভাসিয়া চলিয়া গিয়াছে, এমনই তাহা বিকল ও বিপর্য্যস্ত। অসীম করুণার বন্যাধারার প্রচণ্ড বেগ সে নিজের অন্তরের মধ্যে সেই মুহূর্ত্তেই যেন অনুভব করিল। তাহার মনপ্রাণ উচ্চরবে কাঁদিয়া উঠিয়া ঐ লাঞ্ছিতকে, লজ্জিতকে বুকে করিয়া ক্ষমা দান করিতে ছুটিয়া যাইতে চাহিল। কিন্তু না, তাহাতে যে অপরাধের প্রতি অবিচার করা হইবে। নীলিমা আজ ইহার জন্য কলঙ্কলাঞ্ছিতা, ধর্ম্মবিচ্যুতা, স্বজন ও সমাজত্যক্তা, এখনও হয় ত ইহার প্রতীকার আছে, কিন্তু আর বিলম্ব হইলে একটি জীবন হয় ত চিরদিনের মতই দুরবস্থার চরমে গিয়া পৌঁছিবে। না জানি, সে অভাগীর শেষ পরিণাম কত বড় ভীষণাকারই না ধারণ করিতে পারে।

না—না—সুলেখা! নিজের ক্ষতিকে গ্রাহ্য করিও না। নিজেকে না হয় জন্মের মতই বিসর্জ্জন দিয়া দাও। অত্যাচারিতা নীলিমাকে তাহার অবশ্যপ্রাপ্য অধিকার ফিরাইয়া দিতে যদি তোমার বুকের একখানা পাঁজরা খসাইয়া দিতে হয়, তাও দিয়া ফেল। অপরাধীকে ক্ষমা করিও না।—তাই হোক্, তাই হোক্, দণ্ড তাহার মাথায় তুলিয়া দিয়া তাহাকে তাহার সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য করিতে নিশ্চয়ই সে বাধ্য করিবে, এই তাহার পণ। নারী হইয়া নারীমর্য্যাদাকে সে পদদলিত হইতে দিতে পারিবে না।—না, কখনই না। তাহা করিলে সতী নারীর রক্ত তাহার মধ্যে কলুষিত হইবে যে।

মুহূর্ত্তকালমধ্যেই তাহার করুণাধারা মরুবালুমধ্যে ক্ষীণ জলধারার মতই বিলুপ্ত হইয়া গেল,—ক্ষমা!—কাহাকে সে ক্ষমা করিবে? বিশ্বাসহন্তা চরিত্রহীনকে? সুশীল তাহার সঙ্গেই বা কি ব্যবহার করিয়াছে? অতবড় অন্যায় করিয়া আসিয়া অনায়াসে তাহার মন লইয়া খেলা করিতে সে দ্বিধা বোধ করে নাই! ছি ছি! না, কখনই না।—সুলেখা ফিরিল।

"লেখা! লেখা!—শুনে যাও—আমায় অবিচারে এত বড় দণ্ড দিয়ে চিরদিনের মতন চ'লে যেও না—আগে ভাল ক'রে একবার সকল কথা শোন, বিচার ক'রে দেখ।"

সুশীলের আর্ত্তস্বর সমস্ত জড়প্রকৃতিকে কাঁদাইয়া ঘরের মধ্যে তীব্র ক্রন্দনের সুরে প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল।—আর তাহা সুলেখার বুকের মধ্যেই কি হইল না? কিন্তু তথাপি সুলেখা দাঁড়াইল না, আর একবার সে ফিরিয়াও চাহিল না, কঠিন আদেশের স্বরে সে শুধু চলিয়া যাইতে যাইতে বলিয়া গেল—"বিচার আমি করেছি। নীলিমাকে তোমার বিয়ে করতেই হবে। আর তা যদি কর, তবেই আমার কাছে ও

ঈশ্বরের কাছে তুমি ক্ষমা পাবে, এ না হ'লে কখনও তা পাবে না, এ কথা নিশ্চিতরূপে জেনে রেখ।”

এই বলিয়া সুলেখা চলিয়া গেল। হতবুদ্ধি সুশীল মুহ্যমানবৎ পড়িয়া রহিল।

অষ্টত্রিংশ পরিচ্ছেদ

নালিমার জীবনের সকল আশার অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই তাহার জন্য যে চিত্তাসজ্জা হইতেছিল, অকস্মাৎ স্বর্ণলতা নিজের জীবনকে তাহাতেই আহুতি প্রদান করিলে অনুকূলের গৃহে একটা ভয়ঙ্কর বিপ্লব ঘটিয়া উঠিল। এই মৃত্যুসংবাদটা অতর্কিত রাষ্ট্র হইয়া পড়ায় বিবাহটা কোনমতেই আর ঘটিয়া উঠিতে পারিল না। পাড়ার লোকের মধ্যে জানাজানি হইতে আর কিছুই তখন বাকি ছিল না, দেখিতে দেখিতে ঘরে ঘরে তীব্র আলোচনা আরম্ভ হইল এবং পাড়ার এক রসিকা ঠান-দিদি এতদুপলক্ষ্যে ছড়া কাটিতে বসিয়া গেলেন—

"দুই বারেও হলো নাকো পতি-সম্মিলন
পোড়া বিধি এই দিলে কপাললিখন।" ইত্যাদি

সন্ধ্যার পূর্ব্বে মড়া উঠিল না। জন কয়েক হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ যোগাড় করিয়া অনুকূল স্বর্ণলতার কাঁটা মাত্র সার শবদেহটাকে বাঁশে বাঁধিয়া তীরস্থ করিতে পাঠাইয়া দিল, নিজে সঙ্গে গেল না, গেলে শূন্য গৃহ আগলাইবে কে? নীলিমাকে কেহ না ডাকিতেই সে আপনি উঠিয়া শব-বাহীদের সঙ্গ লইল।

গভীর রাত্রিতে চিতা নির্ব্বাপিত হইল। শবদাহকারীরা অর্দ্ধ-দগ্ধাবস্থায় শব ফেলিয়া বাড়ী ফিরিতে উদ্যত হইলে, নীলিমা তাহাদিগকে বাকি কার্য্যটুকু সমাধার জন্য বিস্তর মিনতি করিল; কিন্তু সেই সব নীচ চরিত্রের হৃদয়হীন লোকরা তাহার অনুনয়ে কর্ণপাত করিল না, কেহ ভদ্রভাবে, কেহ অভদ্রভাবে হাসিয়া, ব্যঙ্গ করিয়া, অসমাপ্ত-শবদাহ

ফেলিয়া প্রস্থান করিল। কেবল একজন মাত্র নীলিমার সম্পূর্ণ অচেনা লোক সঙ্গীদের আহ্বান উপেক্ষা করিয়া চিতাগ্নিমধ্যে কাষ্ঠখণ্ড নিক্ষেপ পূর্ব্বক দাহকার্য্য সমাধা করিতে মনোযোগী হইল, সেই শুধু গেল না।

স্বর্ণলতার চিরজ্বালাময় জীবনের সকল চিহ্ন নিশ্চিহ্ন করিয়া দিয়া, তাঁহার চিতাচিহ্ন নিঃশেষে ধুইয়া ফেলিয়া নীলিমা শুষ্ক চোখে নদীগর্ভে নামিয়া স্নান করিল। ডুব দিবার সময় তাহার মনে হইল, এই সুশীতল জলতল হইতে মাথাটা আর না তুলিলেই ত এখনই সবকিছু চুকিয়া যাইতে পারে? কি প্রয়োজন আর তাহার এখান হইতে উঠিবার? পৃথিবীর তপ্তবক্ষ হইতে এই নদীগর্ভ কত শান্ত, কতই শীতল! আঃ!—প্রবল লোভ তাহাকে সবলে আকর্ষণ করিতে লাগিল।

একবার সে অনেকক্ষণ জলতলে ডুবিয়া রহিল, কিন্তু তাহাতে তাহার অত্যন্ত ক্লেশ বোধ হইতেছিল, বুকে একটা বিষম চাপ যেন সবেগে ঠেলিয়া উঠিতে লাগিল। কেবলই হাঁপাইয়া ভাসিয়া উঠিতে ইচ্ছা হয়। না, ডুবিয়া মরা বড় সহজ নহে, এ বড় যন্ত্রণাকর মৃত্যু! যন্ত্রণার হাত হইতেই যে সে মুক্তি চায়। তাহার পর আরও একটা কথা—নারী সে, মরিলেও সে দেহ নারীদেহ। কোথায় কি ভাবে ভাসিয়া গিয়া সে দেহটা কোথাকার কূলে লাগিবে, জলপুলিসে সেটা না জানি কি অবস্থায় টানিয়া তুলিবে। মুর্দ্দাফরাসে হাঁসপাতালে লইয়া গিয়া সেটাকে চিরিবে ফাঁড়িবে। তাহার পর কোথায় ফেলিয়া দিবে না কি করিবে। তার উদ্দেশ্যে কতই হয়ত তীব্র ব্যঙ্গোক্তিসকল বর্ষিত হইবে! না, তাহার অপেক্ষা ত কেরোসিনে পুড়িয়া মরাই শ্রেয়ঃ! এমন করিয়া আগুন ধরাইবে যে, যাহাতে নিজের আগুনেই তার সমস্তটুকু ভস্ম হয়। কাহারও কিছু আর করিবার বাকি থাকে না।

নীলিমা যেন এইবার একটা পথ পাইয়া জল হইতে উঠিয়া আসিল।

নদীতারে কেহ কোথাও নাই। রাত্রির সঙ্গী ব্রাহ্মণটির স্নান শেষ হইয়াছিল, বলা যায় না, কি উদ্দেশ্যে সে তখন কোথায় গিয়াছে। নীলিমা কিন্তু ইহাতে বড় স্বস্তিই বোধ করিল। জনসঙ্গ তাহার পক্ষে এখন যেন বিষ খাওয়ার অপেক্ষাও তিক্ততর ঠেকিতেছিল।

নদীতীর ধরিয়া সে চলিতে আরম্ভ করিল। যে দিক হইতে তাহারা আসিয়াছিল, তাহার বিপরীত পথে চলিল। বাড়ী ফিরিবার কথা মনে পড়িতেই আতঙ্কে ও ঘৃণায় তাহার সমস্ত দেহ-মন কুঁকড়াইয়া যেন এতটুকু হইয়া গেল। সেই বাড়ীতে আবার সে ফিরিবে? কেন— কিসের লোভে? লোকে নিন্দা করিবে? হয়ত কত দুর্ণামও রটিবে? তাহাতেই বা তাহার ক্ষতিবৃদ্ধি কি? সে ত মরণপথেরই যাত্রী। সে মরিতেই বসিয়াছে, তাহার আবার লোকলজ্জা, মান, ভয় কিসের?

নীলিমা লক্ষ্যহীন হইয়াও শুধু নদীতীর লক্ষ্য ধরিয়াই বহুপথ অতিক্রম করিল। ইহার মধ্যে প্রথম দিকে দুই একখানা ক্ষুদ্র বস্তি ভিন্ন কোথাও অপর কোন লোকালয়ের চিহ্ন সে দেখিতে পাইল না। নদীর গায়ে চর পড়িয়া গ্রীষ্মকালের প্রচণ্ড রোদ্রে বালিরাশি ধূধূ- ধূধূ করিতেছে; তাহার অনেক দূরে প্রায় নদীমধ্যভাগে অতি শীর্ণ ক্ষীণ জলরেখা সূর্য্য-করোজ্জ্বল শুক্তিমাল্যের মতই তাহা শুভ্র দেখাইতেছে। শ্রান্ত পক্ষী বহু দূর হইতে উড়িয়া আসিয়া চঞ্চু ডুবাইয়া জল পান করিল; চরণশীল গাভী মহিষ দল বাঁধিয়া চড়া ভাঙ্গিয়া জলে অবগাহন করিতে গেল, বস্তির নিকটে কৃষকপল্লীর পল্লীবধূ বালিকা ও গৃহিণীগণ ঘট-কক্ষে স্নানার্থী হইয়া যাতায়াত করিতে লাগিল নীলিমা মুগ্ধনেত্রে চাহিয়া রহিল। ক্রমে প্রখর রৌদ্রতেজে প্রবল পশ্চিমে বাতাসে তপ্ত বালি যেন ঝাঁকে ঝাঁকে অগ্নিবাণের মতই নীলিমার সর্ব্বদেহের উপর উপর আসিয়া পড়িতে লাগিল। তৃণশূন্য বালুকাময় মৃত্তিকা তাহার নগ্নপদ ঝলসিত করিয়া দিল। তখন ক্ষুৎপিপাসায় শ্রান্ত-

ক্লান্ত এবং রৌদ্রতাপে অবসন্ন হইয়া সে একটা সুবৃহৎ তুঁত গাছের তলায় বসিয়া পড়িল। তাহার মনে হইল, যেন অন্ততঃ বিশ ক্রোশ পথও সে আজ অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে। আর একটী পাও হাঁটিতে গেলে সে যেন সেইখানে মুখ থুবড়াইয়া পড়িয়া যাইবে। নীলিমার বুক ফাটিয়া এক ফোঁটা হাসি তাহার শুকনো ঠোঁটের কোণে ফুটিয়া উঠিল। যে মরণকেই খুঁজিয়া বেড়াইতেছে, তাহার পক্ষে এইরূপেই তাহার সাক্ষাৎ লাভে লোকসান কি?—কিন্তু যুক্তির সহিত মন সব সময়ে ঠিক আপোষ করে না। অগত্যাই তাহাকে সেই ছায়া-সুশীতল বৃক্ষতলাশ্রয়ী হইতে হইল।

আহা, কি সুমিষ্ট ঐ বাতাসটুকু! কি শীতল এই ছায়া। গাছের উপর গলায় চিত্রকরা কয়েকটা চন্দনা কিচির-মিচির শব্দ করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, নীলিমার মনে হইল—কি সুন্দর তাহাদের রূপ! আহা, ইহার একটিকে ধরিতে পারিলে—আবার সেই দুঃস্বপ্নদীর্ণ বক্ষের তীব্র ব্যঙ্গ হাস্য! হ্যাঁ মরণের উপযুক্ত সঙ্গী বটে!

সহসা মৃত্যু-চিন্তাকে অন্তরাল করিয়া দিয়া বাঁচিয়া থাকার সাধ দেখা দিল। সহসা তাহার মনে হইল, মরণেরই বা তাহার এত কি প্রয়োজন ঘটিয়াছে? জগতে এত লোক, সকলেরই যদি বাঁচিয়া থাকিবার অধিকার থাকে, তবে সেই কি শুধু তাহা পাইবে না? কেন? কিসের অপরাধে?

অপরাধ খুঁজিতে গিয়া কিছুই সে কোথাও খুঁজিয়া পাইল না। এক মস্ত বড় অপরাধ সে করিয়াছে বটে, তাহা কৃপণের ঘরে, হিন্দুর ঘরে, গরীবের ঘরে কন্যা হইয়া জন্মান। ইহাকে যদি অপরাধ বলিতে হয়, তবে এ অপরাধের হয় ত এই-ই যোগ্য প্রায়শ্চিত্ত! কিন্তু এ পাপের জন্য সে ত নিজেই দায়ী নহে। যে পিতৃকর্ত্তব্য-

বিচ্যুত নিহৃদয় পিতা তাহাকে এ পৃথিবীতে আনিয়াছে, তাহার দায়ী সে। যে পিতা সন্তানকে কেবলমাত্র নিজের পোষা জানোয়ারের মতই খোঁয়াড়ে বাঁধিয়া রাখিয়া চারিটি চারিটি আহার্য্য—তাহাও সহস্রবার খোঁটা দিয়া—প্রদান মাত্রেই পিতৃ-কর্ত্তব্য সমাধা করে, সন্তানের কোন শিক্ষা, কোন উন্নতির জন্য কোন দিন এতটুকু চিন্তা পর্য্যন্ত করে না, যাহার নিজের জীবনই পশুজীবন হইতে সামান্যমাত্র বিভিন্ন—তাহাকে সন্তানজননের অধিকার দেওয়া সামাজিক দুর্ব্বলতা—সমাজের পক্ষে তাহা মহা পাপ। সে জন্য আর যে দায়ী হয় হোক, সে প্রায়শ্চিত্ত কেন সেই সন্তানকেই শুধু করিতে হইবে? এ বিড়ম্বনার কি কোন প্রতীকার নাই? কেন সেই অপরের কৃত অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত করিতে মরিতে হইবে তাহাকে? নির্দ্দোষ—নিরপরাধ—সবেমাত্র এই আঠার বৎসর বয়স—এই কি তাহার মরিবার সময়? না, সে মরিবে না—মরিতে পারিবে না।

নীলিমার মরণপ্রত্যাশী নিশ্চিন্ত হৃদয় এইবার সভয় সন্দেহে সঘনে দুলিয়া উঠিল। আচ্ছা না হয় সে নাই মরিল! কিন্তু বাঁচিতে হইলে ত তাহার একটা আশ্রয়েরও প্রয়োজন আছে।—যদি বাঁচিতেই হয়, তাহা হইলে সে কোথায় দাঁড়াইয়া বাঁচিবে? এমন করিয়া পথে পথে ঘুরিয়া মরিলে ত মরণের বাড়া দুর্দ্দশা ঘটাও তাহার পক্ষে অসম্ভব নয়। তাহার মতন বয়সে ও রূপে যে অনেক বিপক্ষপক্ষের হস্তে লাঞ্ছিত হওয়ার সম্ভাবনা জগতে বর্ত্তমান আছে, সে কথা তো তাহার অজানা ছিলনা। তবে যাইবে সে কোথা! পিতৃগৃহে?—পিতার কথা স্মরণে আসিতেই সভয়ে সে একবার তাহার সেই রৌদ্রতপ্ত নির্জ্জন প্রান্তরের চারিদিকে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিল। না, কেহ কোথাও নাই। প্রচণ্ড মধ্যাহ্নসূর্য্য যেন চারি দিকে পীতাভ অগ্নি-

শিখা প্রজ্বালিত করিয়া দিয়া পৃথিবীকে যেন দগ্ধীভূত করিতেছিলেন, কাহার সাধ্য নিজ নিজ আশ্রয়ের বাহির হয়!

নীলিমার মনে হইল, এখন যদি তাহার বাপের সঙ্গে তার চোখো-চোখি হইত ত নিশ্চয়ই সে তখনই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া যাইত। বাপের বাড়ীর অপেক্ষা যমের বাড়ী যাওয়া তাহার পক্ষে খুবই কঠিন নয়; বরঞ্চ অনেকই সহজ এবং নিঃসন্দেহ শান্তিকরও। মরিবার জন্যই বরং সেখানে যাওয়া চলে, বাঁচিবার জন্য নহে।

সারাদিন সে সেই গাছের তলায় বসিয়া বসিয়া ভাবিল। ক্রমে তাহার চিন্তাশক্তিও যেন লুপ্ত হইয়া আসিতে লাগিল। অবসাদগ্রস্ত, শোকাকুল ও ক্ষুৎপিপাসাতুর শরীর-মন কেমন একটা নেশার ঘোরে যেন আচ্ছন্ন হইয়া আসিয়া তাহার সমস্ত চেতনাকে অপহরণ করিয়া লইল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে সংজ্ঞাহীন থাকিয়া কাটাইয়া আবার সন্ধ্যার বাতাসে রৌদ্রতপ্ত লতার মতই কাহারও শুশ্রূষা ব্যতিরেকেও আপনা আপনি সুস্থ হইয়া উঠিয়া বসিল।

তখন নির্জ্জন নদীতীরে সন্ধ্যালোক স্ফুটতর হইয়া উঠিয়াছে। নদীর তীর, তীর-বালুকা, জলধারা, পরপার সব একই অন্ধকাররাশির মধ্যে বিলীন হইয়া গিয়া একমাত্র অন্ধকারই সর্ব্বত্র অভেদ্য ও অবিচ্ছিন্ন হইয়া আছে। মধ্যে মধ্যে প্রবল ঝিল্লীরব এবং শৃগালের সমুচ্চ চীৎকারধ্বনি না থাকিলে সমস্ত জগতের জীবিতচিহ্ন এই অমিশ্র অন্ধকারে বুঝি বা খুঁজিয়া পাওয়াই ভার হইত। নীলিমার পায়ের তলা দিয়া কি যেন একটা খস্-খস্ শব্দ করিয়া চলিয়া গেল। সেই খস্ খস্ শব্দে তাহার সদ্য চেতনাপ্রাপ্ত দেহ শিহরিয়া উঠিল। চমকিয়া সে উঠিয়া বসিল। উঠিতে গিয়া নিজের শরীরের দারুণ দুর্ব্বলতা অনুভব করিয়া সে বিস্মিত এবং কিছু ভীতও হইল। এই শরীরকে টানিয়া তুলিয়া বহিয়া লইয়া আর কি

কখন সে লোকালয়ে পৌঁছিতে পারিবে? সম্ভব ত মনে হয় না। অথচ এক ফোঁটা জল না পাইলে আর ত বাঁচিবার কোন উপায়ই তাহার নাই। মাথার উপর গাছের ডালে কয়েকটা বাদুড় ঝুলিতেছিল, তাহারা ঝপ্-ঝপ্ করিয়া ডানা ঝাড়া দিল ও উড়িয়া গেল। একটা কালপেঁচা শ্রুতিকঠোর তীক্ষ্ণস্বরে চীৎকার শব্দ করিয়া উঠিল। একটা শৃগাল কাছ দিয়া যাইতে যাইতে বারেক দাঁড়াইয়া পড়িয়া নীলিমাকে আঘ্রাণ করিয়া গেল, জীবিত প্রাণী জানিয়া চকিতে ছুটিয়া পলাইল। মহাভয়ে নীলিমা তখন স্খলিতপদে উঠিয়া অতিকষ্টে এক পা এক পা করিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল। মরণ যখন দূরে থাকে, আলেয়ার আলোর মতনই তখন তাহা অতি উজ্জ্বল মনে হয়, হৃদয়কে সে আকৃষ্ট করে; কিন্তু তাহার সহিত সাক্ষাৎসম্বন্ধে আসিতে হইলে বীরের প্রাণ চাই।

কখনও বসিয়া, কখনও চলিয়া অনেকখানি পথ অতিক্রম করিবার পরও যখন কোন লোকালয় পাওয়া গেল না, তখন হতাশা ও অবসন্নতা মিলিয়া নীলিমার হাতপাগুলা অসাড় করিয়া দিল। সে তখন জীবনের আশামাত্র বিসর্জ্জন দিয়া সেইখানেই ঘাসের উপর শুইয়া পড়িল; এবং তৎক্ষণাৎ অবসাদপূর্ণ গভীর নিদ্রা আসিয়া তখনকার মতন তাহার সকল যন্ত্রণারই অবসান করিয়া দিল।

ঘুম ভাঙ্গিল পরদিন সূর্য্যের আলো চোখে পড়িয়া। সুপ্তিভঙ্গে অনেকখানি সুস্থদেহে সে অভ্যাসমত উঠিয়া বসিতেই তাহার বিস্মিত দৃষ্টিতলে এক অপরূপ দৃশ্য প্রতিভাত হইল।

যেখানে সে শুইয়া ছিল, তাহারই ঠিক পার্শ দিয়া নদীর গতি বক্র হইয়া গিয়াছে। নদীজল সেখানে কিছু গভীর এবং তীরদেশ সজল শ্যামল তৃণশষ্পাবৃত। ধূধূ মরুবৎ বালুকারাশি পরপারে সাদা চাদর

বিছানোর মতই স্থির পড়িয়া আছে। অদূরে একটা কৃষ্ণচূড়ার গাছ। আপাদ-মস্তক তাহার রক্ত পুষ্পে ভরিয়া আছে; নীল-আকাশের নীচে শ্যাম পত্রাবলীমধ্যে তাহার সে লোহিত শোভা বৈচিত্র্যময় ও সুন্দরতম!

নীলিমা নিজের দেহপ্রতি নেত্রপাত করিল। তাহার অঙ্গে আজও সেই বিবাহরাত্রে পরিধৃত রক্তবস্ত্র রহিয়া গিয়াছিল। সে রাঙ্গা রং আজ অযত্নে অবহেলায় মলিন হইয়া গিয়াছে, যেন কত দিনেরই পুরাতন। তাহারও মনে হইল, সে রাত্রিটা যেন কত—কত কালই পূর্ব্বে অতীত হইয়া গিয়াছে! তাহার সেই দাহময় অথচ মধুমাখা স্মৃতি—এ জীবনে যে স্মৃতির আগুন কখন তাহার বক্ষ হইতে নিবিবার নহে; যে স্মৃতির সুধা তাহার এই মৃত্যুবাণাহত বজ্রাগ্নিদগ্ধ হৃদয়কে অমৃতনিষেকে জীয়াইয়া রাখিয়াছে, সেই ভীষণ মধুর রাত্রি সে যেন কোন্ এক যুগযুগান্তরের অবিস্মৃত স্মৃতিমাত্র! নীলিমা যেন তাহার পর হইতে কত জন্মজন্মান্তর ধরিয়াই এই প্রকার গৃহহীন, লক্ষ্যহীন, আশাহীন জীবন-তরণী মহাকালস্রোতে ভাসাইয়া দিয়া অনির্দ্দিষ্ট পথে অহোরাত্রই ভাসিয়া চলিয়াছে; ইহার শেষ কোন দিনই যেন সে খুঁজিয়া পায় নাই—এবং বুঝি বা পাইতে চাহেও নাই।

সুশীলের কথা এ দুই দিনে নীলিমার অনেকবার বারে বারেই মনে হইয়াছে। কিন্তু এযাবৎ সে বিষয়টাকে সে ক্রমাগতই তার মন হইতে সযত্নে বিদায় দিবারই চেষ্টা করিয়া আসিয়াছে। মন যখন তাহাতে বড়ই পীড়িত ও একান্ত ক্লান্ত বোধ করিতেছিল, সে তাহাকে তখন এই বলিয়া কখন ধমক দিয়া কখন বা মিনতি করিয়া নিবৃত্ত করিতে চাহিতেছিল যে, সে তোমার কে?—তুমি গরীবের মেয়ে, সে ধনীর সন্তান! তাহার সঙ্গে তোমার কি সম্বন্ধ? বামন হইয়া কে কবে

আকাশের চাঁদ ধরিতে পারিয়াছে?—আজ এখনও সে সেই যুক্তিই প্রয়োগ করিয়া নিজেকে তাহার সেই একান্ত ক্লেশজনক—সেই অত্যন্ত সুখকর চিন্তা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। সূর্য্যতাপ প্রখর হইবার পূর্ব্বেই আজ তাহাকে একটা আশ্রয়ের সন্ধান করিতে হইবে। আবার জীজীবিষা তাহার মনে প্রবল হইয়া দেখা দিল। নদীতে নামিয়া স্নানাদি সম্পন্ন করিয়া সে অঞ্জলিপূর্ণ জল পান করিল, কিন্তু তিন দিনের উপবাসের পর সে জল তাহার পেটে থাকিল না—বমন হইয়া গেল। তখন আবার সেই দুর্ব্বল চরণ কোনমতে কূলে উঠাইয়া সম্মুখ লক্ষ্যে পুনরপি সে চলিতে আরম্ভ করিল।

কি অসীম এ যাত্রাপথ! ইহার কি কোথাও সমাপ্তি নাই? এ কি তাহার মহাযাত্রা? নীলিমা যে আর পারে না। তাহার পা যে টলিতে লাগিল, মাথা যে ঘুরিতে লাগিল, চক্ষুর সম্মুখে খর রৌদ্র-জাল যেন ধোঁয়ার মত ধূসর, মেঘের মত নিকষ কালো হইয়া আসিতে লাগিল। তথাপি সেই চলার আর বিরাম নাই।

দ্বিপ্রহরে অগ্নিতপ্ত ধূলাবালি উড়াইয়া প্রবলবেগে ঝড় বহিতে আরম্ভ করিল। যেন শতধারে তীক্ষ্ণ শরাঘাত সর্ব্বাঙ্গ তার ভেদ করিয়া দিতে লাগিল। ক্ষণে ক্ষণে পতনোন্মুখী হইয়াও শুষ্ককণ্ঠে দগ্ধপদে ঘর্ম্মাক্ত দেহ টানিয়া লইয়া চলিল, তখনও নীলিমা গতি বন্ধ করিল না। কিন্তু—এইবার আর যে চলিবার শক্তি নাই! আর বুঝি বাঁচা হইল না! এইবার বুঝি সব শেষ!—সুশীল!—সুশীল!—

অদূরে ঐ না একটা বাড়ী! ধূলিমেঘজাল ভেদ করিয়াও তাহার উজ্জ্বল রাঙ্গা ·বং ঐ যে সুস্পষ্টতর দেখা যাইতেছে না? না, না, চলিতেই হইবে—বাঁচিতেই হইবে—বাঁচিয়া থাকিলে হয় ত—হয় ত কখনও না কখনও দেখা হইলেও হইতে পারে। একবার—একবার—

এক নিমেষের দেখা—আর একটিবার—জন্মের শোধ একটিবার—না না, আর দেখা নয়—না না—আর বাঁচা নয়—না না, আর চলা নয়—আর পা উঠিতেছে না—দেহ বহিতেছে না—আর বাঁচিবার উপায় নাই—কোনই উপায় নাই—ওঃ, সুশীল !—সুশীল !—সুশীল !

নীলিমার সংজ্ঞাহারা অচেতন দেহ দেখিতে দেখিতে সেই অগ্নিতপ্ত মাটীতে লুটাইয়া পড়িল। তাহার উপর দিয়া দুরন্ত গ্রীষ্মের আগুনে ঝড় উদ্দাম ভাবে তপ্ত বালুকারাশি উড়াইয়া হাঃ হাঃ শব্দে অট্টহাস্য করিতে লাগিল, তাহার মাথার উপর কেবলমাত্র পরিশ্রান্ত চিলের আর্ত্তস্বর কদাচিৎ এক একবার ভাসিয়া উঠিতে লাগিল। এভিন্ন আর কেহ কোথাও তাহার এ ভয়াবহ অবস্থার সাক্ষীমাত্র থাকিল না।

ঊনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

ইহার পর নীলিমা যখন চোখ চাহিল, তাহার বিস্মিত দৃষ্টি তখন স্বপ্নাভিভূতের ন্যায় দৃষ্ট পদার্থের প্রকৃত স্বরূপকে সম্যক্‌রূপে ধারণা করিতেই পারিল না। চারিদিকেই তাহার যেন সমুদয়কেই অজানা অচেনা বলিয়া বোধ হইল। সে কোথায় ছিল? কোথায় আসিয়াছে? কেমন করিয়া এখানে আসিল? এ সকলের কোন ধারণাই যেন তাহার মনে ছিল না, মনে করিতে চেষ্টা করিল—কিন্তু সবই যেন শূন্যময়! কিছুতেই কিছু মনে পড়িল না। অগত্যা সে চেষ্টা ত্যাগ করিয়া সে নিঃশব্দে পড়িয়া রহিল।

এক জন হিন্দুস্থানী 'দাই' তাহার পরিচর্য্যা করিতেছিল, নীলিমা তাহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিবে মনে করিল, কিন্তু কি ভয়ানক তার দুর্ব্বলতা! এমন কি বাক্যস্ফুরণের সামর্থ্যটুকুও তার মধ্যে বর্ত্তমান ছিল না। ঠোঁট তাহার নড়িল কি না, বুঝা গেল না, শব্দ যে বাহির হয় নাই, তাহা নিজেও সে বুঝিয়াছিল।

আরও কয়েকটা দিন গেল। ক্রমে তন্দ্রার ঘোর কাটিয়া আসিতে লাগিল, ভীষণ দুর্ব্বলতা অতি অল্পে অল্পে হ্রাস পাইতে লাগিল। এখন চোখ চাহিতে আর ততদূর ক্লেশ বোধ হয় না, কানেও সে কিছু কিছু শুনিতে পায়। শুশ্রূষাকারিণীর সহিত দুই একটা কথাও বলিয়া থাকে, কিন্তু দুই একটা শব্দের অধিক এক-সঙ্গে উচ্চারণ করিতে পারে না। এইবারে সে দেখিল, প্রাতে ও অপরাহ্নে একটি বর্ষীয়সী মহিলার সহিত এক জন তরুণবয়স্ক পুরুষ

তাহার কক্ষে প্রত্যহই আগমন করিয়া থাকেন—উভয়েই তাহার শরীর পরীক্ষা করেন। শুশ্রূষাকারিণীকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ও উপদেশ প্রদানান্তর প্রস্থিত হয়েন। মহিলাটি প্রায়ই একটি সুগন্ধি পুষ্প আনিয়া নীলিমার রোগ-শয্যার উপর স্থাপন করেন, বিদায়কালে তাহার মুখের দিকে সস্নেহ দৃষ্টিতে চাহিয়া কোন দিন একটু স্নেহ জানাইয়া যান। তাঁহারা চলিয়া গেলেও নীলিমা বহুক্ষণাবধি তাঁহাদের প্রস্থানপথের অভিমুখে নির্নিমেষে চাহিয়া থাকে। এই শান্ত সৌম্য-মূর্ত্তি নারীর মধ্যে যেন তাহার দুরন্ত স্নেহ-ক্ষুধা অনেকখানি প্রশমিত হইয়া আইসে। তাহার শুষ্ক জ্বালাময় নেত্রে অশ্রুর ঈষৎ আভাস অকস্মাৎ দেখা দেয়, তাহার প্রায়-রুদ্ধ চিত্তে সুদূর অতীতের স্মৃতির মতই ক্ষীণভাবে জাগিয়া উঠে তাহার মা'র কথা।

ক্রমে নীলিমা সুস্থ হইয়া উঠিয়া বসিল। এখন তাহার সব কথাই মনে পড়িতেছিল। তাহার মনে পড়িল, সে মরণের খুব নিকটবর্ত্তীই হইয়াছিল, কিন্তু আবার সেখান হইতে ফিরাইয়া তাহাকে বাঁচাইল কে?

যে দিন ঘরের মধ্যে দুই এক পা করিয়া নীলিমা হাঁটিয়া চলিয়া বেড়াইতে পারিল, সেই দিন যথানিয়মে সেই পুরুষ ও বর্ষীয়সী মহিলা তাহাকে দেখিতে আসিয়া অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিলেন। ইঁহারা যুরোপীয়, সম্বন্ধে ভাইবোন, জাতিতে আইরিশ,—মহিলাটি এই স্থানের ব্যাপটিষ্ট মিশনের প্রধান কর্ত্রী। অপর জন সুদূর সিন্ধুপ্রদেশে পাদরীর কার্য্য করেন, ভগ্নীর অসুস্থতা সংবাদে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন।

মিস্ ওকবর্ণ অতি মধুর স্বরে ভাঙ্গা বাঙ্গালায় বলিলেন, "বাছা! তুমি যে জীবন পাইলে, এ শুধু দয়াময় ঈশ্বরেরই ইচ্ছা বলিয়া জানিও।

এরূপ অসম্ভব ঘটনা যীশাস-ক্রাইষ্টের সময়েই শুধু তাঁহারই দ্বারায় সম্ভব হইযাছিল।"

মিষ্টার ওকবর্ণ বিস্ফারিত নেত্রে মন্তব্য করিলেন, "অসম্ভব সত্য।"

নীলিমা কিছুই না বুঝিয়া হতবুদ্ধিভাবে ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, "আমায় কে বাঁচালে?"

মিস্ ওকবর্ণ উর্দ্ধে চাহিয়া মুদিত নেত্রে উত্তর করিলেন, "নিশ্চয়ই ঈশ্বর!"

মিষ্টার ওকবর্ণ সঙ্গে সঙ্গে মাথা নাড়িয়া সায় দিয়া গেলেন, "তাহাতে কোনই সংশয় নাই।"

নীলিমা যখন ঘটনাটার আদ্যোপান্ত শুনিল, তখন ইঁহাদের বিশ্বাসের সহিত তাহাকেও একমত হইতে হইল। না হইয়া যেন আর কোন উপায় রহিল না। সেই জনমানবপরিশূন্য মরুবৎ স্থানে তপ্ত বালুকা ঝড়ের মধ্যে শোকাহতা, লাঞ্ছিতা, ক্ষুৎপিপাসাতুরা, অনাথা বালিকার আসন্ন মরণের ঠিক সন্ধিস্থলে কে আর এই বিদেশী পুরুষকে অকস্মাৎ প্রেরণ পূর্ব্বক তাহাকে জীয়াইয়া তুলিবার ব্যবস্থা করিলেন? যদি তিনি ঈশ্বর নাই হয়েন? যে করুণা নীলিমা তাহার কোন স্বদেশীর নিকট, এমন কি, নিজের বাপের কাছেও কোন দিন পায় নাই, সেই সংসারের সার, সুধাসমুদ্রের তরঙ্গস্বরূপ করুণাধারা কে আর এই বৃদ্ধা বিদেশিনীর অন্তরে প্রেরণ পূর্ব্বক তাঁহাকে সযত্নে নিজগৃহে তুলিয়া আনিয়া সুচিকিৎসার ও সযত্ন শুশ্রূষায় পুনর্জীবনের সহায়তা করিল? নীলিমার নিমীলিত নেত্র দিয়া প্রবলবেগে কৃতজ্ঞতার অশ্রুধারা ঝরিয়া পড়িল। সে সহসা সেই সেবাব্রতধারিণীর পদতলে নতজানু হইয়া অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে গদ্‌গদ স্বরে কহিয়া উঠিল, "আপনি আমার মা, আপনার আমি চিরদাসী হয়ে থাকবো।"

মিস্ ওকবর্ণের নেত্রও জলপূর্ণ হইয়া আসিল, তিনি তাঁহার স্বভাবমধুরভাবে নীলিমার মস্তকে পৃষ্ঠে স্নেহ-হস্ত বুলাইয়া স্মিতমুখে কহিলেন, "নিশ্চয়ই! তুমি আমার মেয়ে। কিন্তু আমার অপেক্ষা ঈশ্বরের কাছে আর আমার এই ছোট ভাই জর্জ্জের—মিষ্টার ওক-বর্ণের কাছেই তোমার কৃতজ্ঞ হওয়া সঙ্গত। আমি কিছুই করি নাই। সে দিন সেই ঝড়ের সময় যদি আমার ভাই জর্জ্জ তোমায় রাস্তায় প'ড়ে থাকতে দেখে মোটর থামিয়ে তুলে না নিত, তা হ'লে কারও সাধ্য ছিল না যে, তোমায় বাঁচাতে পারে। অবশ্য করুণাময় ঈশ্বরই তাকে সে কার্য্যের সুযোগ দান করেছিলেন!"

মিষ্টার ওকবর্ণ যন্ত্রচালিতের মতই প্রতিধ্বনি করিয়া গেলেন, "তাতে আর সন্দেহ কি!"

নীলিমা তখন অশ্রুপ্লাবিত মুখ তাহার অদূরবর্ত্তী আইরিশ যুবকের দিকে ফিরাইল। অবিশুদ্ধ ইংরাজীতে বলিল, "আপনাকে কি ব'লে কৃতজ্ঞতা জানাব, আমি জানি না।"

যুবক মৃদু হাসিয়া উত্তর দান করিলেন, "তুমি শুধু ঈশ্বরের কাছেই তোমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাও।"

নীলিমাকে ইংরাজী বলিতে শুনিয়া মিস্ ওকবর্ণ সবিস্ময়ে কহিয়া উঠিলেন, "তুমি ইংরাজী বলিতে পার! এ দেশে ইংরাজী শিক্ষা স্ত্রীলোকদের মধ্যে শতকরা একটা হিসাবেও পড়ে না। জর্জ্জ! তোমার অনুমান মিথ্যা নয়, বিপন্ন বালিকা নিশ্চয়ই ভদ্রবংশীয়া।"

নীলিমার প্রতি মিস্ ওকবর্ণের স্নেহ-যত্ন প্রতিদিনই যেন বর্দ্ধিততর হইতে লাগিল। সুখাদ্য বলকারক ঔষধ ও মনে ভরসা পাইয়া নীলিমার দুর্ব্বল শরীরে অতি শীঘ্র শীঘ্রই বলাধান হইতে লাগিল। এমন কি, জীবনে কখন যে স্বাস্থ্যের মুখ সে দেখিতে পায় নাই,

লালকুঠী মিশনের, কর্ত্রীর পোষ্যকন্যা হইয়া সে মাসখানেকের মধ্যেই তাহা লাভ করিল। গ্রীষ্ম-মধ্যাহ্নে ঝলসিত লতা শ্রাবণবারিধারাপুষ্ট হইয়া যেমন নবীন ও সতেজ হইয়া উঠে, শ্যামল পত্রাবলীতে বিভূষিত হয়, নীলিমার অযত্নবর্দ্ধিত, অখাদ্যে অপুষ্ট, ক্ষীণ দেহলতা তেমনই তাহার নূতন আশ্রয়ের স্বাচ্ছন্দ্যলাভে ও উৎকট রোগ-মুক্তির পর স্বাভাবিক স্বাস্থ্যপ্রাপ্তির একটা সুযোগে তাহাকে যেন এবার নূতন করিয়া গড়িল। নীলিমার গৌরবর্ণ রক্তাল্পতায় পূর্ব্বে পাণ্ডু দেখাইত, এখন তাহাতে যেন গোলাপের আভা মিশ্রিত হইল। তাহার টানা চোখের দুর্ব্বল দৃষ্টি কুণ্ঠায় স্বতঃই নত হইয়া থাকে, এখন তাহাতে প্রাণশক্তির স্ফূর্ত্তি হওয়াতে তাহা উজ্জ্বল ও চঞ্চল দেখাইল। তাহার অস্থিসার ক্ষীণ দেহ সুপুষ্ট ও সুললিত ভাবে সুগঠিত হইয়া উঠিল।—মরা গঙ্গায় জোয়ার আসিল।

লাল কুঠীর আশ্রয় নীলিমার পক্ষে এক সুখস্বপ্ন। রোগশয্যায় প্রায় দুই সপ্তাহ কাটাইবার পর রোগমুক্ত অবস্থায় তাহার এখানে তিন মাস কাল অতীত হইয়া গিয়াছে। এই মাসত্রয় তাহার কাছে যেন আরব্য-রজনী হইতে ছানিয়া আনা তিনটি রাত্রি! মিস্ ওক-বর্ণ তাহাকে বাস্তবিক কন্যাস্নেহে গ্রহণ করিয়াছিলেন। এত অল্প-দিনের পরিচয়ে মানুষকে যে মানুষ এতই ভালবাসিতে ও বিশ্বাস করিতে পারে, মানুষের এ উদার মহৎ পরিচয় নীলিমার কাছে চির-অজ্ঞাত ছিল। আজ তাহা প্রকটিত হইল—এক বিদেশিনীর মধ্য দিয়া! নিজের দেশকে সর্ব্বান্তঃকরণে তীব্র ঘৃণা করিয়া সে কায়মনে সেই ভিন্নধর্ম্মী ভিন্ন জাতি ভিন্ন ভাষা-ভাষিণীর প্রতি তাহার সকল কৃতজ্ঞতার উৎস উৎসারিত করিয়া দিল। নিজকে ইঁহার কাজে উৎসর্গ করিয়া দিয়া সে সেই স্নেহ-করুণার স্রোতকে বর্দ্ধিত ও বেগবান করিয়া তুলিল।

মিস্ ওকবর্ণ নিজের বাক্সের চাবি হিসাব পত্র সমুদায়ই তাঁহার পোষ্য-কন্যার হস্তে তুলিয়া দিলেন। নিজে তাহার ইংরাজী-ফরাসী পিয়ানো শিক্ষায় সবিশেষ মনোযোগী হইয়া ভাইকে তাহার লাটিন শিক্ষায় নিয়োজিত করিয়া দিলেন এবং সর্ব্বদা তাঁহাকে সে বিষয়ে অমনোযোগের জন্য অনুযোগ করিতেও ছাড়িলেন না। অথচ সে বেচারারও এ সম্বন্ধে কোনই ত্রুটি ছিল না, বরং বিশেষরূপ উৎসাহই ছিল। সেটা আবার এত বেশী যে, নীলিমাকে তাহার জন্য সময় সময় বিব্রত হইতে হইত। অথচ প্রাণদাতাকে দুণাক্ষরেও কিছু জানাইবারও উপায় নাই।

কেবল একটি বিষয়ে নীলিমার এখনও দ্বৈধমত ঘুচে নাই। মিস্ ওকবর্ণ তাহাকে দুই চারিবার বলিয়াছেন, মিষ্টার ওকবর্ণ তাহাকে প্রায় প্রত্যহই দুই চারিবার করিয়া খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষা লইবার কথা মনে পড়াইয়া দেন, ইদানীং তাহার সংশয় মিটিতে বিলম্ব ঘটিতেছে দেখিয়া মিষ্টার ওকবর্ণ একটু অসহিষ্ণু হইয়াও উঠিয়াছিলেন এবং লাটিন পড়াইতে বসিয়া দুই বেলাই বাইবেল বর্ণিত বিষয়ের উপরও অনেকখানি কল্পনা যোগ করিয়া অ-খৃষ্টানের অ-স্বর্গ সম্বন্ধে খুবই ভীষণভাবে আলোচনা করিতেও আরম্ভ করিয়াছেন, তথাপি নীলিমার মন হইতে এতটুকু চলচ্চিত্ততা দূর হইতেছিল না। হিন্দুধর্ম্মের সে কোন খবরই জানে না, হিন্দুত্বের কোন শিক্ষাই কোন দিন সে পায় নাই—তাহার মা-বাপই সে সম্বন্ধে এতটুকু আলোক পাইয়াছিল কি না, সে বিষয়েও যথেষ্ট সংশয়স্থল। উচ্চ হিন্দুত্বের উদার শিক্ষা দূরের কথা, হিন্দুধর্ম্মের অত্যন্ত বহিরঙ্গ যে আচারনিষ্ঠা-পরায়ণতা মাত্র, তাহাও এখনকার বাসাবাড়ীর ক্ষুদ্র পরিবার-পদ্ধতির মধ্যে বড় একটাই দেখা যায় না। বারব্রত, দানধর্ম্ম, ব্রাহ্মণ-ভোজন, অতিথি-সেবা, তীর্থযাত্রা একান্নবর্ত্তী পরিবারের মধ্যে ত্যাগশীলতা, সংযম প্রভৃতি যে সকল সদাচার ও সদ্‌গুণ হিন্দুসমাজের মধ্যে সাধারণতঃ প্রচুরতর-

রূপেই বর্ত্তমান ছিল, তাহা প্রায় বিলুপ্ত হইয়াছে। নীলিমা যে বাড়ীতে জন্মিয়া যে সঙ্কীর্ণ পরিবৃতির মধ্যে মানুষ হইয়াছে, তাহাতে সকল শিক্ষাই তাহার অসম্পূর্ণ। মানুষকে সে হীন, স্বার্থপরতাপূর্ণ, নির্ম্মম—অথবা ভীরু, সঙ্কুচিত, অত্যাচারী অথবা অত্যাচারিত—ইহার বাহিরে আর কোন মূর্ত্তিতেই দেখিতে পায় নাই। তাই স্বজাতি ও স্বধর্ম্মের প্রতি বিন্দুমাত্র আকর্ষণ তাহার ছিল না, বরঞ্চ তাহার মনে পরধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধা ও আকর্ষণ অনেক বেশীই ছিল, কারণ, একে সে ভাল করিয়া না চিনিলেও ইহার একটা লোভনীয় বাহ্য শোভা তাহার দুটো চোখকে ধাঁধিয়া দিয়াছিল। মিশনারীদের মধ্যে জীবনের অনেক অংশই তাহার কাটিয়াছে। ইহাদের ভিতর আর কিছুই না থাকুক, দয়াদাক্ষিণ্যের কোনই যে অভাব নাই, তাহাতে আর সংশয় কি? সে দেখিত, এই খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী সমস্ত জাতটাই কোন্ সুদূরে থাকিয়া সমস্ত পৃথিবীর জন্য একান্ত আগ্রহে চিন্তা করিতেছে। জগতের সর্ব্বত্র তাহারা নিজের প্রতিনিধি প্রেরণ পূর্ব্বক নিজধর্ম্ম ও সভ্যতা প্রচার মাত্রই নহে, অনাথ শিশুদলের রক্ষার জন্য ও সস্নেহ প্রচেষ্টার কিছুমাত্র ত্রুটি রাখে নাই। শত সহস্র অনাথাশ্রমের প্রতিষ্ঠা পূর্ব্বক কত মানবশিশুর অকালবিয়োগ প্রতিরোধ করিতেছে, তাহাদের মধ্যে কত শতকেই চোর, দস্যু ও ভিক্ষোপজীবী হওয়া হইতে রক্ষা করিতেছে। আর্ত্ত ব্যক্তি ওদের দ্বারায় ঔষধপথ্য ও সেবালাভে কৃতার্থ হইতেছে; বিদ্যা, জ্ঞান, উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া জন্ম সফল করিতেছে। বাস্তবিক দেখিতে গেলে সমস্ত মানব সমাজের জন্যই ইহাদের চিত্তে করুণার অপার বারিধি যেন স্বতঃই উথলিত হইতেছে। এ দয়ার জন্য জাতি নাই, ধর্ম্ম নাই, পাত্রাপাত্র-জ্ঞান নাই—যেখানে অভাব ও অত্যাচার, সেই খানেই ইহাদের সেবা-কুশল করুণাস্পর্শ। এই করুণার উৎস ইহাদের নিজ দেশভূমি আত্মীয়-

বন্ধু সর্ব্বস্ব ত্যাগ করাইয়া অপার জলধিগর্ভ হইতে বালুময় মরুস্থান পর্য্যন্ত পৃথিবীতে হেন স্থান নাই—যেখানে ঠেলিয়া না পাঠাইতেছে। এ ধর্ম্ম মানুষকে উদার করে, উন্নত করে, মানুষকে মানুষ বলিতে শিক্ষা দেয়। ইহার অপেক্ষা বড় ধর্ম্ম আর কোথায় আছে? নীলিমার প্রাণের মধ্যে একটা আকুল উন্মাদনা জাগিয়া উঠিল। এই ধর্ম্মই অতঃপর তাহার নিজের ধর্ম্ম হোক্, ইহাকেই আশ্রয় করিয়া সে নূতন ভাবে জীবন গড়িবে। সে জীবন মিস্ ওকবর্ণের মতই নির্ম্মল নিঃস্বার্থপরতায় পূর্ণ ও সেবাব্রতধারী হইবে। নীলিমার আশাহত অন্ধকার প্রাণ যেন নব-রবির নূতন রশ্মিলাভে আলোকোদ্দীপ্ত হইয়া আসিতে লাগিল। সে মনের মধ্যে কতই না গড়িয়া তুলিল। কিন্তু ঐ যে একটুখানি ক্ষুদ্র সঙ্কোচ, মূলে তাহার এতটুকু একটু খানি দুরাশা, সেটুকু যে কিছুতেই মরিতে চায় না। সে যে কিসের কোন্ ফাঁকে কোথা দিয়া নিজেকে কঠিন করিয়া লইয়া দাড় করায়, তাহাকে ত নূতনের সহস্র প্রলোভনও বশীভূত করিতে পারে না।

সুশীল! সুশীল এ কথা শুনিলে কি বলিবে? সুশীল যদি তাহাকে লোভী বলিয়া, অসহিষ্ণু প্রতিহিংসাপরায়ণ বলিয়া মনে করে, বিধর্ম্মী বলিয়া ঘৃণা করে? মন অবশ্য বলে যে, তাহার জন্য এতই ভাবনা কেন? তাহার সঙ্গে এ জীবনে দেখাই কি আর কখন তোমার হইবে? কিন্তু ঐ যুক্তিতে হৃদয় কোনই সান্ত্বনা খুঁজিয়া পায় না। দেখা যদি কখন না-ই হয়, তথাপি মনে মনেও যে সুশীল তাহাকে ঘৃণা করিতে থাকিবে, সে স্মৃতিও যে তাহার চিত্তে অসহ্য দাহ আনিয়া দেয়। সুশীল তাহাকে তুচ্ছ করিতে পারে, সে দুঃখ নীলিমা প্রাণপণে সহিতেছে, কিন্তু তাহার ঘৃণা সে কেমন করিয়া সহ্য করিবে? না না, তাহা হইতে পারে না। নীলিমার মন হইতে তাহার সকল সাধ সব আশা মুছিয়া যায়। মিষ্টার ওকবর্ণ দিনের পর দিন হতাশা লইয়া ফিরিয়া যান।

এক দিন—সে দিন মিষ্টার ওকবর্ণ নীলিমার পাঠ সমাপ্তির পর যথাপূর্ব্ব তাহার খৃষ্টান হওয়ার সপক্ষে ঝাড়া দুই ঘণ্টাকাল বক্তৃতার পরও তাহাকে সংশয়াচ্ছন্ন ও চিন্তাকুল দেখিয়া খুব জোর করিয়া ধরিলেন; বলিলেন, "তুমি হিন্দুধর্ম্মে নিজের শ্রদ্ধা নাই বলিতেছ, অথচ খৃষ্টান হইতেও চাও না, —ইহার ভিতরকার কথাটা কি আমায় বলিবে? নিশ্চয়ই ইহার মধ্যে কোন ব্যক্তিগত ব্যাপার আছে। সম্ লভ অ্যাফেয়ারস্,—আই থিঙ্ক?"

এই সুস্পষ্ট যুদ্ধঘোষণায় নীলিমা লজ্জিত হইয়া মাথা নত করিল।

মিষ্টার ওকবর্ণের মুখের উপর সত্যতত্ত্বাবিষ্কারের একটা হর্ষের দীপ্তি উজ্জ্বল হইয়া উঠিতে উঠিতে সহসা মধ্যপথেই বাতাহত দীপশিখার মতই সেটা নিবিয়া গেল। তিনি সন্দেহগম্ভীরমুখে অনুসন্ধিৎসুনেত্রে ক্ষণকাল নীলিমার নতমুখে চাহিয়া থাকিয়া পরে অল্প মৃদুকণ্ঠে কহিলেন, "আমার সন্দেহই তবে সত্য, মিস্ চক্রবর্ত্তী?"—তাহার পর তথাপি তাহাকে বাক্যহারা ও প্রতিবাদবিমুখ দেখিয়া সহসা মিষ্টার ওকবর্ণের শুভ্র মুখমণ্ডল আরক্ত হইয়া উঠিল, তাঁহার স্বর উত্তেজিত এবং আবেগপূর্ণ বোধ হইতে লাগিল। তিনি কহিয়া উঠিলেন, "ওঃ, না—না, ও সকল পূর্ব্ব দুর্ব্বলতা মন হইতে নিঃশেষে মুছিয়া ফেল। 'লেট্ দি ডেড্ পাষ্ট বেরি ইটস্ ডেড এণ্ড অ্যাক্ট অ্যাক্ট ইন্ দি লিভিং প্রেজেণ্ট, হার্ট উইদিন এণ্ড গড ওভার-হেড।'—অতীত বিস্মৃত হও এবং ঈশ্বরের কার্য্যে মনোনিবেশ কর, বিগতের পানে আর ফিরে চেও না মিস্ চক্রবর্ত্তী!"

নীলিমা তথাপি নিরুত্তরেই রহিল। মিষ্টার ওকবর্ণের মর্ম্মস্পর্শী বাক্যগুলা তাহার প্রাণের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে গম্ভীর মেঘমল্লারে সঘনে বাজিয়া উঠিতেছিল।—'লেট্ দি ডেড পাষ্ট বেরি ইটস্ ডেড।'—'ডেড পাষ্ট!'—তাহার অতীত তাহার কাছে তাহার অপেক্ষা বেশী কিছু নয়। মৃত—একেবারেই মৃত্যুর শীতল আলিঙ্গন-নিবদ্ধ—নিঃসার,—প্রাণহীন।

কি আছে তাহাতে? এতটুকু রূপ রস গন্ধ তাহার মধ্যে আছে কি? না, না—পিছনে ফিরিয়া চাহিবার মত তাহার কোথাও কিছু বাকি পড়িয়া নাই। তবে সে কিসের মোহে অন্ধ হইয়া এই "লিভিং প্রেজেণ্ট"কে, এই আশা-আনন্দ সুখসম্ভ্রমে ভরা জাগ্রত জীবন্ত বর্ত্তমানকে তুচ্ছ করিতে পারে? ইহাদের অবহেলায় ফিরাইয়া দিয়া সেই মৃত অতীতকেই দুহাতে আঁকড়াইয়া পড়িয়া থাকে? কি আছে তাহার মধ্যে? কে আছে তাহার সঙ্গে?—সহসা নীলিমার চিন্তাকুল সমস্ত অন্তরকে মথিত ব্যথিত করিয়া তাহার মাঝখানে ফুটিয়া উঠিল একখানা মুখ—সে মুখখানা সুশীলের। অতীত ত তাহার মরে নাই! সে যে মৃত্যুঞ্জয়ী সুধাপানে অমর হইয়া আজও দেহ-বিচ্ছিন্ন রাহুর মস্তকের মতই মৃত্যুঞ্জয়রূপে বাঁচিয়া আছে। কই, মরণের কূল হইতে এই নবজীবনের মাঝখানে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াও ত তাহার মনের এই সমুজ্জ্বল স্মৃতিটুকুর এতটুকু ঔজ্জ্বল্য নাশ বা হ্রাস হয় নাই! এ যে তেমনই সুন্দর—তেমনই ভাস্বর হইয়াই আজিও অনিমেষে জাগিয়া আছে। এই চিন্তায় নীলিমার চিত্ত যেন চন্দ্রোদয়ে স্ফীতবক্ষ জলধির মতই সুখোদ্বেল হইয়া উঠিল। তাহার অন্তরের সেই সুখস্রোতের তরঙ্গ তাহার বাহিরের ও সারা দেহের উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া গেল। তাহার বক্ষের সেই সুধাসিন্ধুর আলোড়নে তাহার সুপুষ্ট গণ্ডদ্বয় সরস বঙ্কিমায় সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল, সেই সুখস্মৃতির স্মরণমাত্রে তাহার চির-হাস্যবিরহিত অধরপ্রান্ত স্মিতহাস্যে উদ্ভাসিত হইয়া রহিল। তাহার নেত্রদ্বয় সলজ্জ জড়িমায় অবনত হইয়া আসিলেও তাহার মধ্য দিয়াও একটা সুকোমল দীপ্তি বিভাসিত হইতে লাগিল।

আইরিশ যুবকের আরক্ত মুখ তাহার সম্মুখবর্ত্তিনীর আনন্দস্মিত মুখের দিকে চাহিয়া অকস্মাৎ শুভ্রতর হইয়া গেল। সুখস্মৃতির আন্দোলনে হর্ষদীপ্ত সেই সমুজ্জ্বল ও সলজ্জ মূর্ত্তি তাঁহার বুকের মধ্যে একটা বেদনার

আঘাত প্রদান করিল। সংশয় নিশ্চিত সত্যে প্রতিষ্ঠিত হইল। তিনি ক্ষণকাল নির্ব্বাক্ মুগ্ধনেত্রে নীলিমার অপূর্ব্ব লজ্জাশ্রীবিমণ্ডিত মুখের প্রতি চাহিয়া থাকিয়া ক্ষণপরে ঈষৎ ঈর্ষা-বিদগ্ধ শ্লেষের স্বরে কহিয়া উঠিলেন, "তুমি যাহার কথা ধ্যান করিয়া ঈশ্বরের ডাক কানে তুলিতেছ না, তোমার ডাকে সে কি কোন দিন কর্ণপাত করিবে বলিয়া আশা কর?"

এ প্রশ্নের উত্তর না পাওয়াতে উৎসাহিত ও উত্তেজিত হইয়া মিঃ শুকবর্ণ পুনশ্চ কহিতে লাগিলেন, "আমার মনে হয় যে, সে বিষয়ে তোমার চিত্তেও নিশ্চয় কিছু সন্দেহ আছে। নিশ্চয়ই তাই—নতুবা তুমি সে দিনের সেই অগ্নি-বৃষ্টির মধ্যে কখনই অমন করিয়া অনাহারক্লিশ, চলচ্ছক্তিহীন, অসহায় ভাবে মরণের সমুদ্যত আলিঙ্গনের মধ্যে পড়িয়া থাকিতে না। সম্ভবতঃ তোমার প্রণয়ী (ইওর-লাভার) পিতৃবৎসল, পিতার দয়াজীবী (ফাদারস্ চ্যারিটী-বয়) তোমায় বিবাহ করিলে যৌতুক পাইবে না বলিয়া কোন দিন তোমায় সে তার পিতার অনিচ্ছায় বিবাহ করিবে না—সম্ভবতঃ সে তোমায় ভালবাসেও না, অন্যের প্রেমে হয় ত বা তাহার চিত্ত পরিপূর্ণ হইয়াই আছে—সেই অল্পবায়ণ, অথবা ভীরু, অথবা তোমার সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে উদাসীন—একটা অযোগ্য নরের জন্য তুমি ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ করিতে শুধুই অযথা বিলম্ব করিতেছ না—সংশয় করিতেছ, ইহা তোমার একান্ত সঙ্কীর্ণ-চিত্ততা এবং ইহার শাস্তিও তোমায় ঈশ্বরের নিকট হইতে অবশ্য পাইতে হইবে।"

নীলিমার সেই বর্ণ-সমুজ্জ্বল আনন্দস্নাত মূর্ত্তি ঘোর বিষাদের কালিমায় লিপ্ত হইয়া একান্ত মলিন হইয়া গেল। 'অন্যের প্রেমে চিত্ত তাহার পরিপূর্ণ হইয়া আছে';—তা আছেই ত! সুলেখাই ত তাহার সব। নীলিমা তাহার কে? সেই সুলেখার জন্যই গাত্রহরিদ্রা অধিবাসের পরেও বিবাহরাত্রির মন্ত্রপাঠ কয়টামাত্র বাকি রাখিয়া সে উল্লসিতচিত্তে

তাহার উদ্দেশ্যে ছুটিয়া পলাইয়াছে। আর সে মুক্তি লইয়াছে কাহার হস্ত হইতে? শতবার চিন্তিত এই অসহনীয় ব্যথিত চিন্তা আবার মনের মধ্যে জাগিয়া উঠিয়া নীলিমার সমস্ত আনন্দ-উৎসের মুখগুলাকে নির্ম্মম করিয়া চাপিয়া ধরিল। হায় সুশীল! এতটুকু ভালবাসা যদি তাহার জন্য তোমার হৃদয়প্রান্তে পড়িয়া থাকিত! এতটুকু স্নেহ, একটু সহানুভূতি, কিছুই কি, এক বিন্দুও কি ছিল না? বিন্দুমাত্র না?. না, না—তা থাকিলে কেহ কি তেমন করিয়া কাহাকেও ফেলিয়া যাইতে পারে? নারীমর্য্যাদাকে কি তত বড় অপমান করা সম্ভব হয়? ওঃ সুশীল! সুশীল! কি নিষ্ঠুর, কি কঠোর তুমি! তোমার সুলেখা—যাক্, বৃথা কেন আর এ ভাবনা? যাহা গিয়াছে, তাহা চিরদিনের মতই তো চলিয়া গিয়াছে। যাহা চলিয়া গিয়াছে, আর তাহা কখনই ফিরিবে না। তবে কেন বৃথা সেই দুরাশা-স্বপ্নের ধ্যানে মরীচিকার সন্ধানে আকাশ-কুসুমের কল্পনায় সারা জীবনটাকেই মিথ্যা অপব্যয় করিয়া ফেলা?

মিষ্টার ওকবর্ণের ব্যঙ্গভরা তীব্রবাক্য কাঁটার মতই নীলিমার মনের বুকে বিঁধিয়া উঠিল—'তুমি যার কথা ধ্যান ক'রে ঈশ্বরের ডাক কানে তুলিতেছ না, তোমার ডাকে সে কি কোন দিনই কর্ণপাত করিবে আশা কর?' না, কোন দিন না।—কোন আশা নাই—কোন আশাই নাই ওঃ সুশীল! সুশীল! সুশীল! কেন তুমি এমন নির্ম্মম হইলে? কেন তোমার চিত্ত সুলেখাময় হইয়া রহিল? যদি সুলেখার সহিত তোমার কোন দিন দেখা না হইত, তাহার সঙ্গে তোমার বিবাহের বাগ্দান না থাকিত তবে হয় ত বা তুমি আমায় অমন করিয়া অবহেলা করিতে পারিতে না; অথবা তাহাও হয় ত করিতে, যেহেতু, তুমি ধনীর সন্তান—আমি গরীবের মেয়ে। উঃ সুশীল! কেন তুমি আমাদের বাড়ী আসিয়াছিলে?

গভীর নৈরাশ্যের অনিবৃত্ত হাহাকারে নীলিমার বক্ষ যেন দীর্ণ হইতে চাহিতে লাগিল। মিষ্টার গুরুবর্ণের শ্লেষোক্তিগুলা তাহার গুপ্ত-ক্ষতের আচ্ছাদন বড় নির্মম হস্তেই ছিঁড়িয়া দিয়াছিল। ইহাতে তাহার কল্পনা-সরস চিন্তাধারা আবরণমুক্ত কঠোর সত্যের নগ্নমূর্ত্তি যেন ভাল করিয়াই প্রত্যক্ষ করিল এবং ঈর্ষা, শোক ও নিরাশায় প্রাণ তাহার সহস্রধা হইয়া গেল।

চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

দিনের পর দিন নীলিমার চিত্ত পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। সুশীলের প্রতি মনে পাছে কোন বিরাগ দেখা দেয়, সেই ভয়ে সে পূর্ব্বে তাহার কথা ভাল করিয়া ভাবিতেও ভরসা করিত না। মাত্র তাহার সুন্দর মুখ, তাহার স্নেহের বাণী—তাহার আদরের সম্ভাষণ এই টুকুই স্মরণে আনিয়া নিজের অন্তরকে সুখপ্রদীপ্ত রাখিতে সে প্রাণপণে চেষ্টা করিত; কিন্তু মিষ্টার ওকবর্ণের সহিত সে দিনের সেই আলোচনার পর সেই আবরণের পর্দ্দাখানা অকস্মাৎ খসিয়া পড়িয়া গিয়াছে। মনকে এখন আর আঁখি ঠারিয়া রাখিলে চলে না। সত্যকে অস্বীকার করিবার উপায় আর তার হাতে নাই। সুশীলের স্মৃতিতে আর তাহার মনে সুখের লেশ জাগে না—জাগিয়া উঠে প্রচণ্ড ব্যথাভরা তীব্র অভিমান। স্বার্থপর ভীরু কাপুরুষ সে—তাহাকে বিপন্ন করিয়া তাহারই হাতের মুক্তি লইয়া চোরের মতন পলাইয়া গেল। কি ঘৃণা! ছি, ছি, নীলিমার কে' সে যে, নীলিমা তাহার কথা ভাবিবে? তাহার বৃথা চিন্তায় নিজের জীবনকে চির-ব্যর্থতার হস্তে তুলিয়া দিবে? এ কি বুদ্ধিভ্রংশ তাহার? না, না, এ তাহার দুর্ব্বুদ্ধি, এ দুর্ব্বুদ্ধি যেন কখন না হয়।

মিষ্টার ওকবর্ণ একান্ত অসহিষ্ণু হইয়া তাঁহার দিদির শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। ক্লারা ওকবর্ণ নিজেও নীলিমাকে অনেক আশার বাণী শুনাইলেন। খৃষ্টানের পরমার্থ যে সুরক্ষিত, তাহার সম্বন্ধে যথেষ্ট প্রলোভন নীলিমা দেখিতে পাইল এবং ইহলোকটাকেও তাহার এখন

আর পূর্ব্বের মত তুচ্ছ বোধ হইল না। সে খৃষ্টান হইতে এইবার কৃতনিশ্চয় হইল।

এই উপলক্ষ্যে সবুজকুঠীতে একটু আনন্দ-সমারোহ পড়িয়া গেল। এখানকার দাসদাসী এবং অনাথা মেয়েরা, তাহাদের শিক্ষয়িত্রীরা সকলেই এই কয় মাসের মধ্যে নীলিমাকে বিশেষভাবে স্নেহ করিয়াছিল। এত দিন তাহাকে একটু পর পর বোধ করিয়া সকলেই কিছু সঙ্কুচিত থাকিত, এখন তাহাদের মনে হইল, সে যেন তাহাদের আপন জন হইয়া গেল। মিষ্টার ওকবর্ণ আজ কয়দিন হইতে এতদুপলক্ষে এতই আনন্দোত্তেজিত হইয়া আছেন যে, সে দেখিয়া নীলিমার অবসাদগ্রস্ত চিত্তেও সময় সময় একটা বিস্ময়-কৌতূহলের উদ্রেক না হইয়া থাকিতে পারিতেছিল না।

যথাকালে শুভকার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল। এই ধর্ম্মানুষ্ঠানের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত নীলিমার প্রাণ তাহার অন্তরের মধ্যে তারস্বরে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিয়াছে। উর্দ্ধস্বরে সে পুনঃ পুনঃ ডাকিয়া বলিয়াছে—সুশীল! সুশীল! সুশীল! কোথা তুমি? কোথা তুমি? দেখ, জন্মজন্মান্তরের মতই আজ আমি তোমা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেলাম। আর সে শুধু তোমারই জন্য! তুমি যদি আমায় এক বিন্দুও ভালবাসিতে! যদি অভাগিনী বলিয়া—অত্যাচারিতা অনাদৃতা দেখিয়া তোমার সুখস্পৃহচিত্তে এতটুকুও ত্যাগের মহত্ত্ব দেখা দিত, তাহা হইলে আমায় আজ এমন করিয়া তোমার কাছে পরের অপেক্ষা পর হইতে হইতনা। ইহজীবনে নাই হোক, তবু পর-জীবনে, পরলোকে তোমায় পাইবার আশা লইয়া সেই সাধনাতেই এ জন্মটা না হয় ক্ষয় করিয়া ফেলিতাম। কিন্তু তাহা ত হইলনা। আমার জন্য তোমার অন্তরে বা বাহিরের কোথাও এতটুকু তিলমাত্র স্থান নাই—বিন্দুমাত্র সহানুভূতি নাই—আমার জীবনের মূল্য তোমার কাছে কাণা

কড়িও নয়! আমার মৃত্যু তোমার পক্ষে তুচ্ছব অপেক্ষাও তুচ্ছ বস্তু। তবে আমিই বা কেন অনর্থক চির দুঃখকেই শুধু বরণ করিব? নিজের মঙ্গল চেষ্টা কে'না করে?

কিন্তু দুঃখকে ত্যাগ করিব মনে করিলেও সেই চিরসাথী দুশ্চিন্তা নীলিমাকে ত্যাগ করিল না। সুশীলের চিন্তাতে আজও তাহার চিত্তে ক্ষণিক সুখপ্রদীপমাত্র জ্বলিয়া উঠে, আর সবই যেন তেমনই অন্ধকার। আর সেই সুখচিন্তাটুকুও আজ সমধিক সঙ্কোচ-মলিন, লজ্জা-ম্রিয়মাণ। নীলিমা যতই তাহার হৃদয়স্থিত সুশীলমূর্ত্তিকে তাচ্ছীল্য অবহেলায় দূরে সরাইয়া দিতে যায়, ততই যেন তাহা দৃঢ় হইয়া বসিয়া স্বতঃই আপনার পূজা আহরণ করে, আর সে পূজার অধিকার আজ নীলিমার নাই—প্রাণ তাহার হা হা করিয়া কাঁদিয়া উঠে। তাই নূতন জীবনে বিবিধ সুখে উপাদান সত্ত্বেও সে সুখ পায় না।

জর্জ্জ ওকবর্ণের যত্ন আদর দিন দিন যেন সীমাহারা হইয়া উঠিতে লাগিল। মিস্ ওকবর্ণের পীড়া বৃদ্ধির জন্য তাঁহার করাচি ফিরিয়া যাওয়া ঘটিয়া উঠিতেছিল না। সহসা একদিন বর্ষীয়সী মিস্ ওকবর্ণের পীড়া ভীষণমূর্ত্তি ধারণ করিল, তিনি শয্যাগ্রহণ করিলেন, আর এ ঘটনায় সকলেরই অপেক্ষা অধিকতর ভীত হইল নীলিমা।

অক্লান্ত সেবা ও চিকিৎসার ফলে আয়ুষ্মান্ ব্যক্তি আরোগ্য লাভ করিতে পারে, কিন্তু আয়ু যাহার নাই, তাহাকে কেহ ধরিয়া রাখিতে পারে না। মিস্ ওকবর্ণের পবিত্র জীবনদীপ দিনে দিনে নির্ব্বাণোন্মুখ হইয়া আসিল। মহা ভয়ে নীলিমা অনাহারে অনিদ্রায় দিবারাত্রি তাঁহার শয্যা-প্রান্ত আশ্রয় করিয়া রহিল। সমস্ত মনপ্রাণ ঢালিয়া জীবন ও আশ্রয়-দাত্রীর শুশ্রূষায় অন্তরের অজস্র কৃতজ্ঞতা ধারা সে ঢালিয়া দিতে লাগিল, ফল কিন্তু কিছুই হইল না।

এক দিন মিস্ ওকবর্ণ নীলিমাকে তাঁহার পার্শ্বে একা পাইয়া ক্ষীণ-কণ্ঠে কহিলেন, "নেল! আমার মৃত্যুর পর তুমি কি করিবে স্থির করিয়াছ?"

নীলিমার যত্নরুদ্ধ অশ্রুরাশি এই কথায় একান্ত উদ্দাম বেগে উথলিয়া উঠিল। অশ্রুর বন্যাধারা প্রবাহিত করিয়া দিয়া সে শুধু অর্দ্ধস্ফুটস্বরে উত্তর দিল,—"আমি তা' জানি না।"

মিস্ ওকবর্ণের রোগযন্ত্রণামলিন শুষ্ক অধরে স্নেহের মৃদু হাস্য ফুটিয়া উঠিল, তিনি নীলিমার অশ্রু-আবেগে বিকম্পিত দেহে ক্ষীণ হস্তাবমর্ষণ করিয়া স্মিতমুখে কহিলেন, "শান্ত হও বৎসে। তুমি বালিকা, তোমার সম্মুখে অপার সংসার সমুদ্র প্রবাহিত, একা অসহায় ইহাতে পার হওয়া বড়ই কঠিন। যদি আমার পরামর্শ লইতে ইচ্ছা কর, তবে আমি বলি, তুমি ইহার সহায়রূপে একজন সঙ্গী লইও। বিস্মিত হইতেছ? সঙ্গী হিসাবে আমি বলিতেছি স্বামী—যিনি তোমার সকল কার্য্যের সহায়ক ও রক্ষাকর্ত্তা হইবেন।"

নীলিমার পতনশীল অশ্রুনির্ঝর সহসা যেন অচলতার হাওয়া লাগিয়া নিথর হইয়া গেল। ক্ষণকাল তাহার বাঙ্‌নিষ্পত্তি হইল না। কিয়ৎক্ষণ পরে সে ঘোরতর বিস্ময়াভিভূতভাবে কহিল, "আমায় আপনি বিয়ে করতে বল্‌ছেন? আমি যদি বিয়েই কর্‌বো, তা হ'লে নিজের সমাজ, ধর্ম্ম সমস্ত পরিত্যাগ ক'রে এখানেই বা রইলুম কেন? বিয়ে করতে আমায় আপনি আদেশ করবেন না।"

মিস্ ওকবর্ণের নিষ্প্রভ মুখ এই উত্তরে চিন্তাম্লান দেখাইল। তিনি ক্ষণকাল নীরব থাকিবার পর একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন পূর্ব্বক কিছু দুঃখিত স্বরে কহিলেন, "নেল! আজ আমার আর কাহারও প্রতি পক্ষপাত করিয়া আত্ম বা পর কাহাকেও প্রবঞ্চনার দিন নহে, সরলভাবে সত্যকে

স্বীকার করাই আজ আমার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়। তাই আমি বলিতেছি,—তোমার মত রূপসী ও তরুণীর পক্ষে সকল সমাজেই বিবাহ আত্মরক্ষার প্রশস্ত উপায়। অবশ্য, আমি যদি বাঁচিয়া থাকিতাম, তবে অবস্থা অন্যরূপও হইতে পারিত। এখন তোমায় আর তেমনি ভাবে কে রক্ষা করিবে? তোমার সমাজও করিবে না, আমার সমাজও করিবে না। তাই আমার পরামর্শ লও, যদি উপযুক্ত স্থান হইতে আবেদন পাও, বিনা দ্বিধায় তাহা গ্রহণ করিতে কুণ্ঠা বোধ করিও না। জানিও—সুযোগ মনুষ্যজীবনে দুইবার আইসে না; কদাচিৎ একবার দেখা দেয় মাত্র।"

এ অযাচিত উপদেশের প্রকৃত অর্থবোধ সে দিন নীলিমা করিতে পারে নাই। তাই সে নীরবেই রহিল। তাহার মৌনকে সম্মতিলক্ষণ বোধেই বোধ করি অতঃপর মিস্ ওকবর্ণ তাহার সম্বন্ধে যেন সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ততানুভব করিয়া আর এ সম্বন্ধে কোনই আলোচনা করিলেন না। কেবল মাত্র মৃত্যুর পূর্ব্ব দিবসে তিনি তাঁহার ভাইকে ডাকিয়া বলিলেন, "আমার মায়ের যে চেন-ছড়া আমি ব্যবহার করিতাম, সেটি তোমার ভাবী বধূর জন্য তোমায় দিয়াছি, তাহা আনিয়া আমার সাক্ষাতে তুমি নীলিমাকে পরাইয়া দাও।"

নীলিমা কুণ্ঠিত ভাবে এ দান গ্রহণ করিলে আশীর্ব্বাদ করিয়া মিস্ ওকবর্ণ কহিলেন, "আমার মা'র মতন গুণবতি হইও।"

জর্জ্জ ওকবর্ণ ভগিনীর হাত ধরিয়া কহিয়া উঠিলেন, "আর এই ক্লারার মত।"

নীলিমা নীরব কৃতজ্ঞতায় মস্তক নত করিল।

* * * *

মিস্ ওকবর্ণের মৃত্যুর পর কয়েক দিন নীলিমা একান্তই শোকাভিভূত

হইয়া রহিল। এক রকম সে শয্যা গ্রহণই করিল। এই ঘটনায় নিজের মরা মায়ের শোক যেন এত দিনে সে ভাল করিয়া অনুভব করিতেছিল। আবার যেন সমস্ত জীবনটাই তার শূন্যময় হইয়া পড়িল। সব যেন এলো মেলো ও বিপর্য্যস্ত।

নীলিমাকে আত্মচিন্তায় ফিরাইয়া আনিল দুইজন। ইহার মধ্যে প্রথম ধাক্কা খাইল সে মিস্ গোল্ডেনরীচের কাছে। এই মহিলাটি সম্প্রতি সবুজ কুঠির প্রধান কর্ত্রীরূপে দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে ফেরৎ হইয়া আসিয়াছিলেন। এখানে পদার্পণ করিয়াই সর্ব্বপ্রথম তাঁহার চোখে ঠেকিল নেটিবের মেয়ের আধিপত্য! মিস্ শুকবর্ণের পাশের ঘরে সম্পূর্ণ য়ুরোপীয় সাজ সজ্জায় সজ্জিত উত্তম গৃহে নীলিমার বাস এবং জজ্জ শুকবর্ণ ও য়ুরোপীয় সহকারিণীর সহিত তাহার একত্র পান ভোজন মিস্ গোল্ডেনরীচের নিকট একান্ত বিসদৃশ ও অত্যন্ত স্পর্দ্ধাসূচক বোধ হইল। ফলে জজ্জের সহিত এ লইয়া তাঁর কিছু কলহও হইয়া গেল সহকারিণী মিস্ প্যাক্উড মিস্ শুকবর্ণ ও জজ্জের উপর ইহার সমস্ত দায়টা চাপাইয়া দিয়াও অবশ্য সহজে নিষ্কৃতি পাইলেন না। এ সকল ঘৃণ্য সংসর্গ জোর করিয়া তাঁহার ছাড়ান উচিত ছিল, নতুবা কর্ম্মে ইস্তফা দেওয়াও সঙ্গত—ইত্যাদি যথেষ্ট কঠিন তিরস্কার সহিয়া তাঁহার মন নীলিমার প্রতি বিদ্বিষ্ট হইয়া উঠিল। এমন কি, যে সকল দাসদাসীরা এত দিন নীলিমার প্রতি একান্ত প্রীতিপূর্ণ ছিল, কর্ত্রীর মনোভাবের অনুবর্ত্তনে তাহারা পর্য্যন্ত তাহাকে নিতান্ত অবহেলার দৃষ্টিতেই দেখিতে লাগিল। নীলিমার এখন সর্ব্বত্র হইতে পদে পদে তীব্র তিরস্কার অবমাননা লাঞ্ছনা উপভোগ আরম্ভ হইল। তত বড় সুখের পরক্ষণেই একসঙ্গে সর্ব্ববিধ দুঃখ এবার নীলিমাকে যেন আবার অসহিষ্ণু করিয়া তুলিতে লাগিল। সে বারংবার বিস্মিত হইয়া ভাবিল, তবে কি

সকল সমাজেই তাহার পিতৃ-আদর্শ বর্ত্তমান ? তবে কি, খৃষ্টান-সমাজেও হিন্দুসমাজের মতই সঙ্কীর্ণচেতার অভাব নাই ?

সে দিন মিস্ গোল্ডেনরীচ নীলিমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। নীলিমা আসিয়া পূর্ব্বের অভ্যাসমত অভিবাদন শেষে একখানা চৌকী টানিয়া লইয়া বসিতে যাইতেই তিনি ভীষণমূর্ত্তিতে দাঁড়াইয়া উঠিয়া তাহাকে যথেচ্ছ কটু ভাষা প্রয়োগ করিলেন ও পরিশেষে কহিলেন, "মিস্ ওকবর্ণ তোমায় ভয়ানক অসঙ্গত প্রশ্রয় দিয়ে গেছেন, দেখিতেছি। নর্দ্দমার নোংরা জলকে তিনি পান কর্‌বার আধারে তুলে রেখে গেছেন। আর তাঁর স্বজাতীয়েরাও এখন পর্য্যন্ত তাঁর সেই নিঘৃণ্য কার্য্যের পোষকতা করিতেছে! আমার মনে কর্‌তেও শরীর শিহরিতেছে যে, আমি একজন নেটিব নিগারের সঙ্গে একত্র এক বাড়ীতে বাস করিতেছি। তুমি যদি এখনও ভাল চাও, অর্ফানেজের যে কোন কামরা ঠিক করিয়া লইয়া এই মুহূর্ত্তে উঠিয়া যাও।"

নীলিমা সে দিন অশ্রুভারাতুর চক্ষে ও গভীর আহত চিত্তে নিজের ঘরে ফিরিয়া আসিয়া একখানা সুকোমল কুসন আঁটা চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িল। একবার সে অশ্রু-অন্ধ নেত্র চারিদিকে ফিরাইয়া তাহার এই কয় মাসের আশ্রয়, তাহার নব-জীবনের স্মৃতি সুখে-ভরা গৃহস্থালীর সমুদয়টা চাহিয়া চাহিয়া দেখিল। স্নেহ-করুণাময়ী মিস্ ওকবর্ণের কথা মনে আসিতেই দুই চোখ দিয়া তাহার পাহাড়ভাঙ্গা ঝরণাধারার মত অজস্র অশ্রু-নির্ঝর ঝরিয়া পড়িতে আরম্ভ হইল। যে সুখের, যে সম্মানের স্বাদমাত্র সে কোন দিন অনুভব করে নাই, তিনি যে অযাচিত করুণায় তাহাকে অপর্য্যাপ্তরূপে তাহারই মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। একবার এই সম্মান ও ভোগৈশ্বর্য্যের আস্বাদ প্রাপ্ত হওয়ার পর পুনশ্চ সেইখানেই আবার দুরবস্থা ও অসম্মানের মধ্যে অবনত হওয়ার মত

অপমান ও দুঃখ তাহার যেন অসহনীয় বোধ হইতে লাগিল। তাহার জীবনে যে সুখস্পৃহা আজও একান্ত প্রবল হইয়াই রহিয়াছে, কোন সাধই ত তাহার আজও পর্য্যন্ত ভাল করিয়া মিটে নাই।

"আমি কি ভিতরে যাইতে পারি?"—এই প্রশ্ন করিয়া উত্তরের প্রতীক্ষা মাত্র না করিয়াই জর্জ্জ ওকবর্ণ গৃহে প্রবেশ করিলেন। নীলিমা ইতোমধ্যেই ত্রস্তে নিজের মুখের অশ্রুচিহ্ন-মাত্র মুছিয়া ফেলিয়াছে, তাহার চোখ দিয়া তখনও নবীন অশ্রুবিন্দুর পতন সে নিবারণ করিয়া উঠিতে পারে নাই।

মিষ্টার ওকবর্ণ নিকটে আসিয়া নীলিমার কাঁধের উপর হাত রাখিলেন, স্নিগ্ধস্বরে কহিলেন -"কাঁদচো তুমি নেল? কান্নার কিছু কারণ নাই—আমার লোনের কিছু টাকাকড়ি এখানে ছড়ানো ছিল, তারই জন্য আমার এ কয় দিন বিলম্ব হলো, না হ'লে ত এত দিন আমরা এখান থেকে চ'লেই যেতেম। এখন সে সব মিটে গেছে, আগামী কল্য আমরা যেতে চাচ্ছি।"

নীলিমা ভয়চকিত নেত্রে চমকিয়া জর্জ্জের প্রতি ফিরিল, তাহার মুখ দিয়া আর্ত্তভাবে বাহির হইয়া গেল,—"আপনিও আমায় এখনই ছেড়ে চলে যাবেন?"

নীলিমার মনে হইল, তাহার বর্ত্তমান অবস্থা যেন সেই চির-পুরাতন দিনেই পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। সেই নিরাশ্রয়, নিঃসম্বল ও অসহায় সে একা পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কেবল তাহার পূর্ব্বের সেই আত্মসম্মানটুকুই আর তার মধ্যে বর্ত্তমান নাই—যাহার বলে নিজেকে সে এক দিন সুশীলের উপরেই স্থান দিতে পারিয়াছিল। আজ সে স্বধর্ম্মত্যাগী, পরপদলেহী, পরের দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ। মন তাহার যেন কোন্ অন্ধকারের ক্ষুদ্র গুহার মধ্যে নামিয়া পড়িয়াছে।

জর্জ্জ ওকবর্ণের গাম্ভীর্য্যময় মুখমণ্ডলে সহসা আনন্দের স্মিতরশ্মি প্রতিভাত হইল। তিনি প্রফুল্লস্মিতমুখে কোমল কণ্ঠে ধীরে ধীরে উত্তর কহিলেন, "তোমায় ছাড়িয়া যাইব, সে কথা ত আমি বলি নাই নেল? 'আমরা' কথায় তুমি শুদ্ধ আমার সহিত যাইবে, ইহাই কি বুঝায় না? তোমায় ছাড়িয়া আমি কোথায় যাইব?"

নীলিমা বিস্মিত স্মিতমুখে ক্ষণকাল তাহার প্রাণদাতা বিদেশী যুবকের আনন্দ বিকশিত মুখে দৃষ্টি স্থির করিয়া থাকিয়া পরে কিছু কুণ্ঠা-বিজড়িত বাক্যে কহিল, "আমায় কি আপনি এখান হইতে অন্য কোন মিশনে আশ্রয় দিয়া দিবেন? কোথায় আমায় লইয়া যাইবেন?"

মিষ্টার ওকবর্ণ নীলিমার চেয়ারের পাশে অপর চৌকিখানা টানিয়া লইয়া বসিয়া পড়িয়া কহিলেন, "কোথায় নিয়ে যাব জিজ্ঞাসা করছো কেন নেল? আমার মিশনের বাড়ীতে আমার গৃহেই তোমায় আমি প্রতিষ্ঠা করতে নিয়ে যাব। সেইখানে পৌছেই ত আমাদের বিবাহ হবে।" এই বলিয়াই জর্জ্জ নীলিমার একখানা হাত টানিয়া লইয়া তাহার করতলে সাগ্রহ চুম্বন করিলেন।

নীলিমা আচম্‌কা একটা অৰ্দ্ধস্ফুট ধ্বনি করিয়া তড়িৎস্পৃষ্টের মতই সচমকে উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার নিশ্বাস যেন বদ্ধ হইয়া আসিতেছিল, কণ্ঠ, জিহ্বা, ওষ্ঠ বাক্যোচ্চারণে তাহাকে সাহায্য করিতে যেন একান্তই অশক্ত বোধ করিতেছিল, তথাপি কম্পিত, রুদ্ধ ও বিজড়িত স্বরে সে কোনমতে কহিয়া ফেলিল,—"এ কি অসম্ভব ও অসঙ্গত প্রস্তাব মহাশয়?"

জর্জ্জও এই কথায় যেন ঈষৎ বিস্ময়ানুভব করিলেন। তাঁহার সুনীল স্বচ্ছ চোখে সে বিস্ময় সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল, কণ্ঠেও তাহা প্রকাশ পাইল। তিনি বলিলেন, "আমি ত কোন অসঙ্গত বা অসম্ভব

নূতন প্রস্তাব তোমায় জানাইতে আসি নাই নেল! আমার ভগ্নীর মৃত্যুশয্যায় যে প্রস্তাব তুমি গ্রহণ করিয়া আমায় সাহসী করিয়াছিলে, আমি সেই স্থিরীকৃত বিষয়েরই পুনরালোচনা করিয়াছি মাত্র। তুমি ত এ বিবাহে তোমার অসম্মতি জানাও নাই এবং সে দিন আমাদের মায়ের স্মৃতিপূত অলঙ্কার গ্রহণে আমাদের আবেদন গ্রহণও তো করিয়াছিলে, তবে এ কয়দিন তোমায় নিতান্ত শোকাকুল দেখিয়া এবিষয়ে আমি কোন কথা কহি নাই।"

নীলিমার এখন সে দিনের সকল কথার অর্থগ্রহ হইল, 'যদি উপযুক্ত স্থান হইতে আবেদন পাও, তবে বিনা দ্বিধায় তাহা গ্রহণ করিও।' সেই উপযুক্ত স্থানের লক্ষ্য ছিলেন তাহা হইলে ইনই? নীলিমার সর্ব্বশরীর যেন শিথিল হইয়া আসিল। তবে কি তাহাকে বিবাহ করিতে হইবে বিদেশীয় বিজাতীয় বিভিন্নভাষাভাষী এই খৃষ্টধর্ম্মপ্রচারক পাদরীকে? হিন্দুর মেয়ে হইয়া সে একজন আইরিশকে বিবাহ করিয়া তাহার স্ত্রী হইবে? নিজের দেশ, নিজের জন সকলই তাহার চিরদিনের মত সত্যসত্যই পর হইয়া যাইবে? নীলিমার চোখ ফাটিয়া যেন জল আসিতে লাগিল।

তাহার পর আবার তাহার মনে হইল, কিন্তু তাহা ভিন্ন আর তার উপায়ই বা কি? তাহার এখন একটা আশ্রয়ও ত চাই। সে খৃষ্টান, কোন হিন্দু ত তাহাকে আর বিবাহ করিবে না? যদি বিবাহ করিতে হয় ত খৃষ্টানকেই করিতে হইবে। কোন ভদ্রবংশীয় দেশীয় খৃষ্টানের পক্ষেও অনাথা নিরাশ্রয়াকে বিবাহ করিবার সম্ভাবনা কম। সে ক্ষেত্রে এই পরম রূপবান্ ভদ্রবংশীয় ও উচ্চশিক্ষিত ও ধার্ম্মিক আইরিশ যুবকের প্রস্তাবগ্রহণই কি ভাল নহে? তাহার মনে পড়িল, 'সুযোগ মনুষ্যজীবনে দুইবার আসে না,"